উদ্যানতত্ত্ব

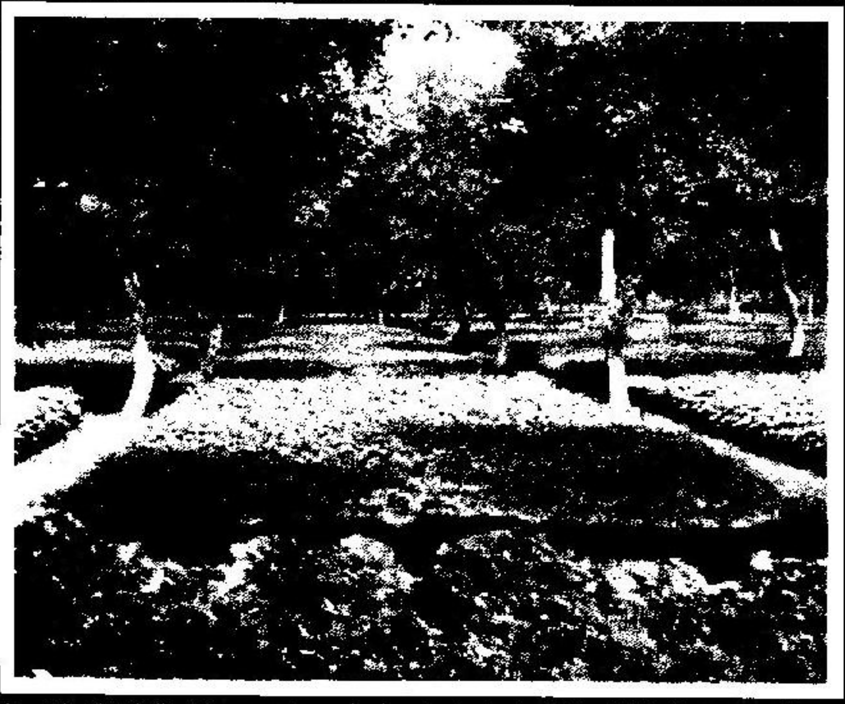

উদ্যানতত্ত্ব

ড. মোঃ সদরুল আমিন
প্রফেসর, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
দিনাজপুর

Library
Accession No. 20893

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

উদ্যানতত্ত্ব

(সবজি ফসল উৎপাদন কৌশল)

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১৪/জুন ২০০৭

বা/এ ৪৫৬৯
(২০০৬-২০০৭ পাঠ্যপুস্তক : জীকৃচি ৫)

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান উপবিভাগ

জীকৃচি ৩১৯

প্রকাশক
মো ঃ আবদুল ওয়াহাব
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোবারক হোসেন
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
আনওয়ার ফারুক

মূল্য
একশত চল্লিশ টাকা

UDDANTATTAYA (Horticulture) by Dr. Md. Sadrul Amin. Published by Dr. ... Wahab. Director (in charge), Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2007. Price : 140.00 only.

ISBN 984-07-4578-6

ভূমিকা

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে চাষযোগ্য জমির বেশিরভাগে মাঠ ফসল চাষ করা হয়। মানুষের খাদ্য চাহিদার পরিমাণের ভিত্তিতে মাঠ ফসলের পরই উদ্যান ফসলের গুরুত্ব বিদ্যমান। উদ্যান ফসলের মধ্যে সবজি ফসলের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত বেশি।

সাধারণভাবে সবজি ফসল ফলানো সম্ভব হলেও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বনের নিয়মে সবজি ফসল চাষ করা হলে অধিকতর ফলন পাওয়া সম্ভব। সবজি ফসলের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনাসহ উদ্যানতত্ত্ব গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ দেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচির অনুসরণে গ্রন্থটির প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের শ্রেণিবিন্যাস উল্লেখের পর সবজি ফসলের [illegible] পরিচয় ও উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রণয়নে যেসব প্রকাশনা ও গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর সংশ্লিষ্ট লেখকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া পারিবারিকভাবে যাঁদের সহযোগিতায় গ্রন্থটি প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সর্বোপরি বাংলা একাডেমী থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় একাডেমী কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ।

[illegible]

ড. মোঃ সদরুল আমিন

উৎসর্গ

বানভাসি মানুষের
কৃষি পুনর্বাসনের সাফল্য কামনায়

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : উদ্যানতত্ত্বের শ্রেণিবিভাগ ও গুরুত্ব ১-১৮

১.০. উদ্যানতত্ত্বের সংজ্ঞা ১

১.১. উদ্যানতত্ত্বের শ্রেণিবিভাগ ১

১.১.১ সবজিবিজ্ঞান ১

১.১.২ ফলবিজ্ঞান ১

১.১.৩ পুষ্পবিজ্ঞান ২

১.১.৪ শোভবর্ধক উদ্যানতত্ত্ব ২

১.১.৪.১ শোভবর্ধক উদ্যানতত্ত্বে উদ্ভিদের শ্রেণিভিত্তিক পরিচয় ২

১.২. উদ্যানতত্ত্বের গুরুত্ব ৫

১.৩. সবজি উৎপাদনের গুরুত্ব ৬

১.৩.১. খাদ্য হিসেবে সবজির গুরুত্ব ৬

১.৩.২. মানুষের পুষ্টিতে সবজির ভূমিকা ৭

১.৩.৩. স্বাস্থ্য রক্ষায় বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের ভূমিকা ৮

১.৩.৪. সবজি চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ১৫

১.৩.৪.১. সবজির ভেষজ গুণাগুণ ১৫

১.৪. শাকসবজির অর্থনৈতিক গুরুত্ব ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশে সবজি উৎপাদন : সমস্যা ও সমাধান ১৯-২৬

২.০. বাংলাদেশে সবজি উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা ১৯

২.১. বিভিন্ন প্রকার সবজি ১৯

২.২. বাংলাদেশে সবজি উৎপাদনের সমস্যা ২০

২.৩. বাংলাদেশে সবজির বর্তমান অবস্থা উন্নয়নের অগ্রগতি ২১

২.৩.১. মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সবজির পরিমাণ ২২

২.৪. সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় ২৩

২.৫. সবজি উৎপাদনের সমস্যা ২৪

২.৬. সবজি উৎপাদন সমস্যা ও সমাধান ২৪

তৃতীয় অধ্যায় : সবজির শ্রেণিবিভাগ ২৭-৩৫

৩.০. সবজির শ্রেণিবিভাগ ২৭

৩.১. উৎপাদন মৌসুম অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ ২৭

৩.২. ভক্ষণযোগ্য অংশ অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ ২৭

৩.৩. উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ ২৮

৩.৪. বৃদ্ধির ধরন অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ ২৯

৩.৫. সবজির মৌসুমভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ২৯

৩.৫.১. রবি মৌসুম ২৯

৩.৫.২. খরিফ সবজি ২৯

৩.৫.৩. সবজির উদ্ভিদতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগের উদাহরণ ২৯

৩.৬. শাকসবজি ৩০
৩.৬.১. শাকসবজির শ্রেণিবিভাগ ৩০
৩.৬.১.১. তাপমাত্রার প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ ৩০
৩.৬.১.২. জীবনচক্রের দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ ৩০
৩.৬.১.৩. বৃদ্ধির ধরন অনুসারে শ্রেণিবিভাগ ৩০
৩.৬.১.৪. জন্মানোর মৌসুম অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ ৩১
৩.৬.১.৫. উদ্ভিদের ভক্ষণীয় অংশের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ ৩১
৩.৭.১.৬. উদ্ভিদতাত্ত্বিক সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ ৩২
৩.৭. সবজির উদ্যানতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ ৩৫
চতুর্থ অধ্যায় : সবজি উৎপাদনের বাস্তুগত উপাদান ৩৬-৪৩
৪.০. বাস্তুগত উপাদান ৩৬
৪.১. জলবায়ু ও আবহাওয়া ৩৬
৪.১.১. তাপমাত্রা ৩৬
৪.১.১.১. তাপমাত্রার প্রভাব ৩৭
৪.১.১.২. উদ্ভিদের উপর তাপমাত্রার প্রভাব ৩৭
৪.১.২. আলোর প্রভাব ৪০
৪.১.২.১. বাংলাদেশে প্রতি মাসের গড় দৈনিক আলোকিত সময় ৪১
৪.১.২.২. আলোর প্রকারভেদ ৪১
৪.১.২.৩. আলোর প্রখরতা ৪১
৪.১.২.৪. আলোর স্থিতিকাল ৪১
৪.১.৩. বৃষ্টিপাতের প্রভাব ৪২
৪.১.৩.১. বাংলাদেশে মাসিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪২
পঞ্চম অধ্যায় : সবজির বীজ ও চারা ৪৪-৫৭
৫.০. বীজের সংজ্ঞা ৪৪
৫.১. ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য ৪৪
৫.২. বীজের শ্রেণিবিভাগ ৪৫
৫.২.১. ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ৪৫
৫.২.২. আবরণভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ৪৫
৫.২.৩. বীজপত্রভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ৪৬
৫.২.৪. বীজের ভ্রূণভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ৪৬
৫.২.৫. বীজের প্রত্যয়নগত শ্রেণিবিভাগ ৪৬
৫.৩. বীজ হিসেবে অঙ্গজ বংশবিস্তার ৪৬
৫.৩.১. অঙ্গজ বংশবিস্তার ৪৭
৫.৩.২. অঙ্গজ বীজের ব্যবহারিক সুবিধা ও অসুবিধা ৫০
৫.৩.২.১. অঙ্গজ বীজের ব্যবহারিক সুবিধা ৫০
৫.৩.২.২. অঙ্গজ বীজের ব্যবহারিক অসুবিধা ৫০
৫.৪. সবজির চারা উৎপাদন ৫১
৫.৪.১. বীজ দ্বারা বংশবিস্তার ৫১
৫.৪.২. সরাসরি বপন ৫১
৫.৪.২.১. বপনের সময় ৫১
৫.৪.২.২. বপনের পদ্ধতি ৫২

৫.৪.২.২.১. সারি করে বীজ বোনার সুবিধা ৫২
৫.৪.২.৩. বপনের গভীরতা ৫২
৫.৪.২.৪. বপনের দূরত্ব ও বীজের হার ৫২
৫.৪.২.৫. চারা উৎপাদন ও রোপণ ৫২
৫.৫. নার্সারি ব্যবস্থাপনা ৫৩
৫.৫.১. জমি তৈরি ও বীজ বপন ৫৩
৫.৫.২. চারার যত্ন ৫৪
৫.৫.৩. চারার রোগ দমন ৫৪
৫.৫.৪. দ্বিতীয় বীজতলায় চারা স্থানান্তর ৫৪
৫.৫.৫. চারা রোপণ ৫৫
৫.৫.৬. ভালো চারার গুণাগুণ ৫৫
৫.৫.৭. বুস্টার দ্রবণ ব্যবহার ৫৫
৫.৬. অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার ৫৫
৫.৭. মুলার বীজ উৎপাদন পদ্ধতি ৫৬
৫.৮. ফুলকপিতে বীজ উৎপাদন পদ্ধতি ৫৭

ষষ্ঠ অধ্যায় : সবজি উৎপাদনের নীতি ও পদ্ধতি ৫৮-৭২
৬.০. সবজি উৎপাদনের নীতিমালা ৫৮
৬.১. চারা উৎপাদন ৫৮
৬.২. জমি নির্বাচন ও বীজতলা তৈরি ৫৮
৬.৩. বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ৫৮
৬.৪. বীজ পরীক্ষা ৫৯
৬.৫. বীজ বপন ৫৯
৬.৫.১. বীজ বপনের সাধারণ নীতি ৫৯
৬.৫.২. চারা রোপণ ৬১
৬.৬. চারার যত্ন ৬১
৬.৬.১. পানি সেচ ৬১
৬.৬.২. নিকাশ ৬১
৬.৬.৩. অন্তঃকর্ষণ ৬১
৬.৪.৪. মালচিং ৬১
৬.৭. সার প্রয়োগ ৬১
৬.৭.১. গাইড হিসেবে ব্যবহারের জন্য সাধারণীকৃত সার মাত্রা ৬২
৬.৮. রোগ দমন ৬৪
৬.৮.১. হলুদায়ন ৬৪
৬.৮.২. দাগ ৬৫
৬.৮.৩. পচন ৬৫
৬.৮.৪. নেতিয়ে পড়া ৬৫
৬.৮.৫. আগামরা ৬৫
৬.৮.৬. পাতা কুঁকড়ানো ৬৫
৬.৮.৭. হর্কয়ন ৬৫
৬.৮.৮. মরচে পড়া ৬৫

৬.৯. ফসল কর্তন ৬৫
৬.১০. বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ৬৫
৬.১০.১. বীজ শুকানো ৬৫
৬.১০.২. বীজ সংরক্ষণ ৬৬
৬.১০.৩. বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তাপ ৬৬
৬.১০.৪. বীজ সংরক্ষণের নীতিমালা ৬৬
৬.১১. বীজ পরিবহন ৬৬
৬.১২. সবজি চাষের সংক্ষিপ্ত তথ্য ৬৬
৬.১২.১. সবজির সাধারণ রোপণ দূরত্ব ৬৮
৬.১৩. সবজি চাষের ফসলবিন্যাস ৬৮

সপ্তম অধ্যায় : বসত বাগানে সবজি চাষ **৭৩-৮৭**

৭.০. সবজি চাষ ৭৩
৭.১. বসত বাগানে সবজি চাষ (কালিকাপুর মডেল) ৭৩
৭.১.১. প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ৭৩
৭.২. বসত বাগানে সবজি চাষ (লেবুখালী মডেল) ৭৩
৭.৩. বসত বাগানে সবজি চাষ (কলাপাড়া মডেল) ৭৪
৭.৪. সর্জান পদ্ধতিতে সবজি চাষ ৭৪
৭.৪.১. সর্জান পদ্ধতিতে সবজি চাষের জন্য বীজতলা তৈরি ৭৪
৭.৫. মিনি পুকুরভিত্তিক সবজি, ফল ও সমন্বিত চাষ মডেল ৭৫
৭.৫.১. উৎপাদন প্রযুক্তি : ফসল বিন্যাসের বিবরণ ৭৫
৭.৬. বাঁধাকপির আন্তঃফসল হিসেবে টমেটো চাষ ৭৫
৭.৭. আলুর আন্তঃফসল হিসেবে শাকসবজি চাষ ৭৬
৭.৮. ভুট্টার আন্তঃফসল হিসেবে মুলা চাষ ৭৭
৭.৯. মিষ্টি আলুর আন্তঃফসল হিসেবে ভুট্টা চাষ ৮০
৭.১০. মুখীকচুর সাথে গো খাদ্য হিসেবে ভুট্টার চাষ ৮২
৭.১১. ছোলার মিশ্রফসল হিসেবে ধনে চাষ ৮৩
৭.১২. পাতাজাতীয় সবজির সাথে ভুট্টার আন্তঃফসল ৮৪
৭.১৩. ভুট্টা আন্তঃফসল গোমড়ির ৮৫
৭.১৩.১. উৎপাদন প্রযুক্তি ৮৫

অষ্টম অধ্যায় : বেগুন গোত্রের সবজি **৮৮-১১৩**

৮.০. বেগুন ও টমেটো ৮৮
৮.১. বেগুন ৮৮
৮.১.১. বেগুন চাষের গুরুত্ব ৮৮
৮.১.২. বেগুনের উৎপাদন তথ্য ৮৮
৮.১.২.১. বিশ্বে বেগুন উৎপাদন ৮৯
৮.১.২.২. মহাদেশীয় বেগুন উৎপাদন (১৯৯৯) ৮৯
৮.১.২.৩. বিশ্বের কয়েকটি দেশে বেগুন উৎপাদন (১৯৯৯ সাল) ৮৯
৮.১.২.৪. বাংলাদেশে বেগুন উৎপাদন (খরিফ) মৌসুম ৯০
৮.১.২.৫. খরিফ মৌসুমে এলাকাভিত্তিক বেগুন উৎপাদন (১৯৯৬-৯৭) ৯০

৮.১.২.৬. বাংলাদেশে বেগুন উৎপাদন রবি মৌসুম ৯১
৮.১.২.৭. রবি মৌসুমে এলাকাভিত্তিক বেগুন উৎপাদন (১৯৯৭-৯৮) ৯১
৮.১.৩. বাংলাদেশে বেগুন চাষ ৯১
৮.১.৩.১. বেগুনের জাত ৯১
৮.১.৩.১.১. বাংলাদেশ উদ্ভাবিত বেগুনের উন্নত জাত ৯৩
৮.১.৩.২. বেগুনের উদ্ভিদতত্ত্ব ৯৪
৮.১.৪. বেগুন চাষের পরিবেশগত চাহিদা ৯৫
৮.১.৫. বারি বেগুন চাষ প্রযুক্তি ৯৭
৮.১.৬. বারমাসী বেগুনের চাষ ৯৮
৮.২. টমেটো ৯৮
৮.২.১. বিশ্বে সবজি ও টমেটো উৎপাদন ৯৮
৮.২.১.১. বিশ্বে কয়েকটি সবজির উৎপাদন ৯৯
৮.২.১.২. বিশ্বে টমেটো উৎপাদন ধারা ৯৯
৮.২.১.৩. বিশ্বে টমেটোর জমি ও ফলন ৯৯
৮.২.১.৪. বিশ্বে টমেটোর বর্তমান উৎপাদন ১০০
৮.২.১.৫. বাংলাদেশে টমেটোর উৎপাদন ১০০
৮.২.১.৬. বাংলাদেশে টমেটোর এলাকাভিত্তিক ফলন ১০১
৮.২.২. টমেটোর উদ্ভিদতত্ত্ব ১০১
৮.২.৩. বাংলাদেশের টমেটোর জাত ১০৪
৮.২.৩.১. টমেটোর অন্যান্য জাত ১০৮
৮.২.৪. গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন টমেটো উৎপাদন প্রযুক্তি ১১২
৮.২.৫. টমেটো ও বেগুনের জোড়কলম উৎপাদন ১১৩

নবম অধ্যায় : কুমড়াজাতীয় সবজি **১১৪-১৪৪**

৯.০. চাল কুমড়া ১১৪
৯.১. চাল কুমড়ার উদ্ভিদতত্ত্ব ১১৪
৯.১.১. চাল কুমড়ার জাত ১১৫
৯.১.২. পরিবেশগত চাহিদা ১১৫
৯.১.৩. চাল কুমড়ার উৎপাদন প্রযুক্তি ১১৫
৯.১.৪. কুমড়ার যৌন অভিব্যক্তি ও যৌনরূপ ১১৬
৯.১.৫. যৌন অভিব্যক্তির পরিবহণ ১১৭
৯.১.৫.১. পরাগায়ন ও ফল ধারণ ১১৭
৯.১.৬. পোকা দমন ১১৮
৯.১.৭. রোগ দমন ১১৮
৯.২. মিষ্টি কুমড়া ১১৮
৯.২.১. মিষ্টি কুমড়ার উদ্ভিদতত্ত্ব ১১৯
৯.২.২. মিষ্টি কুমড়ার জাত ২২১
৯.২.৩. জলবায়ু ১২১
৯.২.৪. উৎপাদন পদ্ধতি ১২১
৯.২.৫. জাত উন্নয়ন ও বীজ উৎপাদন ১২৩
৯.৩. লাউ ১২৩
৯.৩.১. লাউয়ের উদ্ভিদতত্ত্ব ১২৪

৯.৩.২. লাউয়ের জাত ১২৪
৯.৩.২.১. লাউয়ের অন্যান্য জাত ১২৪
৯.৩.২.২. বাংলাদেশে উদ্ভাবিত উন্নত লাউ জাতের বিবরণ ১২৫
৯.৩.৩. জলবায়ু ও মাটি ১২৫
৯.৩.৪. লাউয়ের উৎপাদন প্রযুক্তি ১২৫
৯.৪. তরমুজ ১২৭
৯.৪.১. তরমুজের উদ্ভিদতত্ত্ব ১২৭
৯.৪.২. তরমুজের জাত ১২৮
৯.৪.২.১. তরমুজের জাত উন্নয়নের লক্ষ্য ১২৯
৯.৪.৩. জলবায়ু ও মাটি ১২৯
৯.৪.৪. উৎপাদন পদ্ধতি ১২৯
৯.৪.৫. লাউ ও তরমুজের জোড় কলম প্রযুক্তি ১৩০
৯.৫. পটল ১৩১
৯.৫.১. উদ্ভিদতত্ত্ব ১৩১
৯.৫.২. পটলের জাত ১৩১
৯.৫.৩. জলবায়ু ও মাটি ১৩২
৯.৫.৪. উৎপাদন পদ্ধতি ১৩২
৯.৫.৫. পটল বীজ গাছের সুবিধা ১৩৩
৯.৬. করলা ১৩৩
৯.৬.১. করলার জাত ১৩৩
৯.৬.২. করলা চাষের মাটি ১৩৩
৯.৬.৩. উৎপাদন পদ্ধতি ১৩৩
৯.৭. ঝিঙা ১৩৭
৯.৭.১. ঝিঙার জাত ১৩৭
৯.৭.২. ঝিঙা চাষের মাটি ১৩৮
৯.৭.৩. উৎপাদন পদ্ধতি ১৩৮
৯.৮. চিচিঙ্গা ১৩৯
৯.৮.১. চিচিঙ্গার জাত ১৩৯
৯.৮.২. চিচিঙ্গা চাষের মাটি ১৩৯
৯.৮.৩. উৎপাদন পদ্ধতি ১৩৯
৯.৯. শশা ১৪১
৯.৯.১. চিচিঙ্গার জাত ১৪১
৯.৯.২. উৎপাদন পদ্ধতি ১৪১
৯.১০. ক্ষীরা ১৪৩
৯.১০.১. ক্ষীরা চাষের মাটি ১৪৩
৯.১০.২. উৎপাদন পদ্ধতি ১৪৩
৯.১১. স্কোয়াশ ১৪৩
৯.১১.১. স্কোয়াশ চাষের মাটি ১৪৩
৯.১১.২. উৎপাদন পদ্ধতি ১৪৩
দশম অধ্যায় : কপি গোত্রের সবজি **১৪৫-১৭১**
১০.০. কপি গোত্রের সংজ্ঞা ১৪৫
১০.১. কপির শ্রেণিবিভাগ ১৪৫

১০.২. কপি ফসল চাষের পটভূমি ১৪৫
১০.৩. ফুলকপি ১৪৬
১০.৩.১. ফুলকপির উদ্ভিদতত্ত্ব ১৪৬
১০.৩.২. ফুলকপি চাষের জলবায়ু ও মাটি ১৪৬
১০.৩.৩. ফুলকপির জাত ১৪৭
১০.৩.৩.১. ফুলকপির অন্যান্য জাত ১৪৮
১০.৩.৩.২. বাংলাদেশের ফুলকপির উন্নত জাত ১৪৮
১০.৩.৪. ফুলকপি উৎপাদন পদ্ধতি ১৪৮
১০.৩.৪.১. বারি ফুলকপি (রূপা) চাষ পদ্ধতি ১৪৯
১০.৪. বাঁধাকপি ১৫২
১০.৪.১. বিশ্বে বাঁধাকপি উৎপাদন ১৫২
১০.৪.১.১. বিশ্বে বাঁধাকপির উৎপাদন ১৫২
১০.৪.১.২. বিভিন্ন দেশে বাঁধাকপির উৎপাদন (১৯৯৯ সাল) ১৫২
১০.৪.১.৩. বাঁধাকপির মহাদেশী উৎপাদন (১৯৯৯ সাল) ১৫৩
১০.৪.২. বাংলাদেশে বাঁধাকপি উৎপাদন ১৫৩
১০.৪.২.১. বাংলাদেশে বাঁধাকপির এলাকাভিত্তিক উৎপাদন ১৫৩
১০.৪.২.২. বাংলাদেশে বাঁধাকপি উৎপাদন ১৫৪
১০.৪.৩. বাঁধাকপির উদ্ভিদতত্ত্ব ১৫৪
১০.৪.৪. বাঁধাকপি চাষে জলবায়ু ও মাটি ১৫৫
১০.৪.৫. বাঁধাকপির জাত ১৫৫
১০.৪.৫.১. বাংলাদেশ উদ্ভাবিত উন্নত বাঁধাকপির জাত ১৫৬
১০.৪.৬. বাঁধাকপি উৎপাদন পদ্ধতি ১৫৬
১০.৫. ওলকপি ১৬০
১০.৬. চীনা কপি ১৬০
১০.৬.১. বারি চীনা কপি ১ জাতের বৈশিষ্ট্য ১৬২
১০.৭. ব্রোকলি ১৬২
১০.৮. মুলা ১৬২
১০.৮.১. মুলার উদ্ভিদতত্ত্ব ১৬২
১০.৮.২. বাংলাদেশের মুলার উন্নত জাত ১৬৫
১০.৮.৩. মুলার উৎপাদন পদ্ধতি ১৬৭
১০.৯. গাজর ১৬৮
১০.১০. বিট ১৭১
১০.১১. শালগম ১৭১
একাদশ অধ্যায় : কন্দাল ফসল ১৭২-২০৪
১১.০. কন্দাল ফসলের পরিচিতি ও উৎপাদন ১৭২
১১.১. আলু ১৭২
১১.১.১. আলুর স্থানীয় জাত ১৭৩
১১.১.১.১. স্থানীয় আলু জাতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ১৭৫
১১.১.১.২. স্থানীয় আলু জাতের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য ১৭৫
১১.১.১.৩. স্থানীয় আলু জাতের গাছের বৈশিষ্ট্য ১৭৬
১১.১.১.৪. স্থানীয় আলু জাতের কন্দের বৈশিষ্ট্য ১৭৬

১১.১.১.৫. স্থানীয় আলু জাতের কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ১৭৭
১১.১.২. আলুর উচ্চ ফলনশীল জাত ১৭৭
১১.১.২.১. উচ্চ ফলনশীল আলু জাতের গাছের বৈশিষ্ট্য ১৭৯
১১.১.২.২. বিভিন্ন আলু জাতের কন্দের বৈশিষ্ট্য ১৮০
১১.১.৩. বারি আলুর উৎপাদন পদ্ধতি ১৮০
১১.১.৩.১. উন্নত আলু চাষের দশটি নীতি ১৮২
১১.১.৪. আলুর রোগ ১৮২
১১.১.৪.১. আলু সংগ্রহোত্তর এবং গুদামজাত রোগ দমন ব্যবস্থাপনা ১৮৪
১১.১.৫. আলুর ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন ১৮৫
১১.১.৬. টিস্যু কালচারে বীজ আলু উৎপাদন ১৮৫
১১.১.৭. র‍্যাপিড মাল্টিপ্লিকেশন পদ্ধতিতে আলু উৎপাদন ১৮৬
১১.১.৮. বিনা আলু উৎপাদন ১৮৬
১১.১.৯. আলুর বীজ উৎপাদন প্রযুক্তির সারমর্ম ১৮৭
১১.১.১০. আলুর প্রকৃত বীজ উৎপাদন ১৮৭
১১.১.১০.১. আলুর বীজ ফসল উৎপাদন ১৮৭
১১.১.১১. প্রকৃত বীজ দিয়ে আলু উৎপাদন ১৮৮
১১.১.১১.১. আলুর প্রকৃত বীজ (হাইব্রিড টিপিএস) উৎপাদন পদ্ধতি ১৮৯
১১.১.১২. কৃষক পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ ১৮৯
১১.২. মিষ্টি আলু ১৯০
১১.২.১. মিষ্টি আলুর উদ্ভিদতত্ত্ব ১৯০
১১.২.২. জলবায়ু ও মাটি ১৯৩
১১.২.৩. মিষ্টি আলুর উন্নত জাত ১৯৩
১১.২.৪. মিষ্টি আলুর উৎপাদন প্রযুক্তি ১৯৬
১১.২.৪.১. চর অঞ্চলে মিষ্টি আলুর চাষ ১৯৭
১১.৩. কচু ১৯৮
১১.৩.১. পানি কচু ১৯৮
১১.৩.১.১. বাংলাদেশের পানি কচুর উন্নত জাত ১৯৯
১১.৩.১.২. পানি কচু উৎপাদন পদ্ধতি ১৯৯
১১.৩.২. মুখীকচু ২০০
১১.৩.২.১. মুখীকচু উৎপাদন পদ্ধতি ২০০
১১.৩.২.২. বিলাসী মুখীকচু উৎপাদন প্রযুক্তি ২০১
১১.৩.৩. কৃষ্ণ কচু ২০২
১১.৩.৪. মানকচু ২০২
১১.৩.৪.১. মানকচু উৎপাদন পদ্ধতি ২০২
১১.৩.৫. ওলকচু ২০৪
১১.৩.৬. পঞ্চমুখী কচু ২০৪
১১.৩.৭. গাছ আলু বা ইয়াম ২০৪
১১.৩.৭.১. গাছ আলুর বৈজ্ঞানিক পরিচিতি ২০৪

দ্বাদশ অধ্যায় : শিমজাতীয় সবজি ২০৫-২১৪
১২.০. শিমজাতীয় সবজি ২০৫
১২.১. শিম ২০৫

১২.১.১. শিম চাষে মাটি ও জলবায়ু ২০৫
১২.১.২. শিমের জাত ২০৫
১২.১.২.১. বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত শিমের জাত ২০৫
১২.১.৩. শিম উৎপাদন পদ্ধতি ২০৬
১২.২. বরবটি ২০৬
১২.২.১. বরবটির জাত ২০৬
১২.২.২. মাটি ২০৭
১২.২.৩. উৎপাদন পদ্ধতি ২০৭
১২.৩. মটরশুঁটি ২০৯
১২.৩.১. মটরশুঁটির জাত ২১০
১২.৪. বারি ঝাড়শিম-১ (ফরাসী শিম) ২১২
১২.৫. ফ্রেঞ্চ মটর ২১৩
১২.৬. বুশ মটর ২১৩
১২.৭. মাঠ মটর ২১৪
১২.৮. মাখন শিম ২১৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় : পেঁপে, ঢেঁড়শ ও সাজনা **২১৫-২২৩**
১৩.১. পেঁপে ২১৫
১৩.১.১. পেঁপের জাত ২১৫
১৩.১.২. মাটি ২১৫
১৩.১.৩. পেঁপে উৎপাদন পদ্ধতি ২১৫
১৩.২. ঢেঁড়শ ২১৭
১৩.২.১. ঢেঁড়শের উদ্ভিদতত্ত্ব ২১৮
১৩.২.২. ঢেঁড়শ চাষে জলবায়ু ও মাটি ২১৮
১৩.২.১.১. বাংলাদেশে ঢেঁড়শের উন্নত জাত ২১৮
১৩.২.১.২. ঢেঁড়শের অন্যান্য জাত ২২০
১৩.২.৩. ঢেঁড়শ উৎপাদন পদ্ধতি ২২০
১৩.২.৩.১ বারি ঢেঁড়শ১ চাষ ২২১
১৩.৩. সাজনা ও রাইখঞ্জন ২২২

চর্তুদশ অধ্যায় : সবজি ফসলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা **২২৪-২৩৮**
১৪.০. সবজি ফসলের প্রধান প্রধান পোকা ২২৪
১৪.১. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ২৩০
১৪.২. কীটনাশকের ব্যবহার ২৩৪
১৪.২.১. নিম কীটনাশক তৈরির পদ্ধতি ২৩৪
১৪.২.২. নিম কীটনাশক দিয়ে পোকা দমন ২৩৫
১৪.২.৩. বোর্দো-মিক্সার প্রয়োগের মাধ্যমে ২৩৫
১৪.৩. শাকসব্জির ভালো বীজ উৎপাদন ২৩৫
১৪.৪. বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ২৩৮

পঞ্চদশ অধ্যায় : শাকজাতীয় ফসল **২৩৯-২৪৭**
১৫.০. শাকজাতীয় ফসল ২৩৯
১৫.১. কলমিশাক ২৩৯
১৫.২. পালংশাক ২৪০

১৫.৩. পুঁইশাক ২৪২
১৫.৪. ডাঁটা ২৪৪
১৫.৫. লালশাক ২৪৬
ষোড়শ অধ্যায় : মসলাজাতীয় ফসল ২৪৮-২৮৭
১৬.০. মসলাজাতীয় ফসল ২৪৮
১৬.১. মরিচ ২৪৮
১৬.১.১. মরিচের উদ্ভিদতত্ত্ব, গোত্র ও প্রজাতি ২৪৯
১৬.১.২. মরিচের ব্যবহারিক শ্রেণিবিভাগ ২৫০
১৬.১.৩. মরিচের পুষ্টিমান ২৫২
১৬.১.৪. মরিচ গাছের উদ্ভিদতাত্ত্বিক গঠন ২৫৩
১৬.১.৫. মরিচ উৎপাদন পদ্ধতি ২৫৪
১৬.১.৬. মরিচের সেচ ব্যবস্থাপনা ২৫৯
১৬.১.৭. মরিচের বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন ২৬০
১৬.১.৮. মরিচের বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দমন ২৬৪
১৬.১.৯. সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ২৬৭
১৬.১.১০ মরিচ সংগ্রহ, শুকনো ও সংরক্ষণ ২৭১
১৬.১.১১. মরিচ উৎপাদনের প্রাক্কলিত আয় ব্যয় ২৭২
১৬.২. আদা ২৭৪
১৬.২.১. উৎপাদন পদ্ধতি ২৭৪
১৬.৩. হলুদ ২৭৬
১৬.৪. পেঁয়াজ ২৭৭
১৬.৪.১. উৎপাদন পদ্ধতি ২৭৮
১৬.৫. রসুন ২৮২
১৬.৬. জিরা ২৮৩
১৬.৭. মৌরি ২৮৩
১৬.৮. ধনে ২৮৩
১৬.৮.১. ধনে উৎপাদন প্রযুক্তি ২৮৪
১৬.৯. কালোজিরা ২৮৪
১৬.১০. মেথি ২৮৪
১৬.১১. শুলফি ২৮৫
১৬.১২. পুদিনা ২৮৫
১৬.১৩. গোল মরিচ ২৮৫
১৬.১৪. তেজপাতা ২৮৬
১৬.১৫. কর্পূর ২৮৬
১৬.১৬. এলাচি ২৮৬
১৬.১৭. লবঙ্গ ২৮৭
১৬.১৮. দারুচিনি ২৮৭
পরিশিষ্ট ২৮৮
তথ্যপঞ্জি ৩০৩

প্রথম অধ্যায়

উদ্যানতত্ত্বের শ্রেণিবিভাগ ও গুরুত্ব

১.০. উদ্যানতত্ত্বের সংজ্ঞা

Horticulture শব্দ দুটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ "Hortus" এবং "Cultura" হতে এসেছে "Hortus" শব্দের অর্থ Enclosure বা Hedge এবং Cultura শব্দের অর্থ Cultivation বা চাষাবাদ সুতরাং শাব্দিক অর্থে Horticulture বা উদ্যানতত্ত্ব বলতে এমন সব গাছপালার উৎপাদন কলাকৌশলকে বোঝায় যেগুলোর নিরাপত্তার জন্য বেড়া নির্মাণের প্রয়োজন হয়।

কৃষি বিজ্ঞানের যে শাখা সাধারণত বাগানে বেড়া দিয়ে বা অত্যন্ত পরিচর্যার মাধ্যমে জন্মানো ফসলের উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং ফসলগুলো মানুষের খাদ্য, ওষুধ এবং মানসিক পরিতৃপ্তির জন্য প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করা যায় সে শাখাকে উদ্যানতত্ত্ব (Horticulture) বলা হয়। এই শাখার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি উদ্ভিদের জন্য পৃথকভাবে যত্ন নিতে হয়।

১.১. উদ্যানতত্ত্বের শ্রেণিবিভাগ

উদ্যানতত্ত্বের শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো :

১.১.১. সবজিবিজ্ঞান (Olericulture) : Olericulture শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ "Oleris" অর্থ Pot অর্থাৎ গুল্মজাতীয় গাছ এবং Culture অর্থ Cultivation অর্থাৎ চাষাবাদ হতে এসেছে। উদ্যানতত্ত্বের যে শাখায় সবজি উৎপাদনকারী উদ্ভিদের উৎপাদন কলাকৌশল এবং ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, তাকে সবজিবিজ্ঞান বলে।

ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, সবজিবিজ্ঞান উদ্যানতত্ত্বের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যাতে অধিক ফলন পাওয়ার জন্য শাকসবজির উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, গঠন, বংশবিস্তার, সবজি চাষে আবহাওয়া, মাটির প্রভাব প্রভৃতির উপর নির্ভর করে উদ্ভাবিত আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির প্রয়োগ, ফসল সংগ্রহ ও তার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

১.১.২. ফলবিজ্ঞান (Pomology) : Pomology শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ "Pome" অর্থ Fruit অর্থাৎ ফল এবং "Logos" অর্থ Knowledge অর্থাৎ জ্ঞান হতে এসেছে। উদ্যানতত্ত্বের যে শাখায় ফল উৎপাদী গাছের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে ফলবিজ্ঞান বলে

ফল উৎপাদনের কলাকৌশলকে ফলবিজ্ঞান বলে। অর্থাৎ উদ্যানতত্ত্বের যে শাখায় ফসল গাছের উৎপাদন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আলোচনা করা হয় তাকে ফলবিজ্ঞান বলা হয়।

১.১.৩. পুষ্পবিজ্ঞান (Floriculture) : Floriculture শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ "Flor" অর্থ Flower অর্থাৎ ফুল এবং "Cultura" অর্থ Cultivation অর্থাৎ চাষাবাদ হতে এসেছে। উদ্যানতত্ত্বের যে শাখায় ফুল এবং সৌন্দর্যবর্ধনকারী উদ্ভিদের চাষাবাদ বা উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে পুষ্পবিজ্ঞান বলে।

১.১.৪. শোভাবর্ধক উদ্যানতত্ত্ব : উদ্যানতত্ত্বের যে শাখা সৌন্দর্যবর্ধনকারী উদ্ভিদের চাষাবাদ বা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে আলোচনা করে তাকে শোভাবর্ধক উদ্যানতত্ত্ব (Ornamental Horticulture) বলে।

১.১.৪.১. শোভাবর্ধক উদ্যানতত্ত্বে উদ্ভিদের শ্রেণিভিত্তিক পরিচয়

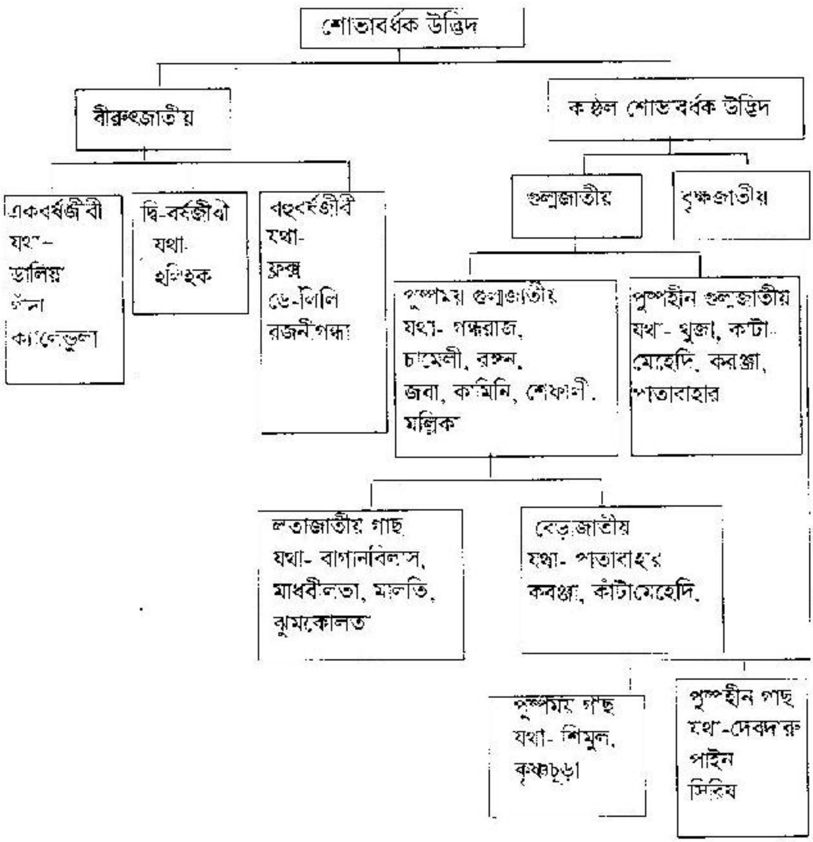

শোভাবর্ধক উদ্যানতত্ত্ব সাধারণত বিভিন্ন ফুল ও ল্যান্ডস্কেপ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে। শোভাবর্ধক উদ্যানতত্ত্বকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (ক) পুষ্পবিজ্ঞান ও (খ) ল্যান্ডস্কেপ উদ্যানতত্ত্ব।

ক. পুষ্পবিজ্ঞান

উদ্যানতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ক.১. পুষ্পবিজ্ঞানের গুরুত্ব : ফুল সৌন্দর্যের প্রতীক এবং মানব সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য উপাদান। এর রূপ, লাবণ্য ও সৌন্দর্য কেবল চোখ ও মনের প্রয়োজনই নিবারণ করে না বরং প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি স্তরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক সভ্যতা বিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে ফুল উৎপাদনকারী গাছের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ফুল কেবল সৌন্দর্য ও সৌখিনতার সামগ্রীই নয় বরং অনেক দেশের জাতীয় অর্থনীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বাংলাদেশে অতি সম্প্রতি সীমিত আকারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুল চাষের সূচনা হয়েছে। নিচে ফুল চাষের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো।

(১) সৌন্দর্যবর্ধন, মনোরম ও স্বাস্থ্যবান পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ফুল ও সুদৃশ্য গাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(২) পূজা পার্বণ, উৎসব, বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী, প্রীতিভোজ, ব্যক্তি ও মৃত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি কাজে ফুল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

(৩) ফুল জাতীয় প্রতীক। প্রত্যেক দেশেই একটি করে জাতীয় ফুল থাকে। কয়েকটি দেশের জাতীয় ফুল কেমন তা জানা প্রয়োজন। যেমন–
বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা, ভারতের জাতীয় ফুল পদ্ম, যুক্তরাজ্যের জাতীয় ফুল গোলাপ এবং ইরানের জাতীয় ফুল স্থলপদ্ম

(৪) প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা, ভক্তি, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, পবিত্রতা ইত্যাদি নানা বিষয়ের প্রতীকরূপে ফুল বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নিকট সমাদৃত।

(৫) ফুল কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সৃজনশীল কর্মের অনুপ্রেরণা।

(৬) ফুল ও সুদৃশ্য গাছের মনোরম পরিবেশ ধনী, দরিদ্র, ছেলে-বুড়ো সকলের জন্য চিত্তাবর্ধক। এটি সৌন্দর্য পিপাসা মিটিয়ে মনে পবিত্র আনন্দের সঞ্চার করে।

(৭) এটি মানসিক দুঃশ্চিন্তা ও অবসাদ দূর করে এবং রোগ মুক্তিতে সহায়তা করে।

(৮) গৃহের সাজ-সজ্জায় ফুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(৯) ফুলের নির্যাস থেকে সুগন্ধি তৈরি করা হয়।

(১০) এটি ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রসারে সহায়তা করে। ফুলের ব্যবসা বেকার সমস্যাও দূর করে।

(১১) বেঁচে থাকতে চাই বিনোদন। পুষ্প চর্চা বা বাগান তৈরি চিত্তবিনোদন অবসর কাটানোর উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

ক.১.১. পুষ্পবিজ্ঞানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : ফুল শুধু সৌন্দর্য ও সৌখিনতার সামগ্রীই নয় বরং দেশের জাতীয় অর্থনীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যে এর গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন–

(১) **আয় বৃদ্ধিতে ফুলের অবদান** : ফুল চাষ ও ফুলের ব্যবসায় নিয়োজিত থেকে আজকাল বহুলোক জীবিকা নির্বাহ করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুলের চাষ হচ্ছে। এসব ফুলের মধ্যে রয়েছে গোলাপ, রজনীগন্ধা, গাঁদা, গ্লাডিওলাস ইত্যাদি। মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে অন্যান্য ফসলের চাষের সাথে ফুল চাষের আবশ্যকতা বেড়ে গেছে। এদেশের মানুষের রুচি ও চাহিদা থাকায় ফুলের চাষ করে অতি সহজেই আয় বৃদ্ধি করা যায়।

(২) **নতুন শিল্প স্থাপনে ফুলের অবদান** : ফুল চাষকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর অনেক দেশেই নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে। অনেক দেশেই গড়ে উঠেছে ফুলের নির্যাস নিষ্কাশন শিল্প। কিন্তু আমাদের দেশে এই শিল্প এখনও গড়ে উঠেনি। বেলী, রজনীগন্ধা, গোলাপ ইত্যাদি ফুল দিয়ে সুগন্ধি তৈরির শিল্প গড়ে উঠার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

(৩) **ফুল চাষে পতিত জমির ব্যবহার** : পতিত জমিতে ফুলের চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে লাভ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা সম্ভব। যেমন– স্কুল, কলেজ, কোর্ট-কাচারি, রেলপথ, রাজপথ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পতিত জমিতে ফুল চাষ করে জমির পরিমাণ বাড়ানো যায়।

(৪) **জাতীয় অর্থনীতিতে ফুলের অবদান** : ফুল এবং ফুলের বীজ ও চারা আজকাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সামগ্রী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও জাপান অর্কিড রপ্তানি করে প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার আয় করছে। ফুল রপ্তানিতে হল্যান্ডের অবস্থান সবার উপরে। বাজারজাত করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে এদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুল চাষের সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর যা দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখতে পারে।

(৫) **বেকার সমস্যা দূরীকরণে ফুলের অবদান** : ফুলের বাগান তৈরি করে চারা বিক্রি করে অনেক বেকার যুবক কর্মসংস্থান করতে পারে। এছাড়া ফুলের উপর ভিত্তি করে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে তাতে অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হতে পারে।

খ. ল্যান্ডস্কেপ হর্টিকালচার

উদ্যানতত্ত্বের যে শাখা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুরূপ দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্যকরণ বিষয়ে আলোচনা করে তাকে ল্যান্ডস্কেপ হর্টিকালচার বলে। অথবা ল্যান্ডস্কেপ হর্টিকালচার হলো উদ্যানতত্ত্বের এমন একটি নির্দিষ্ট অংশ যেখানে বিভিন্ন সৌন্দর্যবর্ধক গাছ লাগিয়ে একটি স্থানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। ল্যান্ডস্কেপ হর্টিকালচার স্থান উন্নয়ন, গৃহ সাজানো, বাছাইকরণ, রাস্তা, গাছপালা, খেলার মাঠ, খুঁটি, ক্ষুদ্র জলাশয় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। এটি পৃথকভাবে কোনো বাড়ি ও আশেপাশের এলাকা, কোনো পার্ক ও পার্কের সংলগ্ন রাস্তা এবং জনসমাজ নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ ল্যান্ডস্কেপ হর্টিকালচার হলো উদ্যানতত্ত্বের সেই শাখা যা একটি বিশেষ এলাকার সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করে।

খ. ১. ল্যান্ডস্কেপ হর্টিকালচার-এর শ্রেণিবিন্যাস

(১) বসতবাড়ি ল্যান্ডস্কেপ

(ক) গ্রামীণ

(খ) নগর

(২) পাবলিক ল্যান্ডস্কেপ

(ক) সড়ক ও জনপথের ল্যান্ডস্কেপ

(খ) ভবনসমূহের ল্যান্ডস্কেপ

(৩) পার্কের ল্যান্ডস্কেপ

(৪) শিল্প এলাকার ল্যান্ডস্কেপ

(৫) আবাসিক এলাকার ল্যান্ডস্কেপ

(৬) বাণিজ্যিক এলাকার ল্যান্ডস্কেপ

১.২. উদ্যানতত্ত্বের গুরুত্ব

উদ্যানতত্ত্ব নানা দিক হতে গুরুত্বপূর্ণ । নিচে উদ্যানতত্ত্বের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো ।

(১) কৃষিনীতি প্রয়োগের পরিবর্তে হর্টিকালচার নীতি প্রয়োগ দ্বারা জমিতে অধিক ফসল ফলানো যায়, কারণ এক্ষেত্রে কোনো ফসলের চাষ করতে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা নিচে উল্লেখ করা হলো ।

(ক) বাগান বা ক্ষেতের চারদিকে বেড়া দেওয়া হয় । এর ফলে বাগানের ফসলকে পশু ও মানুষের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। এবং ফসল নষ্ট হবার সম্ভাবনা কম থাকে ।

(খ) ব্যাপক ও নিবিড়ভাবে গাছের যত্ন নেওয়া হয় । এর ফলে উদ্ভিদের ফলন বৃদ্ধি পায়

(গ) প্রত্যেকটি গাছের পৃথকভাবে যত্ন নেওয়া হয়। এর ফলে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পায়

(২) উদ্যানতত্ত্বের নীতি প্রয়োগ দ্বারা আমাদের খাদ্য সমস্যা দূর করা যায় ।

(৩) আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক অপুষ্টির শিকার উদ্যানতত্ত্ব অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে ।

(৪) মানুষের শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ৬টি পুষ্টি উপাদানের প্রধান দুটি উপাদান ভিটামিন ও খনিজ যা বেশিরভাগ ফল ও শাকসবজি থেকে পাওয়া যায় । ফল ও শাকসবজি উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল হিসেবে পরিচিত ।

(৫) উদ্যানতত্ত্ব মানুষের মনের খোরাক যোগাতে সাহায্য করে । যেমন– বাগানে বিভিন্ন ফুলের অপূর্ব সমাবেশ দেখে মানুষ মানসিক প্রশান্তি লাভ করে ।

(৬) বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল ব্যবহার করা হয় । যেমন– সুগন্ধী তৈরির কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ফুল ব্যবহার করা হয় ।

(৭) উদ্যানতাত্ত্বিক শস্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায় । যেমন– থাইল্যান্ড অর্কিডের চাষ করে এবং তা বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। আমাদের দেশের উৎপাদিত পান ভারতে রপ্তানি করা হয়।

বাংলাদেশের ৮৬% লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। কাজেই এদের উন্নতির জন্য ফসলের অধিক উৎপাদন দরকার। আর এই অধিক উৎপাদনে সাহায্য করে উদ্যানতত্ত্ব নীতি। এসব বিবেচনা করে উদ্যানতত্ত্বের প্রতি অধিক নজর দেয়া প্রয়োজন।

উদ্যানতত্ত্ব কৃষিবিজ্ঞানের একটি বিরাট শাখা। এর অধীনে অসংখ্য ফসল রয়েছে। এসব ফসলের উৎপত্তি, বিস্তার, উদ্ভিদতত্ত্ব, পরিবেশগত চাহিদা, উৎপাদনের পদ্ধতি, উন্নয়ন ও ব্যবহার সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে একজন লোকের পক্ষে আয়ত্ব করা দুরূহ কাজ। তাই সাধারণত কৃষি বিজ্ঞানীদেরকে উদ্যানতত্ত্বের একটি ক্ষুদ্র অংশেই নিজেদের কর্মকাণ্ড সীমিত রাখতে হয়। ব্যবহারের ভিন্নতা অনুযায়ী উদ্যান ফসলসমূহকে পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ফল, সবজি, ফুল, মসলা ও ওষুধ উৎপাদনকারী ফসল। এছাড়াও নারিকেল, সুপারি ইত্যাদিও উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল। এগুলোকে রোপণ ফসলও বলে।

১.৩. সবজি উৎপাদনের গুরুত্ব

মাঠ ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পূর্ব হতেই জঙ্গল থেকে বিভিন্ন সবজি সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করা হতো। শাকসবজিতে প্রচুর পুষ্টি বিদ্যমান। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে সবজির উৎপাদন ও ব্যবহার অতি উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

মানুষ সবজিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে আসছে। এর মধ্যে খাদ্য হিসেবে সবজির গুরুত্ব সর্বাধিক, কারণ সবজির খাদ্যমান অনেক বেশি।

১.৩.১. খাদ্য হিসেবে সবজির গুরুত্ব : এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো :

১। **খাদ্যমান** : সবজিতে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান বিদ্যমান। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের প্রাচুর্যের কারণে এদেশে শাকসবজির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা আবশ্যক। কারণ ভিটামিন ও খনিজ দেহ-বৃদ্ধি, পুষ্টিসাধন ও দৃষ্টি শক্তির সাথে সম্পর্কিত।

২। **প্রোটিনের উৎস হিসেবে সবজি** : সবজিতে প্রোটিনের পরিমাণ সাধারণত শতকরা ২ ভাগের মতো। শিমজাতীয় সবজিতে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি, প্রচুর পরিমাণে সবজি খেলে প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩। **ক্যালোরির উৎস হিসেবে সবজি** : আমাদের দেশে আলু, মিষ্টি আলু, মুখীকচু ও মেটে আলু ইত্যাদি কন্দাল ফসল সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। দানা ফসলের তুলনায় আলু, কচু, মিষ্টি আলু হেক্টর প্রতি অনেক বেশি পরিমাণ শ্বেতসার উৎপাদন করতে সক্ষম। তাই এর অধিক উৎপাদন ও ব্যবহার খাদ্য সমস্যা সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অন্যান্য সবজির মধ্যে শিম ও মটরের বীজ তুলনামূলকভাবে ক্যালোরি সমৃদ্ধ।

৪। **ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের উৎস সবজি** : পত্রবহুল সবজি ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের বৃহৎ অংশ আসে সবজি থেকে। বাংলাদেশে খনিজ পদার্থের প্রাপ্যতা কম। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ থাকলেও উচ্চ মূল্যের দরুণ তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরে থেকে যায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই পুষ্টি উপাদানের জন্য ফল ও সবজির উপর অধিক নির্ভর

করতে হয়। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ফলের উৎপাদন ঋতুভিত্তিক। এসব কারণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের জন্য সবজির উপর অধিকতর নির্ভরশীল হতে হয়।

অধিক পরিমাণে সবজি গ্রহণ খাদ্যকে সুষম করে। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, খাদ্যের মোট ক্যালোরির অন্তত ৫ % ফল ও সবজি থেকে আসা উচিত। এতে যে পরিমাণ সবজি খেতে হবে তা দেহের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের চাহিদা পূরণ করতে পারে বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু দৈনিক সবজি ও ফলের প্রাপ্যতা মাত্র ৮৮ গ্রাম অথচ জাপানীরা প্রতিদিন গড়ে ৪২৫ গ্রাম খেয়ে থাকে। বাংলাদেশে অনেক পত্রবহুল সবজি ভিটামিন সমৃদ্ধ। 'বি' গ্রুপের ভিটামিনের মধ্যে রাইবোফ্লাভিনের ঘাটতি প্রকট। যদিও দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি দামী খাদ্যে ভিটামিন-বি সবজির তুলনায় বেশি থাকে। কিন্তু এসব খাদ্য আজকাল অনেকেরই নাগালের বাইরে। নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে সবজি খেয়ে ভিটামিন-বি এর ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।

১.৩.২. মানুষের পুষ্টিতে সবজির ভূমিকা : মানুষের পুষ্টিতে সবজির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দৈনন্দিন পুষ্টি উপাদান সরবরাহে সবজির গুরুত্ব অপরিসীম দেহের স্বাভাবিক কাজ ও সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে মানুষের পাঁচ ধরনের খাদ্যোপাদানের প্রয়োজন যথা– শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন, এবং খনিজ উপাদান। এগুলিকে পুষ্টির মৌলিক উপাদান বলা হয়।

দেহের সঠিক বৃদ্ধি, উন্নয়ন, প্রজনন তথা দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখার জন্য প্রত্যেকটি জৈব বা অজৈব উপাদান প্রয়োজনীয় পরিমাণে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করতে হয়। একজন ব্যক্তির দৈনিক কোন উপাদান কতটুকু প্রয়োজন তা নির্ভর করে তার দেহের ওজন, লিঙ্গ, পেশা ও জলবায়ুর উপর। একজন বয়স্ক ব্যক্তির (মহিলা এবং পুরুষ) জন্য দৈনিক বিভিন্ন উপাদান কতটুকু প্রয়োজন তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

খাদ্যোপাদান	পুরুষ	মহিলা
খাদ্য শক্তি	৩০০০ ক্যালরি	২০০০ ক্যালরি
প্রোটিন	৫৭ গ্রাম	৪৩ গ্রাম
ক্যালসিয়াম	৫০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম
আয়রন	১০ গ্রাম	২৮ গ্রাম
ভিটামিন-এ	২৫০০ আ.ইউ	২৫০০ আ.ইউ
ভিটামিন-বি$_১$	১.৪ গ্রাম	১.৪ গ্রাম
ভিটামিন-বি$_২$	১.৫ গ্রাম	১.৫ গ্রাম
ভিটামিন-বি$_৩$	১৫ গ্রাম	১৫ গ্রাম
ভিটামিন-সি	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম

দৈনিক খাদ্য তালিকায় যদি উক্ত পরিমাণ পুষ্টি উপাদানগুলো থাকে তবে তাকে সুষম খাদ্য বলে। উপরোক্ত খাদ্য উপাদান পেতে হলে একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করতে হয়।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক খাদ্য তালিকা	
চাল ২৩৫ গ্রাম	শাক ১২০ গ্রাম
গম আটা ১১৫ গ্রাম	সবজি ১১৫ গ্রাম
মিষ্টি আলু ২৪০ গ্রাম	মাছ ৩০ গ্রাম
ডাল ১১৫ গ্রাম	তেল ১৫ গ্রাম এবং ফলমূল ৬০ গ্রাম

১.৩.৩. স্বাস্থ্য রক্ষায় বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের ভূমিকা : স্বাস্থ্য রক্ষার্থে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের ভূমিকা এবং তাদের চাহিদা মেটাতে শাকসবজির অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক. শর্করা ও স্নেহ উপাদান

এ জাতীয় খাদ্যসমূহ শরীরের তাপমাত্রা রক্ষা করে এবং দৈনন্দিন শারীরিক ও মানসিক কাজকর্ম সমাধা করবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা সরবরাহ করে। প্রয়োজনে আমিষও শক্তি সরবরাহ করতে পারে।

প্রতি গ্রাম শর্করা ৪.১০ ক্যালরি শক্তি সরবরাহ করে। প্রতি গ্রাম স্নেহ ৯.৪৫ ক্যালরি শক্তি সরবরাহ করে। প্রতি গ্রাম আমিষ ৫.৬৫ ক্যালরি শক্তি সরবরাহ করে। ক্যালরির অভাবে দেহের ওজন কমে আসে ও কাজকর্ম করার ক্ষমতা লোপ পায়। এছাড়া এর অভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা কমে যায়, যার ফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে না। বিভিন্ন উৎস হতে পাওয়া ক্যালরির গুণগত কোনো পার্থক্য নেই তবে মোট চাহিদার অন্তত দশভাগ ক্যালরি স্নেহ হতে আসা উচিত, কারণ স্নেহের মধ্যে দ্রবণীয় ভিটামিন (ভিটামিন এ, ডি, ই, কে) এর শোষণ বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। ক্যালোরির প্রধান উৎস শস্য ও প্রাণিজ খাদ্য। তবে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) মতে, শরীরের চাহিদার কমপক্ষে শতকরা পাঁচভাগ ক্যালরি শাকসবজি ও ফলমূল থেকে আসা উচিত যা ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের শারীরিক চাহিদা পূরণ করে থাকে।

নিচে শর্করা ও চর্বি সরবরাহকারী সবজির তালিকা দেওয়া হলো

শর্করা সমৃদ্ধ সবজি	চর্বি সমৃদ্ধ সবজি
কচু জাতীয় সবজি (Aroids) : ২৪.৪ গ্রাম ১০০ গ্রাম	করলা - ০.১ গ্রাম/১০০ গ্রাম
শিম বিচি - ২৩.৭ গ্রাম/১০০ গ্রাম	বেগুন - ২.৯ গ্রাম/১০০ গ্রাম
গোল আলু - ১৯.১ গ্রাম/১০০ গ্রাম	
মিষ্টি আলু - ২১.৬ গ্রাম/১০০ গ্রাম	ফুলকপি - ০.১ গ্রাম/১০০ গ্রাম
কাকরোল - ১৭.৪ গ্রাম/১০০ গ্রাম	কচুশাক - ১.৫ গ্রাম/১০০ গ্রাম

খ. প্রোটিন

আমাদের দেহের জলীয় অংশটুকু বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তার অর্ধেকটাই প্রোটিন। দেহের প্রত্যেকটি কোষের মৌলিক কাঠামো প্রোটিন দ্বারা গঠিত। তাই দেহের সর্বত্রই প্রোটিন বিদ্যমান, যদিও মাংসপেশী এবং রক্তে প্রোটিন সর্বাধিক। দেহের মধ্যে প্রোটিনের প্রধান কাজ হলো টিস্যু তৈরির মৌলিক উপকরণ ও কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া এবং প্রয়োজনবোধে ক্যালোরি সরবরাহ করা। তাই বর্ধনশীল বালক-বালিকা এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন সর্বাধিক। বয়স্ক লোকের দেহে প্রোটিন প্রধানত টিস্যু গঠন, সুরক্ষা ও ক্ষয়প্রাপ্ত টিস্যু পুনর্গঠন করে। প্রোটিনের অভাবে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। যদি শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য যেমন– শর্করা, ভিটামিন সি প্রভৃতির অভাব ঘটে তবে প্রোটিন শক্তি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। প্রাণিজ খাদ্য হলো প্রোটিনের প্রধান উৎস। মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রোটিনের প্রধান উৎস।

শাকসবজিতে অন্যান্য খাদ্য হতে প্রোটিনের পরিমাণ খুবই কম। প্রোটিন হলো এমাইনো এসিডের পলিমার। ২০ টিরও বেশি এমাইনো এসিড রয়েছে যার ৮টি মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় (শিশুর জন্য ১০টি : আরজিনিন, হিস্টিডিন বেশি)। শস্য কণায় যে প্রোটিন পাওয়া যায় তাতে বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড না পাওয়া গেলেও শাকসবজিতে উক্ত এমাইনো এসিডসমূহ পাওয়া যায়। যেমন– ট্রিপটোফেন, মিথিওনিন, হিস্টিডিন, ভ্যালিন, লিউসিন, ফিনাইলএলানিন, এলানিন। সুতরাং নিয়মিত সবজি ভক্ষণ করলে এমাইনো এসিডের অভাব অল্প হলেও দূর করা সম্ভব। নিচে প্রোটিন সরবরাহকারী সবজির নাম দেওয়া হলো–

মটর : ৭.৪ গ্রাম/ ১০০ গ্রাম; শিম ৩.৯ গ্রাম/ ১০০ গ্রাম;
কালো কচুশাক ৬.৮ গ্রাম/ ১০০ গ্রাম; পালংশাক ৩.৩ গ্রাম/ ১০০ গ্রাম এবং
করলা : ১২.৫ গ্রাম/ ১০০ গ্রাম।

গ. ভিটামিন

ভিটামিন বলতে এমন কতগুলো যৌগিক পদার্থকে বোঝায় যেগুলো ব্যতীত দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি সম্ভব নয়। পরিমাণের দিক দিয়ে যদিও ভিটামিনের চাহিদা ততো বেশি নয়, তবুও দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ভিটামিনের সামান্য অভাবে দেহে নানা ধরনের রোগ দেখা দেয়। ভিটামিন এ-এর প্রধান উৎস হলো শাকসবজি ও ফলমূল। মানব দেহের চাহিদার প্রায় ৯০-৯৫% ভিটামিন সি, ৬০-৮০% ভিটামিন এ, ২০-৩০% ভিটামিন বি এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কে ও ই শাক সবজি ও ফলমূল হতে আসে।

গ.১. ভিটামিন-এ : উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উভয় রকমের অনেক খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন-এ আছে। প্রাণিজ খাদ্য : দুধ, ডিম, মাখন, কলিজা, মাছ ইত্যাদি।

উদ্ভিজ্জ খাদ্য : সবুজ শাকসবজি, আলু, গাজর, মিষ্টি কুমড়া পাকা পেঁপে ইত্যাদি ভিটামিন-A এর প্রধান উৎস।

উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন- এ কতগুলো হলুদ বর্ণের রঞ্জকরূপে বিদ্যমান থাকে। এদেরকে ভিটামিন A এর প্রিকরসরকে (Pricursor) বা ক্যারোটিন বলা হয়। ক্যারোটিন কলিজায় সহজেই সিক্ত হয়ে ভিটামিন-এ তে পরিণত হয়। শরীর বৃদ্ধির জন্য বিশেষ করে দাঁত উঠার সময় এবং দাঁতের পুষ্টির জন্য ও দৃষ্টি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ভিটামিন-এ একান্ত প্রয়োজন। এর অভাবে রাতকানা রোগ হয় এবং এ অভাব বেশি দিন ধরে চললে চোখ সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হতে পারে। এছাড়া শরীরে ভিটামিন-এ-এর অভাব দেখা দিলে সহজেই মানুষ ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়। সবুজ শাকসবজি মানব দেহের চাহিদার ৩০% ভিটামিন-এ সরবরাহ করে। বিভিন্ন শাকসবজি থেকে যে পরিমাণ ভিটামিন-এ পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:

লালশাক : ১১.৯৪ গ্রাম/ ১০০ গ্রাম/; পুঁইশাক : ১২.৭৫ গ্রাম/ ১০০ গ্রাম;
কচুশাক : ১২.০০ গ্রাম/ ১০০ গ্রাম; ডাটাশাক : ১০.১০ গ্রাম/ ১০০ গ্রাম।

৫.২. **ভিটামিন বি$_{১}$** : দেহের মধ্যে শ্বেতসারের বিপাক ক্রিয়ায় থায়ামিনের প্রয়োজন। স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজ সম্পাদনের ব্যাপারেও এটি জড়িত। এর অভাবে ক্ষুধা কমে যায়, মানসিক অবসাদ বিষণ্ন হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়, শরীরের তাপ ও ওজন কমে যায়, স্মরণ শক্তি কমে আসে, হজম শক্তি লোপ পায় এবং দুর্বলতা দেখা দেয়। এর অভাব বেশিদিন ধরে চললে বেরিবেরি রোগের সৃষ্টি হয়– যা মানুষকে পঙ্গু করে ফেলে। ভিটামিন বি$_{১}$-এর উৎস হলো– ঢেঁকিছাটা সিদ্ধ চাল, ডিম, মাছ, কলিজা ইত্যাদি।

৫.২.১. শাকসবজিতে ভিটামিন বি$_{১}$-এর পরিমাণ

সবুজ কচুশাক : ০.২২ গ্রাম /১০০ গ্রাম; ডাটাশাক : ০.২৬ গ্রাম /১০০ গ্রাম;
পটল : ০.৩০ গ্রাম /১০০ গ্রাম; ঝিঙা : ০.১১ গ্রাম /১০০ গ্রাম
লালশাক : ০.৩১ গ্রাম /১০০ গ্রাম।

৫.৩. **ভিটামিন বি$_{২}$** : সুস্বাস্থ্য ও দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য রিবোফ্লাভিনের দরকার হয়। এর অভাবে– চর্ম রোগ হয়, চোখের জ্যোতিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ঠোঁট ও নাকফোলা রোগ ইত্যাদি। ভিটামিন বি$_{২}$ পাওয়া যায়– ডিম, কলিজা, দুগ্ধজাতীয় খাবার শাকসবজি, কালো কচুশাক, কলমিশাক, পুঁইশাক ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে বি$_{২}$ পাওয়া যায়।

৫.৪. **ভিটামিন বি$_{৩}$** : হজম শক্তি ও চামড়ার মসৃণতা বৃদ্ধিতে এই ভিটামিনের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এর অভাবে পেল্লেগ্রা (Pellegra) রোগ দেখা দেয়– যার ফলে শরীরের চামড়া লাল হয়ে উঠে এবং পরবর্তীতে চর্মরোগ দেখা দেয়। জিহ্বাতেও এ রোগ দেখা দিতে পারে। ডিম, মাছ, মাংস, কলিজা, চীনাবাদাম, মাশরুম এবং শাকজাতীয় খাদ্যে প্রচুর নিয়াসিন পাওয়া যায়।

৫.৫. **ভিটামিন বি$_{৬}$ (পাইরিডক্সিন)** : প্রোটিন মেটাবলিজমের জন্য ভিটামিন বি$_{৬}$ অপরিহার্য। এর অভাবে ত্বক, লিভার, রক্ত নালিকা ও স্নায়ুতন্ত্রে ত্রুটি দেখা দেয়।

৫.৬. **ভিটামিন বি$_{১২}$** : এর অভাবে ডিএনএ-এর গঠন ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা প্রায় সকল সবজি এবং সবুজ শাক সবজিতে পাওয়া যায়।

গ. ৭. ভিটামিন সি (এসকরবিক এডিস) : এ ভিটামিন দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, বিভিন্ন পেশীর কোষসমূহকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত রাখতে সাহায্য করে এবং ক্যালসিয়াম ও লোহার বিপাকে সহায়তা করে। ভিটামিন সি-এর অভাবে স্কার্ভি রোগ দেখা দেয়। এ রোগের আক্রমণে দাঁত ক্ষয়গ্রস্ত হয়, দাঁতের মাড়ি হতে রক্ত পড়ে এবং হাত পা ফুলে যায়। ক্যান্সার রোগে প্রতিরোধে 'সি' ভিটামিনের অবদান প্রমাণিত হয়েছে। দেহের চাহিদার ২৪% ভিটামিন সি সবুজ শাকসবজি, ১৫% গোল আলু ৩৫% টমেটো ও লেবুজাতীয় ফল হতে আসে। ফলের মধ্যে আমলকি, পেয়ারা, লেবু এবং সবজির মধ্যে বিভিন্ন জাতের শাক, বাঁধাকপি, টমেটো ভিটামিন সি-এর ভালো উৎস। গাছ থেকে সংগ্রহ করার পর থেকে ফল ও সবজিতে ভিটামিন সি-এর পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। ধৌত ও রান্নার সময় ভিটামিন সি নষ্ট হয় বিধায় টাটকা অবস্থায় ফল ও সম্ভব হলে সবজি অসিদ্ধ অবস্থায় খাওয়া বাঞ্ছনীয়। নিচে বিভিন্ন সবজিতে ভিটামিন সি-এর পরিমাণ উল্লেখ করা হলো

মুলাশাক - ১৪৮গ্রাম /১০০ গ্রাম ; পালংশাক - ৯৭ গ্রাম /১০০ গ্রাম;
ডাটাশাক - ৭৮ গ্রাম /১০০ গ্রাম; কাঁচা মরিচ - ১২৫ গ্রাম /১০০ গ্রাম;
উচ্ছে- ৯০ গ্রাম /১০০ গ্রাম

গ.৮. ভিটামিন ই : এ ভিটামিন টোকোফেরল নামেও পরিচিত। বন্ধ্যাত্ব নিবারণে এ ভিটামিন সহায়তা করে। বাঁধাকপি পালং শাক রসুন, কাঁচা মটরশুটিতে ভিটামিন ই বিদ্যমান।

গ.৯. ভিটামিন কে : রক্তে অবস্থিত প্রোথ্রোম্বিন নামক পদার্থ রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। ভিটামিন-কে এই পদার্থটি তৈরি করে। তাই ভিটামিন-কে এর অভাব হলে ক্ষতস্থান হতে রক্ত ক্ষরণ সহজে বন্ধ হয় না ; প্রসবের সময় যাতে অধিক রক্তপাত না ঘটে সে জন্য গর্ভবতী মাকে ভিটামিন-কে বেশি দেওয়া হয়। বাঁধাকপি, গাজর ও ফুলকপিতে ১০০ গ্রাম এ ২-৪ গ্রাম ভিটামিন কে পাওয়া যায়।

ঘ. খনিজ পদার্থ

শরীরের সুষ্ঠু গড়নের জন্য খনিজ পদার্থ অপরিহার্য। বিভিন্ন ধরনের প্রধান খনিজ পদার্থগুলো হচ্ছে– Ca, Fe, K, Mn, Na, Cl, Cu, Zn ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে কোনো কোনো, শরীরের হাড়, রক্ত বা হরমোন তৈরির কাজে নিয়োজিত। অন্যগুলো দেহের তরল পদার্থে লবণরূপে দ্রবীভূত হয়ে থাকে এবং পেশী ও কোষের বাহ্যিক ও রাসায়নিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। শরীরের মোট ওজনের শতকরা ৪.৩ থেকে ৪.৪ ভাগ খনিজ পদার্থ থাকে

ঘ.১. ক্যালসিয়াম : দেহে Ca এর অভাব হলে হাড় ও দাঁতের গঠন দুর্বল হয় এবং সহজে ভেঙে যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের শাক, তিলের বীজ, নারিকেল, ইলিশ মাছ ধনিয়া, জিরা, দুধ Ca এর ভালো উৎস। শাকসবজির মধ্যে ঢেঁড়শে ১১৬ গ্রাম /১০০ গ্রাম, কালো কচু শাকে ৪৬০ গ্রাম /১০০ গ্রাম; সবুজ কচু শাকে ২২৭ গ্রাম /১০০ গ্রাম; লাল শাকে ৩৭৪ গ্রাম /১০০ গ্রাম; ডাটাতে ২৬০ গ্রাম /১০০ গ্রাম ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়।

ঘ.২. লোহা : লোহা হিমোগ্লবিন-এর একটি উপাদান। হিমোগ্লবিন ফুসফুস হতে দেহের সর্বত্র O_2 দেওয়া এবং দেহের বিভিন্ন অংশ হতে CO_2 বহন করে নিয়ে আসার কাজ করে। হিমোগ্লবিন সবসময় স্থায়ী থাকে না। অনবরত উৎপন্ন হয় ও ধ্বংস হয় ফলে এটি উৎপন্ন হওয়ার জন্য দেহে নিয়মিত লোহা সরবরাহ করতে হয়। লোহার অভাবে রক্তশূন্যতা সৃষ্টি হয়। বাচ্চা এবং গর্ভবতী মায়েদের জন্য লোহার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

কালো কচুশাকে ৩৮.৭ গ্রাম /১০০ গ্রাম; সবুজ কচুশাকে ১০ গ্রাম /১০০ গ্রাম; [illegible] ২৪ গ্রাম /১০০ গ্রাম; পুঁইশাকে ১০ গ্রাম /১০০ গ্রাম; ডাটাশাকে ২৫.৫ গ্রাম /১০০ গ্রাম লোহা পাওয়া যায়।

ঙ. সবজিতে খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন (প্রতি ১০০ গ্রামে)

সবজি	খনিজ পদার্থ			ভিটামিন		
	ক্যালসিয়াম (মি. গ্রা.)	লোহা (মি. গ্রা.)	থায়ামিন (মি. গ্রা.)	ক্যারোটিন (মি. গ্রা.)	রিবোফ্লাভিন (মি. গ্রা.)	সি (মি. গ্রা.)
[illegible]	২৩	২	১২৬	.০৭	.০৬	৯৬
[illegible]	৫৭	১	৪৬৯	.৩২	.৩৩	২৫
করলা	২০	২	১২৬	০.৭	.০৯	৮৮
[illegible]	৩২	২	২৭	.০৫	.০২	১৬
[illegible]	৩৩	৫	১৬২০	০.৫	.১৮	-
কাঁচা কলা	১০	১	৩০	.০৫	.০২	২৪
কাঁচা কাঁঠাল	৩	২	০	.০৫	.০৪	১৪
কাঁচা আম	১০	৫	৯০	০.৪	.০১	৩
চাল কুমড়া	৩০	১	০	.০৬	.০১	১
[illegible]	২৬	০	৯৬	০.৪	.০৬	০
[illegible]	১৮	১	৩৩	-	.০১	৫
[illegible]	২০	২	১৯২	০.৭	.০১	৩১
[illegible]	২৬০	২	২৫৫	০.১	.১৮	১০
[illegible]	৬৬	২	৫২	.০৭	.১০	১৩
[illegible]	৩০	২	১৫৩	০.৫	.০৬	২৯
[illegible]	৫০	৮	৫৯৫	০	.০৩	১৭

কাঁচা পেঁপে	২৮	১	০	.০১	১২	-
ফুলকপি	৩৩	২	৩০	.০৪	.০১	৫৬
বরবটি	৭২	৩	৫৬৪	.০৭	.০৯	১৪
বেগুন	১৮	১	৭৪	.০৪	.১১	১২
মটরশুঁটি	২০	২	৮৩	.২৫	.০১	৯
মিষ্টি কুমড়া	১০	১	৫০	.০৬	.০৪	২
লাউ	২০	১	০	.০৩	.০১	০
শসা	১০	২	০	.০৩	.০১	০
সজনা	৩০	৫	১১০	.০৫	.০৭	১২০
শিম	২১০	২	১৮৭	.১০	.০৬	৯

৪.১. শাকপাতায় খনিজ পদার্থ এবং ভিটামিনের পরিমাণ (প্রতি ১০০ গ্রামে)

খনিজ	খনিজ পদার্থ			ভিটামিন		
	ক্যালসিয়াম (মি.গ্রা.)	লোহ (মি.গ্রা.)	ক্যারোটিন (মি.গ্রা.)	থায়ামিন (মি.গ্রা.)	রিবোফ্লেভিন (মি.গ্রা.)	সি (মি.গ্রা.)
ওলকপি	৭৪০	১৩	৪১৪৬	.২৫	--	১৫৭
কচু (কালো)	-	৪৬০	৩৯	১২০০০	.০৬	.৪৫৬৩
কচু (সবুজ)	২২৭	১১	১০২৭৮	.২২	.২৬	১২
কলমিশাক	১১০	৪	১৯৮০	.০৫	.১৩	১৩৭
গাজর পাতা	৩৪০	৯	৫৭০০	.০৪	.৩৭	৭৯
ডাটা	৮০০	২২	৩৫৬৪	০		৩৩
ধনিয়া পাতা	১৮৪	১৯	৬৯১৮	.০৫	.০৬	১৩৫
পাটশাক	৩৭০	৬	১২১৬	.৫০	.৩২	৮০
পালংশাক	৭৩	১১	৫৫৮০	.০৩	.২৯	২৮
পুদিনা	২০০	১৬	১৬২০	.০৫	.২৬	২৭
বকফুল	১১৩০	৪	৫৪০০	.২১	.০৯	১৬৯

বথুয়া	১৫০	৪	১৭৪০	.০১	.১৪	৩৫
বাঁধাকপি	৩৯	১	১২০০	.০৬	.০৯	১২৪
মুলাশাক	২৬৫	৪	৫২৯৫	.১৮	.৪৭	৮১
মিষ্টিআলু	৩৬০	১০	৭৫০	.০৭	.২৪	২৭
লালশাক	৩৯৭	২৬	৫৫২০	.০৩	.৩০	৯৯
লেটুস	৫০	২	৯৯০	.০৯	.১৩	১০
শালগম	৭১০	২৮	৯৩৯৬	.৩১	.৫৭	১৮০
সরিষা (টরি)	১৪৩	১৩	১৩৮০	.০১	.০৩	৬৫
সরিষা (রাই)	১৫৫	১৬	২৬২২	.০৩	--	৩৩
হেলেঞ্চা	২৯০	৫	২৮০৩	.১২	.৩৮	১৩

৬.২. ভিটামিনের পরিমাণ (প্রতি ১০০ গ্রামে)

খনিজ	খনিজ পদার্থ			ভিটামিন		
	ক্যালসিয়াম (মি.গ্রা.)	লোহা (মি.গ্রা.)	ক্যারোটিন (মি.গ্রা.)	থায়ামিন (মি.গ্রা.)	রিবোফ্লাভিন (মি.গ্রা.)	সি (মি.গ্রা.)
আলু	১০	১	২৪	.২৫	.০১	১৭
ওলকচু	৫০	১	২৬০	.০৬	.০৭	০
ওলকপি	২০	০	২১	.০৫	.০৯	৮৫
কচু	৪০	২	২৪	.০৯	.০৩	০
গাজর	৮০	২	১৮৯০	.০৪	.০২	৩
পেঁয়াজ	৪০	১	১৫	.০৮	.০২	২
বিট	১৮	১	০	.০৪	.০৯	১০
মিষ্টিআলু	৪৬	১	৬	.০৮	.০৪	২৪
মুলা (লাল)	৫০	১	৩	.০৬	.০২	১৭
মুলা (সাদা)	৩৫	০	৩	.০৬	.০২	১৫
মেটে আলু	২০	১	৫৬৫	.১৯	.৪৭	১
শালগম	৩০	০	০	.০৪	.০৪	৪৩

১.৩.৪. সবজি চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : সবজি চাষে নিম্নলিখিত গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়।

১. অধিক লাভের উৎস;
২. ধান ও গমের বিকল্প হিসেবে সবজি ব্যবহার করে খাদ্য ঘাটতি পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় সংকোচন;

৩. পতিত জমির সদ্ব্যবহার;
৪. বৈদেশিক মুদ্রা আয়;
৫. নতুন শিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ;
৬. বেকার সমস্যার সমাধান;
৭. ভেষজ গুণাগুণ

১.৩.৪.১. সবজির ভেষজ গুণাগুণ : সংক্ষেপে সবজির ভেষজ গুণাগুণ উপস্থাপন করা হলো।

টমেটো, ফুলকপি	এতে ম্যালিক এসিড আছে;
পুইশাক	অক্সালিক এসিড
লেটুস, পালংশাক	সাইট্রিক এসিড আছে

উল্লেখিত উপাদান রুচি বাড়ায় এবং হজম শক্তি বৃদ্ধি করে।

পেঁয়াজ	মাথায় খুশকি দূর করে।
রসুন	বাত রোগ সারে।
ভেষজ গুণ	রক্তের কোলেস্টেরল কমিয়ে দেয় রক্তচাপ কমিয়ে দেয়।
মান কচু	বাত রোগের উপশম করে তন্দ্রীয়ভাব কমায়

এছাড়া সবজি প্রচুর আঁশ ধারণ করে। এসব আঁশ হজম হয় না- ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

১.৪. শাকসবজির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

শাকসবজি মানব দেহের জন্য অত্যাবশ্যক এটি সত্য যে, মানুষ শুধু দানাজাতীয় খাদ্যের উপর নির্ভর করে বাঁচতে পারে না। সুস্থ্য ও সবল দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেককে পর্যাপ্ত পরিমাণ শাকসবজি গ্রহণ করতে হয়। নিচে বাংলাদেশে সবজি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা বা শাকসবজির অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

(১) অধিক লাভের উৎস : শাকসবজি চাষ অন্যান্য শস্য চাষের তুলনায় আমাদের দেশের চাষীদের জন্য অধিক লাভজনক হতে পারে। দেখা গেছে, যেখানে হেক্টর প্রতি আলু, টমেটো এবং ফুলকপি চাষে খরচ বাদে লাভ হয় ১৯, ১১ এবং ১৬ হাজার টাকা, সেখানে ধান, গম ও পাট চাষে লাভ হয় যথাক্রমে, ৫, ২.৫ এবং ৪ হাজার টাকা

(২) ধান ও গমের বিকল্প হিসবে সবজি ব্যবহার : আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ২০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। প্রতি বছর সরাসরিভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ হতে খাদ্য আমদানি করতে হয়। এমতাবস্থায় ধান ও গমের পরিবর্তে শর্করাসমৃদ্ধ সবজি যেমন– আলু, মিষ্টি আলু ইত্যাদি গ্রহণ বাড়িয়ে দিয়ে একদিকে খাদ্য ঘাটতি মেটাতে এবং অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার খরচ কমানো যেতে পারে। চাল ও গমের তুলনায় আলু ও মিষ্টি আলুতে শর্করার পরিমাণ বেশি এবং হেক্টর প্রতি উৎপাদনও বেশি

(৩) **পতিত জমির ব্যবহার** : আমাদের দেশে বাড়ির আনাচে, কানাচে, অফিস, স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গনে, রাস্তা বাঁধ ও রেল লাইনের ধারে অনেক পতিত জমি রয়েছে– যা ধান, গম ইত্যাদি চাষের জন্য উপযোগী নয়। এসব জায়গায় কিছুটা যত্ন করলেই শাকসবজি উৎপাদন করা যায় এবং খাদ্য ঘাটতি অনেকাংশে মেটানো যায় এবং কিছু বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা হয়

(৪) **বৈদেশিক মুদ্রা আয়** : পৃথিবীর অনেক দেশেই উপযুক্ত জলবায়ুর অভাবে শাকসবজির চাষ হয় না। কিন্তু বাংলাদেশের জলবায়ু সবজি চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। এমতাবস্থায় শাকসবজি চাষ করে এবং তা বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।

(৫) **বেকারত্ব সমস্যা সমাধান** : ধান, গম, পাট ইত্যাদির তুলনায় শাকসবজি চাষে অধিক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। আর তাই অধিক শাকসবজি চাষের মাধ্যমে আমাদের দেশের উদ্বৃত্ত শ্রমকে কাজে লাগিয়ে বেকার সমস্যা কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে

(৬) **নতুন শিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ** : বছরের সব সময় সব রকমের শাকসবজি পাওয়ার লক্ষ্যে উন্নত দেশগুলোতে আধুনিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রসার লাভ করেছে। তেমনি বাংলাদেশেও শাকসবজি সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে নতুন নতুন শিল্পের বিকাশ ঘটতে পারে।

(৭) **মহিলা ও ছেলে মেয়েদের শ্রম-শক্তিকে কাজে লাগানো** : আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। দেশের সামগ্রীক উন্নয়নে মহিলা শ্রমের গুরুত্ব অনেক। পারিবারিক সবজি বাগানের মাধ্যমে এই শ্রম-শক্তিকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

সুতরাং উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে শাকসবজি উৎপাদন সব দিক দিয়ে বিশেষভাবে লাভজনক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

(৭.১) **প্রোটিন** : প্রোটিন কতগুলো অ্যামাইনো এসিডের সমষ্টি। শরীরের মধ্যে অত্যাবশকীয় অ্যামাইনো এসিড শাকসবজি হতে পাওয়া যায়। যেমন –

(ক) পেঁয়াজ, রসুন থেকে Lysine,
(খ) পালংশাক ও লেটুস থেকে Methionine,
(গ) ফুলকপি, মুলা ও গাজর থেকে Valine,
(ঘ) আলু ও পেঁয়াজ থেকে Phenylalanine,
(ঙ) বাঁধাকপি থেকে Tryptophane,
(চ) টমেটো থেকে Histidine,
(ছ) আলু, ফুলকপি, গাজর থেকে Leucine এবং
(জ) বাঙ্গি ও কাঁচা মটরশুটি থেকে Alanine।

শাকসবজিতে বিদ্যমান প্রোটিনের প্রায় শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ সহজে হজমযোগ্য নিয়মিত শাকসবজি ভক্ষণ করলে অ্যামাইনো এসিডের অভাব দূর হয় এবং শরীরের দৈহিক চাহিদাকে সুষম প্রোটিন নিশ্চিত হয়।

(৭.২) **ভিটামিন :** শারীরিক পুষ্টির জন্য ভিটামিনের অবদান অনস্বীকার্য আর ভিটামিনের প্রধান উৎসই হলো শাকসবজি ও ফলমূল। মানবদেহের চাহিদার শতকরা প্রায় ৯০-৯৫ ভাগ ভিটামিন-সি, ৩০-৪০ ভাগ ভিটামিন-এ, ২০-৩০ ভাগ ভিটামিন-বি এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভিটামিন কে ও ই শাকসবজি ও ফলমূল হতে আসে।

(ক) **ভিটামিন-এ :** শরীর বৃদ্ধির জন্য, বিশেষ করে দাঁত ওঠার সময় এবং দাঁতের পুষ্টির জন্য Vit-A এর প্রয়োজন। ভিটামিন এ-এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। সবুজ শাকসবজি ও হলুদ শাক, মিষ্ঠি আলু, গাজর, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি ভিটামিন এ এর প্রধান উৎস। সবুজ শাকসবজি মানব দেহের চাহিদার ৩০% ভিটামিন এ সরবরাহ করে।

(খ) **ভিটামিন বি$_1$ বা থায়ামিন :** স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজ এবং দেহের মধ্যে শ্বেতসারের বিপাক প্রক্রিয়ায় ভিটামিন বি$_1$-এর প্রয়োজন হয়। এর অভাবে শরীরের তাপ ও ওজন হ্রাস পায় হজমশক্তি লোপ পায় এবং বেরিবেরি রোগ হয়। কচু শাক, ডাটাশাক, কলমীশাক, কাঁচা মটরশুটি, মুলা ইত্যাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভিটামিন বি$_1$ বিদ্যমান।

(গ) **ভিটামিন বি$_2$ বা রিবোফ্লাভিন :** এর অভাবে চর্ম রোগ হয় এবং ঠোঁট ও নাক ফোলা দেখা দেয়। কচুশাক, কলমীশাক, পুঁইশাক ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি$_2$ বিদ্যমান।

(ঘ) **ভিটামিন বি$_3$ বা নায়াসিন :** এর অভাবে পেল্লগ্রা রোগ হয়। শাকজাতীয় খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে নায়াসিন পাওয়া যায়।

(ঙ) **ভিটামিন সি :** ভিটামিন দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ক্যালসিয়াম ও লোহার বিপাকে সহায়তা করে। এর অভাবে স্কার্ভি রোগ দেখা দেয়। ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধে এ ভিটামিনের অবদান প্রমাণিত হয়েছে। দেহের চাহিদার ২৫% ভিটামিন সি সবুজ শাকসবজি, ১৫% আলু এবং ৩৫% টমেটো ও লেবুজাতীয় ফল হতে আসে।

(চ) **ভিটামিন ই :** বন্ধ্যাত্ব নিবারণে এ ভিটামিন সহায়তা করে। বাঁধাকপি, পালং শাক, রসুন, কাঁচা মটরশুঁটিতে ভিটামিন ই বিদ্যমান

(ছ) **ভিটামিন কে :** এর অভাবে ক্ষতস্থান হতে সহজে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না বাঁধাকপি, গাজর ও ফুলকপিতে প্রতি ১০০ গ্রামে ২.৫ মি.গ্রা. ভিটামিন কে পাওয়া যায়

(৭.৩) **খনিজ পদার্থ :** শরীরের সুষ্ঠু গড়নের জন্য খনিজ পদার্থ অপরিহার্য. বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থগুলো হচ্ছে Ca, Fe, K, Mn, Na, Cl, Cu ও Zn এগুলোর মধ্যে কোনো কোনোগুলো শরীরের হাড় বা হরমোন তৈরির কাজে নিয়োজিত। বিভিন্ন এনজাইমের সুষ্ঠ কার্যাবলী সমাধানেও খনিজ পদার্থ সাহায্য করে।

শাকসবজিতে খনিজ পদার্থ সাধারণত লবণ ও জৈব পদার্থ আকারে পাওয়া যায়। নিচে Ca, Fe ও I_2 এর আলোচনা করা হলো–

(ক) Ca : এর অভাব হলে হাড় ও দাঁতের গঠন দুর্বল হয় এবং সহজে ভেঙে যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের শাক, তিলের বীজ, ধনে, জিরা এবং দুধ Ca-এর সবচেয়ে ভালো উৎস।

(খ) Fe : লোহা হিমোগ্লোবিনের একটি উপাদান। হিমোগ্লোবিন সবসময় স্থায়ী থাকে না অনবরত উৎপন্ন হয় ও ধ্বংস হয় বলে নতুন করে এটি উৎপন্ন হওয়ার জন্য দেহে নিয়মিত Fe সরবরাহ করতে হয়। লোহার অভাবে রক্ত স্বল্পতার সৃষ্টি হয়। পত্রবহুল সবজিতে অধিক Fe থাকে।

(গ) I_2 : এটি থাইরক্সিন (Thyroxine) নামক হরমোনের অন্যতম উপাদান। I_2 এর অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়।

পরিশেষে বলা যায়, খাদ্য হিসেবে সবজি মানুষের নৈনন্দিন জীবনে সুস্থ, সবল ও নীরোগ রাখার জন্য অপরিহার্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে সবজি উৎপাদন : সমস্যা ও সমাধান

২.০. বাংলাদেশে সবজি উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে সবজি চাষের অধীনস্থ জমি এবং এর উৎপাদন নির্ভুলভাবে জানার কোনো উপায় নাই। উৎপাদিত সবজির একটি বড় অংশ বাসগৃহের আশেপাশে, ঘরের চালে, বেড়ার উপরে অথবা অন্য গাছের উপরে বাইয়ে দেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষেতের আইলেও সবজির চাষ হয়। মিশ্র ফসল হিসেবে সবজির চাষ আজকাল সাধারণ বিষয়ে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গৃহস্থালীতে সবজির চাষ হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে উৎপাদিত সবজি ও জমির পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। তবুও নিচে একটি তথ্য দেওয়া হলো।

সবজি	এলাকা (০০০ একর)	উৎপাদন (০০০ মে. টন)
গ্রীষ্মকালীন	১৭৫	৩৬৯ (৩৭০)
শীতকালীন	২৪৫(২৭০)	৭৯৬ (৮০০)
মোট	৪৪৭	১১৬৫
মোল আলু (%৫ মিষ্টি আলু)	৩২৬ (৩৩০)	১৪৩৮ (১৪৫০)
মিষ্টি কুমড়	১১১৪ (১১০)	৪২৭ (৪৩০)

২.১. বিভিন্ন প্রকার সবজি

ক. শীতকালীন সবজি : আলু, বেগুন, টমেটো, মূলা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, কচু, মিষ্টি কুমড়া, শিম, পালংশাক ইত্যাদি।

খ. গ্রীষ্মকালীন সবজি : বেগুন, লাউ, চালকুমড়া, পটল, ঝিঙা, করলা, শসা, চিচিঙ্গা, ডাটা, পুঁইশাক, ঢেঁড়শ, বরবটি, পেঁপে, কাঁচা কলা প্রভৃতি আবাদী জমি হিসেবে মোট চাষকৃত জমির ২% জমিতে চাষ করা হয়। এর মধ্যে ০.৯৪% জমিতে আলু চাষ হয়ে থাকে মোট চাষকৃত জমি থেকে। বাংলাদেশে সবজি সরবরাহ বা বাজারে সবজি সরবরাহের অধিক প্রাপ্তি ও স্বল্প প্রাপ্তির সময় সীমা উল্লেখ করা হলো। উন্নত দেশে সংরক্ষণ ও আমদানির মাধ্যমে প্রধান প্রধান সবজি সারা বছরই ক্রেতাদের কাছে সহজলভ্য। বাংলাদেশে সবজির সরবরাহ সুষম নয়। মৌসুম অনুযায়ী এর প্রচুর ব্যবধান রয়েছে। সবজি আমদানির সুযোগও কম। এদেশে মাত্র কয়েকটি সবজি সারা বছর পাওয়া

যায়। অন্যান্য সবজির উৎপাদন ও ব্যবহার ঋতুভিত্তিক। নিচে বাংলাদেশের কোন মাসে কি পরিমাণ সবজি বাজারে সরবরাহ করা হয় তা দেওয়া হলো।

মাস	% (সবজি ও আলু)	মাস	% (সবজি ও আলু)
জানুয়ারি	৭	জুলাই	৮
ফেব্রুয়ারি	৯	আগস্ট	৭
মার্চ	১৩	সেপ্টেম্বর	৬
এপ্রিল	১৩	অক্টোবর	৫
মে	১১	নভেম্বর	৪
জুন	১০	ডিসেম্বর	৭ = ১০০%

মার্চ-এপ্রিল মাসে সর্বাধিক পরিমাণ সবজি পাওয়া যায় এবং এ সময়ে সবজি সংখ্যায় বেশি। তারপর নভেম্বর পর্যন্ত এদের প্রাপ্তি কমতেই থাকে। অক্টোবর মাসে দুষ্প্রাপ্য হয়।

২.২. বাংলাদেশে সবজি উৎপাদনের সমস্যা

বাংলাদেশে সবজি উৎপাদনের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

(১) **জলবায়ুগত সমস্যা :** বাংলাদেশে বিরাজমান জলবায়ুর কারণে বছরের সবসময় সব ধরনের শাক-সবজির উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। ফলে ঠাণ্ডা আবহাওয়া ভালো এমন সবজিগুলো কেবল রবি মৌসুমে এবং গরম আবহাওয়া উপযোগী সবজিগুলোকে খরিপ মৌসুমে উৎপাদন করা সম্ভব। তদুপরি বর্ষাকালে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের দরুণ সবজি উৎপাদন বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এছাড়া বর্ষাকালে গড় তাপমাত্রা ৩০° সে. হয় এবং আর্দ্রতা অনেক কমে আসে। মার্চ-মে মাসে বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত ও অনিয়মিত হলেও এ সময়ে বারবার প্রবল ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় যা কোনো সবজির জন্য নিরাপদ নয়।

(২) **নিম্ন মানের ফলন :** বাংলাদেশে সবজির গড় ফলন অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম– যদিও অন্যান্য দেশের তুলনায় জমির গুণাগুণ এত খারাপ নয়। উচ্চ ফলনশীল জাত ব্যবহার না করার ফলে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদনই এর প্রধান কারণ।

(৩) **বীজের সমস্যা :** বীজ সমস্যার কারণে এ দেশের সবজি উৎপাদন ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। সবজি উৎপাদনের পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা প্রায়ই বীজের অভাবে অবাস্তবায়িত থেকে যায়। সবজি বীজ সমস্যার মধ্যে অনেক সবজির বীজ আমাদের দেশে উৎপাদিত না হওয়া, উৎপাদিত বীজের নিম্নমান এবং বিদেশ থেকে বীজ আমদানিতে উদ্ভূত সমস্যা উল্লেখযোগ্য। বিদেশ থেকে যে বীজগুলো আমদানি করা হয় তা আমাদের দেশের জলবায়ুতে হয় না। যেমন– বাঁধাকপি, ফুলকপি।

(৪) **বাজারজাতকরণ সমস্যা :** বাংলাদেশে সবজির বাজারজাতকরণের সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। মূলত জলবায়ুর কারণে বছরের কোনো কোনো সময়ে সবজির সরবরাহ খুব কম, এসময় ক্রেতাদেরকে অধিক মূল্যে সবজি কিনতে হয়, যার দরুণ সবজির ব্যবহার কমে আসে। উৎপাদনে মৌসুমে চাহিদা আছে এমন স্থানে শাক-সবজির যথেষ্ট মূল্য থাকলেও উৎপাদন এলাকায় এর মূল্য থাকে খুবই কম। এতে কৃষক তা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত

হয়। বাংলাদেশে সবজি কেনা-বেঁচায় মধ্যস্বত্ব ভোগীরা সবজির পচনশীলতা ও কৃষকদের অসহায়ত্বে সুযোগ নিয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করে

(৫) শাক-সবজির উচ্চ উৎপাদন খরচ ও নিম্নমূল্য : সবজি চাষের উপকরণের মধ্যে বীজ, সার, ফসল সংরক্ষণের ওষুধ ও সিঞ্চন যন্ত্র প্রধান। এ সব উপকরণের প্রাপ্যতা, গুণাগুণ ও দাম খুব বেশি কিন্তু এগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে সবজি উৎপাদন করে যে আয় হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

(৬) শাক-সবজি উৎপাদনে যথাযথ ও সমন্বিত প্রচেষ্টার অভাব : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট অনেক উন্নত জাতের সবজির জাত আবিষ্কার করেছে কিন্তু এগুলো অনেক অঞ্চলের কৃষকদের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছায়নি।

২.৩. শাক-সবজির বর্তমান অবস্থা উন্নয়নের অগ্রগতি

শাক-সবজির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাতীয় ও কৃষক পর্যায়ে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে সে সম্বন্ধে বর্ণনা করা অথবা শাক-সবজি উৎপাদনে সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করা হলে, শাক-সবজির উন্নয়ন পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে। শাক-সবজির উৎপাদন ব্যবহার সার্বিক উন্নয়নে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

(১) ঘাটতি মৌসুমে শাক-সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি : জলবায়ুগত কারণে বছরের সব সময় সবজির উৎপাদন সমান থাকে না। যথাযথ উৎপাদন কৌশল ও উপযোগী জাতের ব্যবহারের মাধ্যমে ঘাটতি মৌসুমগুলোতে সবজি সরবরাহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(২) শাক-সবজি উৎপাদনে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে : শীতকালীন শাক-সবজির চাষ অনেকাংশে পানিসেচ সুবিধার উপর নির্ভরশীল। সেচের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সবজি চাষাধীন জমি বাড়ানো সম্ভব। একটি সুপরিকল্পিত গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অনায়াসে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব

(৩) শাক-সবজি ফলন বৃদ্ধি : উন্নত ও উপযোগী জাত দ্বারা সবজির ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। সকল কৃষকই যদি উন্নত জাতের সবজি চাষ করে তাহলে সবজির ফলন অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

(৪) বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করে : আমাদের কৃষকেরা খুবই কম পরিমাণে সবজি উৎপাদন করে এবং কম জমিতে সবজি চাষ করে। সবজি যদি বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয় তবে সবজি উৎপাদন বেড়ে যাবে।

(৫) সবজি বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে : বাংলাদেশের সব জায়গা বীজ উৎপাদনের জন্য উপযোগী। তাই যে অঞ্চলে বীজ উৎপাদন ভালো হয়, সেই এলাকায় বীজ উৎপাদন কার্য সম্পাদন করে আমরা ভালো বীজ পেতে পারি। সবজি বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করে সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

(৬) গবেষণা জোরদারকরণ : সবজি গবেষণায় জাত উন্নয়ন এবং প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফসল রক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিটি সবজির উন্নত জাত উদ্ভাবন করতে হবে। রোগ ও পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতা সামান্য জাত বের করা খুবই প্রয়োজন।

(ঘ) **উৎপাদন উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ :** উন্নত মানের বীজ নির্ভেজাল ওষুধ ও অন্যান্য উৎপাদন উপকরণ কৃষকেরা যাতে সময়মত এবং যুক্তিসঙ্গত দামে ক্রয় করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা।

এদেশে সবজি উৎপাদনে জলবায়ুর প্রভাব থাকার কারণে বছরের সবসময় সবজির উৎপাদন ও সরবরাহ একই থাকে না। ফলে বছরের কোনো কোনো সময় বিশেষ করে সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ও এপ্রিল-মে মাসে সবজির সরবরাহ অনেক কমে আসে। গ্রীষ্মকালীন সময়ে শাক-সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

ক. উৎপাদন কলাকৌশল ও উপযোগী জাতের ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রীষ্মকালীন সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। বর্তমানে এমন অনেক সবজি আছে যেগুলোর উভয় ঋতুতে জন্মানো উপযোগী জাত রয়েছে। যেমন- বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো এগুলো গ্রীষ্মকালে চাষ করা যায়।

খ. সবজি চাষে পানি সেচ ও নিকাশের সঠিক ব্যবস্থা থাকলে উৎপাদন অনেকাংশে বেড়ে যায়।

গ. সুপরিকল্পিত গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অনায়াসে গ্রীষ্মকালীন সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ঘ. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হেক্টর প্রতি ফলনে শাক-সবজির স্থান উঁচুতে। যেখানে টমেটো ও বাঁধাকপির হেক্টর প্রতি ফলন যথাক্রমে ৫০-৬০ টন, সেখানে চাল ও গমের ফলনের বিশ্বগড় ২-৩ টন। ক্যালোরিতে রূপান্তরিত করলেও বহু সবজি গম ও চাল অপেক্ষা অধিক উৎপাদনশীল।

ঙ. যে দেশে প্রচুর পরিমাণে শাক-সবজি খাওয়া হয়, সেখানে চাল, গম কিংবা ভুট্টা তথা প্রধান খাদ্য শস্যের চাহিদা কম।

চ. বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের বিকল্প খাদ্য হিসেবে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের পুষ্টি সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করলে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভব। ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা এমনভাবে সাজানো উচিত যাতে পুষ্টি উপাদানসমূহ অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা যায়। এসব ব্যবস্থার সাহায্যে পুষ্টি সমস্যার ব্যাপকতা কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

২.৩.১. মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সবজির পরিমাণ : বয়স ও ওজনভিত্তিতে একজন মানুষের ৫-৬ আউন্স খাওয়া উচিত। এর ভিত্তিতে দেশের প্রায় ১২ কোটি লোকের জন্য প্রায় ১০ মিলিয়ন টন সবজির প্রয়োজন। অথচ এখানকার সবজি (আলুসহ) বর্তমানে বার্ষিক উৎপাদন আড়াই মিলিয়ন টনের মতো। সুতরাং দেশের বর্তমান উৎপাদন চার গুণে পৌঁছানো প্রয়োজন।

উল্লেখযোগ্য যে, যেখানে বাংলাদেশে দৈনিক মাথা প্রতি মোটামুটি প্রায় ৫০০ গ্রাম দানা শস্য এবং ১০০ গ্রাম সবজি ও মূলজাতীয় খাদ্য খাওয়া হয়, সেক্ষেত্রে জাপানে ৩০০ গ্রাম দানা শস্য ও ৪০০ গ্রাম সবজি ও মূল, যুক্তরাজ্যে ২০০ গ্রাম দানা শস্য ও ৪৫০ গ্রাম সবজি ও মূল এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১৮০ গ্রাম দানা শস্য ও ৪০০ গ্রাম সবজি ও মূল খাওয়া হয়।

২.৪. সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়

সবজি উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সবজি উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এজন্য বাংলাদেশে সবজি চাষকৃত জমির পরিমাণ, সবজি উৎপাদন ও বিশ্বে সবজি উৎপাদন পরিস্থিতি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো। সবজির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

(১) সবজির উচ্চ ফলন শীল জাত উদ্ভাবন।

(২) পতিত জমিকে অধিক পরিমাণে শাক-সবজি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা।

(৩) সবজির প্রকারগত বহুমুখীকরণ।

(৪) প্লাবনমুক্ত পাহাড় এবং টেরাস এলাকায় সবজি উৎপাদন বাড়ানো।

(৫) হিমাগারের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি করে বীজ-আলু সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

(৬) বর্ষাকালে অধিক সবজি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে দেশের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম এলাকায় বিশেষ প্রকল্প প্রণয়ন

(৭) বাড়ি-ঘর, অফিস, স্কুল-কলেজ এবং রাস্তার পার্শ্ববর্তী পতিত জমিতে শাক-সবজি উৎপাদন

(৮) সুষম সার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

(৯) কীট-পতঙ্গ শত্রু ও রোগ দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১০) শিম, মিষ্টি আলু, শাক ও কচুজাতীয় সবজি উৎপাদন বাড়ানো।

(১১) লবণাক্ত অঞ্চলে চাষাবাদের জন্যে বিভিন্ন সবজির জাত উদ্ভাবন।

(ক) বাংলাদেশে সবজি চাষে জমির পরিমাণ ও উৎপাদন

বছর	খরিপ		রবি		মোট	
	জমি (০০০' একর)	উৎপাদন (০০০'টন)	জমি (০০০' একর)	উৎপাদন (০০০'টন)	মোট জমি (০০০'একর)	মোট উৎপাদন (০০০' টন)
১৯৯৩-৯৪	১৭৬	৩৬৯	২৭১	৭৯৬	৪৪৭	১১৬৫
১৯৯৪-৯৫	১৮২	৩৮৮	২৭৫	৮১১	৪৫৭	১১৯৯
১৯৯৫-৯৬	১৮৯	৩৯৮	২৮৩	৮৪৬	৪৭২	১২৪৪
১৯৯৬-৯৭	১৯৫	৪১১	২৯২	৮৭৮	৪৮৬	১২৮৯
১৯৯৭-৯৮	১৯৯	৪১৮	২৯৭	৮৮৭	৪৯৬	১৩০৫
১৯৯৮-৯৯	২১০	৪৭৩	৩২৪	১০৩৭	৫৩০	১৫১০

(খ) বাংলাদেশে সবজির উৎপাদন

বছর	খরিফ (টন/হেক্টর)	রবি (টন/হেক্টর)	গড় (টন/হেক্টর)
১৯৯৩-৯৪	৫.২	৭.৩	৬.২
১৯৯৪-৯৫	৫.৩	৭.৩	৬.৩
১৯৯৫-৯৬	৫.২	৭.৪	৬.৩
১৯৯৬-৯৭	৫.২	৭.৫	৬.৪
১৯৯৭-৯৮	৫.২	৭.৪	৬.৩
১৯৯৮-৯৯	৫.৫	৮.০	৬.৮

(গ) বিশ্বে সবজি উৎপাদন তথ্য

উৎপাদন কাল : ১৯৯৯ সাল	
দেশের নাম	পরিমাণ
আফ্রিকা - ৩৯২ লক্ষ টন	বাংলাদেশ ১৬ লক্ষ টন
উত্তর আমেরিকা - ৪৭৪ লক্ষ টন	চীন - ২৩৪৬ লক্ষ টন
দক্ষিণ আমেরিকা - ১৮৭ লক্ষ টন	ভারত - ৫৫৮ লক্ষ টন
এশিয়া - ৪০৫১ লক্ষ টন	জাপান - ১৩৬ লক্ষ টন
ইউরোপ - ৯১২ লক্ষ টন	ইরান - ১৩২ লক্ষ টন
ওশেনিয়া - ৩২ লক্ষ টন	সৌদিআরব - ২৪ লক্ষ টন
	তুরস্ক - ২১৭ লক্ষ টন
	ইন্দোনেশিয়া - ৪৭ লক্ষ টন

২.৫. সবজি উৎপাদনের সমস্যা

সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নানা সমস্যা বিরাজমান। নিচে প্রধান কয়েকটি সমস্যার উপর আলোকপাত করা হলো।

(১) **জলবায়ু ও মাটি সম্পর্কিত সমস্যা :** বিশ্বের প্রধান প্রধান সবজি বাংলাদেশে জন্মানো গেলেও এখানকার জলবায়ু সাধারণভাবে সবজি চাষের জন্য সর্বোত্তম নয়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত আবহাওয়া মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। এ সময় তাপমাত্রা কম থাকে এবং বাতাসও শুষ্ক থাকে। ফলে শীতপ্রধান অঞ্চলের অনেক সবজি জন্মানো যায়। কিন্তু মৌসুমের প্রথম দিকে বাজারে তুলতে হলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে শীতকালীন সবজির চাষ শুরু করতে হয়। তখন মাটি ভিজা থাকে।

কোনো কোনো সময় অতিবৃষ্টির দরুণ চারা অবস্থায় ফসল নষ্ট হয়। ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টির দরুণ নভেম্বর মাসে সবজি ফসল সম্পূর্ণ মারাও যায়। শীতের শেষে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়

এবং বাতাস শুকিয়ে আসে। মার্চ-মে মাসে বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত হলেও এ সময়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। তাপমাত্রার আধিক্যও এ সময়কার আরেক সমস্যা। খরিফ মৌসুমে অধিকাংশ জমিতে সঙ্কুচিত হয়ে আসে। ফলন উৎপাদনে এটি একটি বড় অসুবিধা।

(২) উৎপাদন উপকরণ সম্পর্কিত অসুবিধা : সবজি চাষের উপকরণের মধ্যে বীজ, সার, ফসল সংরক্ষণের ওষুধ ও সিঞ্চনযন্ত্র প্রধান। এসব উপকরণের প্রাপ্যতা কম, মূল্য বেশি। বীজের সমস্যা খুবই প্রকট। অনেক সবজির ভালো জাত নেই। ফলে সবজির ফলন ও মান কোনোটাই সন্তোষজনক নয়। কিছু সংখ্যক সবজি উৎকৃষ্ট মানের বীজ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। কিন্তু এ বীজের দাম খুব বেশি। অন্যান্য উপকরণের গুণাগুণ ও সরবরাহ নির্ভরযোগ্য নয়।

(৩) বাজারজাতকরণের সমস্যা : বাংলাদেশে সবজির বাজারজাতকরণের সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। মূলত জলবায়ুর কারণে বছরের কোনো কোনো সময় সবজির সরবরাহ কম, এ সময় ক্রেতাদেরকে অধিক মূল্যে সবজি কিনতে হয় যার দরুন সবজির ব্যবহার কমে আসে। অন্যান্য সময় সবজির সরবরাহ যথেষ্ট থাকার ফলে দাম কমে যায়।

বাংলাদেশে আলু ব্যতীত অন্যান্য সবজি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সবজি সংরক্ষণের প্রযুক্তি আজকাল কোনো সমস্যা নয়। সংরক্ষিত সবজি ব্যবহারে ক্রেতাদের সামর্থ্য কম।

(৪) অন্যান্য সমস্যা : বৈজ্ঞানিক উপায়ে সবজি উৎপাদন করতে প্রচুর কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন। বাংলাদেশে কৃষিকাজের বেশিরভাগ নিরক্ষর কৃষকদের হাতেই রয়ে গেছে। ফলে অনেক উন্নত প্রযুক্তি থাকলেও সেগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে না।

২.৬. সবজি উৎপাদন সমস্যার সমাধান

সবজি উৎপাদন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১) সবজি গবেষণায় জাত উন্নয়ন এবং প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফসল রক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

(২) প্রতিটি সবজির উন্নত জাত উদ্ভাবন করতে হবে।

(৩) রোগ ও পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাত অবমুক্ত করা খুবই প্রয়োজন।

(৪) বাঁধাকপি ও ফুলকপিসহ অনেক সবজির গ্রীষ্মকালীন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে এগুলোর চাষ সম্প্রসারণ করতে হবে।

(৫) উন্নত মানের বীজ, ওষুধ ও অন্যান্য উপকরণ কৃষকরা যাতে সময়মতো ক্রয় করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) সব সবজি বীজ অধিক পরিমাণে উৎপাদন উৎসাহিত করা উচিত।

(৭) যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, পাইকারী বাজার স্থাপন, অধিক সবজি খাওয়ার উপকারিতা সম্বন্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সবজি সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালের চেয়ে শীতকালে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে সবজি উৎপাদিত হয়ে থাকে। সারা বছরের মাথাপিছু সবজির চাহিদা সমান থাকলেও গ্রীষ্মকালীন সবজির চাষ ও ফলন বাড়ানো প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার মাধ্যমে গ্রীষ্মকালে চাষযোগ্য সবজির সংখ্যা বৃদ্ধি করার সাথে সেগুলোর ফলন বাড়ানোর প্রতি নজর দিতে হবে। কিছু কিছু সবজি বীজের সংরক্ষণের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। সার্বিকভাবে সবজি চাষে বিজ্ঞানভিত্তিক কলা-কৌশল ব্যবহার করে গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন সবজির চাষ বাড়ানো ও উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়

সবজির শ্রেণিবিভাগ

৩.০. সবজির শ্রেণিবিভাগ

সবজি ফসলকে শ্রেণিভুক্ত করার একাধিক উপাদান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্যে উৎপাদন মৌসুম ভক্ষণযোগ্য অংশ এবং উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করা হলে বিভিন্ন সবজির পারস্পরিক নৈকট্য সহজেই বোঝা যায় এবং এদের গুণাগুণ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সবজির শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো।

৩.১. উৎপাদন মৌসুম অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ

উৎপাদন মৌসুম অনুযায়ী বাংলাদেশের সবজিসমূহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. রবি সবজি : শীতকালে জন্মানো হয়। যেমন– ফুলকপি, টমেটো, লাউ, মুলা, পালংশাক, গাজর, লেটুস, ওলকপি, শিম।

খ. খরিফ সবজি : গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে জন্মানো হয়। যেমন- চালকুমড়া, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দুল, চালকুমড়া, কাকরোল, ঢেঁড়শ, করলা, ডাটা, পুঁইশাক, কচু ও বরবটি।

গ. বারমাসী সবজি : সারা বছর জন্মে। যেমন– লালশাক, পেঁপে, বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, শসার অনেক জাত।

রবি মৌসুম পয়লা অক্টোবর থেকে ৩১ মার্চ এবং খরিফ মৌসুম ১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত। যেসব সবজির জন্যে অপেক্ষাকৃত শীতল ও শুষ্ক পরিবেশ প্রয়োজন সেগুলো রবি মৌসুমে জন্মানো হয়। খরিফ সবজিসমূহ উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে জন্মাতে সক্ষম।

৩.২. ভক্ষণযোগ্য অংশ অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ

ফসলের প্রকারভেদে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ সবজি হিসেবে খাওয়া হয়, এজন্যে প্রধান ভক্ষণযোগ্য অংশ অনুযায়ী সবজি ফসলকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. পাতা সবজি : যেসব সবজির পাতা বা কাণ্ডের ডগা প্রধান ভক্ষণযোগ্য অংশ, সেগুলো এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পত্রবহুল সবজির মধ্যে যেগুলো সিদ্ধ না করে খাওয়া হয় সেগুলো সালাদ নামে পরিচিত। শীতপ্রধান দেশে অনেক ধরনের সালাদ সবজির চাষ হয়, যেমন- লেট্যুস, সিলোরি, চিকোরি, এন্ডাইভ, ক্রেশ, পার্সলি ইত্যাদি। সাধারণভাবে অন্যান্য সবজি অপেক্ষা পত্রবহুল সবজির পুষ্টিমান বেশি। এতে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্য থাকে।

খ. **ফল সবজি** : কুমড়াজাতীয় সবজি বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়স ইত্যাদি প্রধান ফল সবজির উদাহরণ।

গ. **কন্দাল সবজি** : উদ্ভিদের স্ফীত ও রূপান্তরিত অঙ্গকে কন্দ বলে। উৎপত্তি অনুযায়ী কন্দ তিন প্রকার, যথা- কাণ্ডজ কন্দ, মূলজ কন্দ এবং পত্রজ কন্দ।

উদ্ভিদের প্রকারভেদে কাণ্ডজ কন্দ বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- টিউবার (আলু), টিউবারকল বা বুলবিল (মেটে আলু), করম ও করমেল (মুখীকচুর গুঁড়িকন্দ ও মুখী) রাইজোম (আদা, হলুদ) ইত্যাদি। পত্রজ কন্দের মধ্যেও বৈচিত্র্য বিদ্যমান। পেঁয়াজ ও রসুন উভয়ই পত্রজ কন্দ, কিন্তু এদের গঠন ভিন্ন।

ঘ. **কাণ্ড সবজি** : কিছু সবজিতে কাণ্ডই প্রধান ভক্ষণযোগ্য অংশ, ডাটা ও পানিকচু লতি এ শ্রেণীতে পড়ে।

ঙ. **ফুল সবজি** : ফুলকপি ও ব্রোকলি এ শ্রেণীর প্রধান দুটি সবজি। এগুলোর পুষ্পমঞ্জুরিই প্রধান ভক্ষণযোগ্য অংশ। মিষ্টি কুমড়া, শাপলা ইত্যাদি আরও অনেক উদ্ভিদের ফুল সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চ. **বীজ সবজি** : শিম গোত্রের প্রায় সব সবজির বীজই আলাদাভাবে খাওয়া হয়।

৩.৩. উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ

উদ্ভিদের এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যার ভিত্তিতে এগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। যেমন- দৈহিক গঠন, জীবনকালের স্থায়িত্ব, শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান ইত্যাদি।

ক. **জীবনকালভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ** : জীবনকালের স্থায়িত্ব অনুযায়ী সব সবজিকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) বর্ষজীবী
(২) দ্বিবর্ষজীবী
(৩) বহুবর্ষজীবী বা দীর্ঘজীবী সবজি

এগুলোর মধ্যে বর্ষজীবীর সংখ্যা সর্বাধিক, এক মৌসুমেই এগুলোর জীবনচক্র শেষ হয়।

যেসব সবজি একবার লাগালে কয়েক বছর বেঁচে থাকে সেগুলোকে দীর্ঘজীবী সবজি বলে। যেমন- বেগুন, কচু, মেটে আলু, কাকরোল, পটল, পুঁইশাক, শতমূলী ইত্যাদি।

খ. **দৈহিক গঠনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ** : দৈহিক গঠন অনুযায়ী সবজি ফসলসমূহকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। তৃণ গুল্ম সবজি।
২। কাষ্ঠল সবজি।

১। তৃণ গুল্ম শ্রেণীর উদ্ভিদের কাণ্ড রসাল যদিও বয়স বাড়ার সাথে সাথে কোনো কোনোটি আংশিক কাষ্ঠল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। তৃণ গুল্ম উদ্ভিদের মধ্যে যেগুলো খাটো ও খাড়া সেগুলোকে বলে বীরুৎ এবং যেগুলোর কাণ্ড দীর্ঘ ও মাটির উপর দিয়ে গড়ায় কিংবা কোনো আশ্রয়ের উপর ভর করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেগুলোকে লতানো

৩.৪. বৃদ্ধির ধরন অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ

বৃদ্ধির ধরন অনুযায়ী কাষ্ঠল উদ্ভিদ তিন প্রকার, যথা-

ক. গুল্ম (Shrub) কাষ্ঠল।

খ. লতা (Vine) কাষ্ঠল।

গ. বৃক্ষ (Tree) এর সব দীর্ঘজীবী।

৩.৫. সবজির মৌসুমভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

৩.৫.১. রবি মৌসুম : বাংলাদেশে আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রেক্ষিতে রবি মৌসুমের সবজি তিন প্রকার হতে পারে যথা–

ক. আগাম রবি জাতের বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক

খ. মধ্য রবি অধিকাংশ রবি সবজি।

গ. নাবী রবি জাতের বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক।

৩.৫.২. খরিফ সবজি : বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু অনুসারে খরিফ সবজি নিম্নরূপ হতে পারে। যথা–

ক. গ্রীষ্মকালীন সবজি।

খ. মধ্য বর্ষাকালীন সবজি।

গ. নাবী বর্ষা সবজি

৩.৫.৩. সবজির উদ্ভিদতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগের উদাহরণ : সবজি শ্রেণিবিন্যাসগত (Taxonomic) শ্রেণিকরণের প্রধান ৫টি ধাপ রয়েছে। যথা–

পর্ব (Phylum)

বিভাগ (Division)

গোত্র (Family)

গণ (Genus)

প্রজাতি (Species)

সবজির শ্রেণিবিন্যাসগত উদাহরণ যেমন- টমেটো

গোত্র Solanaceae

গণ *Lycopersicon*

প্রজাতি *esculentum*

গোত্র Cruciferae

ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, মুলা ইত্যাদি।

গোত্র Solanaceae

বেগুন, আলু, টমেটো

গোত্র Malvaceae

ঢেঁড়স, চুকাই।

গোত্র Cucurbitaceae

লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, করলা, কাকরোল, পটল, শসা, ধুন্দুল

গোত্র Leguminoceae

শিম, ঝাড়শিম, বরবটি, মেলন ইত্যাদি।

৩.৬. **শাকসবজি :** উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের অংশবিশেষ যা রান্না করে খাওয়া হয় (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) তাকে শাকসবজি বলে।

৩.৬.১. **শাকসবজির শ্রেণিবিভাগ :** শাকসবজিকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। যথা–

৩.৬.১.১. তাপমাত্রার প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ

ক. গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বা উষ্ণমণ্ডলীয় শাকসবজি : এগুলো উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, উচ্চ তাপমাত্রায় (৩০-৩৫° সে) জন্মাতে পারে। যেমন– শসা, চালকুমড়া, চিচিঙ্গা, পটল ইত্যাদি।

খ. অর্ধ-উষ্ণমণ্ডলীয় শাকসবজি : এ প্রকারের শাকসবজি সাধারণত অর্ধউষ্ণ অঞ্চলে (২৫-৩০° সে.) জন্মায়।

যেমন– বেগুন, ঢেঁড়শ ইত্যাদি।

গ. নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শাকসবজি : এগুলো সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে (১৫-২৫° সে. তাপমাত্রায়) জন্মায়। যেমন– বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি ইত্যাদি।

ঘ. শীতল তাপমাত্রার শাকসবজি : এ প্রকারের শাকসবজি সাধারণত ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় (১০-১৫° সে. তাপমাত্রায়) জন্মে। যেমন– ব্রাসেলস স্প্রাউট, লিক ইত্যাদি।

৩.৬.১.২. জীবনচক্রের দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ

ক. বর্ষজীবী শাকসবজি : জীবনচক্র এক মৌসুম বা এক বছরের কম সময়ে শেষ করে। যেমন– টমেটো, মুলা, মিষ্টি কুমড়া, আলু ইত্যাদি।

খ. দ্বিবর্ষজীবী শাকসবজি : জীবনচক্র দুই মৌসুম বা দুই বছরের কম সময়ে শেষ করে। এদের ক্ষেত্রে প্রথম মৌসুমে অঙ্গজ বৃদ্ধি হয় এবং দ্বিতীয় মৌসুমে ফুল, ফল হয়। প্রথম মৌসুমে তাপমাত্রা বেশি লাগে, দ্বিতীয় মৌসুমে তাপমাত্রা কম লাগে। যেমন– বাঁধাকপি, শালগম, গাজর ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ফুলকপি, মুলা, পেঁয়াজের কিছু জাত বর্ষজীবী, কিছু জাত দ্বিবর্ষজীবী।

গ. বহুবর্ষজীবী শাকসবজি : এগুলো দুই বছরের অধিক সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। যেমন– ওল, অ্যাসপারাগাস ইত্যাদি।

৩.৬.১.৩. বৃদ্ধির ধরন অনুসারে শ্রেণিবিভাগ

ক. বীরুৎজাতীয় শাকসবজি : এরা ছোট এবং রসালো উদ্ভিদ। এরা দু' প্রকার। যথা–

ক.১. বীরুৎজাতীয় : এরা লতানো হয় না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবলম্বন দেয়া হয়। যেমন– ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু, টমেটো ইত্যাদি।

খ.২. লতাজাতীয় : এরা লতানো হয়। যেমন– মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, শসা, চিচিঙ্গা ইত্যাদি।

খ. গুল্মজাতীয় শাকসবজি : সামান্য কাষ্ঠল গাছ এবং ছোট হয়। যেমন– বেগুন, ঢেঁড়শ, চুকাই ইত্যাদি।

গ. বৃক্ষজাতীয় শাকসবজি যেমন– সজিনা, বকফুল ইত্যাদি।

৩.৬.১.৪. জন্মানোর মৌসুম অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ

ক. শীতকালীন বা রবি শাকসবজি : এরা সাধারণত শীতকালে (অক্টোবর-মার্চ) জন্মায়। যেমন– ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু, টমেটো ইত্যাদি।

খ. গ্রীষ্মকালীন বা খরিফ শাকসবজি : এগুলো সাধারণত গ্রীষ্মকালে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) জন্মায়। যেমন- সব কুমড়াজাতীয় সবজি, ঢেঁড়শ, পুঁইশাক, ডাঁটা ইত্যাদি।

গ. সারা বছর জন্মানো শাকসবজি : এসব শাকসবজি সারা বছর জন্মায়। যেমন- বেগুন, মরিচ ইত্যাদি।

৩.৬.১.৫. উদ্ভিদের ভক্ষণীয় অংশের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ

ক. মাটির উপরের অংশ ব্যবহৃত হয়– এমন সবজির শ্রেণিবিভাগ।

ক.১. কোল (cole) শাকসবজি- ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলখল, ব্রকোলি, ব্রাসেলস স্প্রাউট ইত্যাদি।

ক.২. ফলজাতীয় শাকসবজি- টমেটো, মরিচ, ঢেঁড়স ইত্যাদি।

ক.৩. মিষ্টি কুমড়া বা লতাজাতীয় শাকসবজি যেমন- মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, চিচিঙ্গা, শসা ইত্যাদি।

ক.৪. লিগিউম বা ডালজাতীয় শাকসবজি- মটর, শিম, বরবটি ইত্যাদি।

ক.৫. সালাদজাতীয় শাকসবজি- লেটুস, পুদিনা ইত্যাদি।

ক.৬. পাতাজাতীয় শাকসবজি (যেগুলোর পাতা শাক হিসেবে খাওয়া যায়) যেমন- পুঁইশাক, পালংশাক, লালশাক, বাটিশাক ইত্যাদি।

খ. মাটির নিচের অংশ ব্যবহৃত হয়– এমন সবজির শ্রেণিবিভাগ।

খ.১. মূলজাতীয় সবজি- গাজর, বিট, শালগম, মিষ্টি আলু, মুলা ইত্যাদি

খ.২. কন্দজাতীয় সবজি- আলু।

খ.৩. শল্কজাতীয় সবজি- পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি।

খ.৪. কর্মজাতীয় সবজি- ওল।

খ.৫. রাইজোমজাতীয় সবজি- আদা, হলুদ ইত্যাদি।

৩.২.১.৬. উদ্ভিদতাত্ত্বিক সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ

ক. একবীজপত্রী শাকসবজি

গ্রীষ্মকালীন সবজি	গোত্র **Araceae**	
বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম
১. পানি কচু, মুখী কচু, গাড়ো কচু, পঞ্চমুখী	Taro	*Colocasia esculenta*
২. মান কচু/ফেন কচু	Giant taro	*Alocasia indica Alocasia macrorrhiga*
৩. ওল কচু	Elephant foot	*Amorphophallus companulanus*
৪. দুধ কচু	Cocoyam	*Xanthosoma violaceum*
৫. মৌলভী কচু	Tarria	*Xanthosoma atrovicens*
শীতকালীন সবজি	গোত্র Liliaceae/Alliaceae	
১. পেঁয়াজ	Onion	*Allium cepa*
২. রসুন	Garlic	*Allium sativum*
৩. বান্চিং পেঁয়াজ	Bunching onion	*Allium fistulosum*

খ. দ্বিবীজপত্রী শাকসবজি

গ্রীষ্মকালীন সবজি	গোত্র Malvaceae	
বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম
১. ঢেঁড়শ	Lady's Finger (Okra)	*Hibiscus esculentus*
২. চুকাই	Red sorrel	*Hibiscus sabdariffa*
শীতকালীন সবজি	গোত্র Liliaceae/Alliaceae	
১. মিষ্টি কুমড়া	Sweet gourd	*Cucurbita moschata*
২. শসা	Cucumber	*Cucumis sativus*
৩. বাঙ্গি বা ফুটি	Musk melon	*Cucumis melo*
৪. তরমুজ	Water melon	*Citrullus lanatus*
৫. চাল কুমড়া	White gourd (or oar gourd)	*Benincasa cerifera B. hispida*
৬. ঝিঙ্গা	Ribbed gourd	*Luffa reutangula*
৭. ধুন্দুল	Sponge gourd	*Luffa cylindrica*

৮. করলা	Bitter gourd	*Momordica charantia*
৯. কাকরোল	Teasle gourd	*Momordica cochinchinensis*
১০. চিচিঙ্গা	Snake gourd	*Trichosanthes anguina*
১১. পটল	Pointed gourd	*Trichosanthus dioica*
১২. পুঁইশাক (সাদা)	Indian spinach (White)	*Basella alba*
১৩. পুঁইশাক (লাল)	Indian spinach (red)	*Basella rubra*
গোত্র Amaranthaceae		
১. লালশাক	Lal shak	*Amaranthus gangeticus*
২. ডাঁটাশাক	Data shak	*A. lividus*
৩. নটেশাক	Niole shak	*A. oleraceus*

শীতকালীন সবজি	গোত্র Solanaceae	
বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম
১. গোল আলু	Potato	*Solanum tuberosum*
২. বেগুন	Brinjal	*S. melongena*
৩. টমেটো	Tomato	*Lycopersicon esculentum*

শীতকালীন সবজি : গোত্র Leguminose

১. মটর	Pea	
২. শিম	Bean	*Lablab purpureus*
৩. বরবটি	Cois pea	*Vigna sinensis*
৪. ফরাসি শিম	French bean	*Phaseolus vulgaris*
গোত্র Cucurbitaceae		
১. লাউ	Bille gourd	*Lagenaria vulgris*
২. কোয়াস	Squash	*Cucurbita marina*
গোত্র Cruciferae		
১. পেঁয়াজ বাঁধাকপি	Cabbage	*Brassica oleracea* var. *capitata*
২. ফুলকপি	Cauliflower	*B. oleraceae* var. *botrytis* sub var. cauliflaora

৩. ওলকপি	Knolkhol/khalrabe	*B. oleracea* var. *gemmifera*
৪. ব্রাসেল'স স্প্রাউট	Brussel's sprout	*B. oleracea* var. *gemmifera*
৫. ব্রকোলি	Broccole	*B/ Oleracea* var. *italica sieb var cymosa*
৬. শালগম	Turnip	*B. Campestris* subsp. *rapifara* var. *rapa*
৭. মুলা	Radish	*Raphanus sativus*
	গোত্র Chenopodiaceae	
১. পালংশাক	Spinach	*Spinacea oleracea*
২. বিট	Beet	*Beta vulgaris*
শীতকালীন সবজি	গোত্র Umbelliferae	
বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম
১. গাজর	Carrot	*Daucus carota*
	গোত্র Convolvulaceae	
১. মিষ্টি আলু	Sweet patato	*Ipomiea batatus*
২. কলমি শাক	Swamp cabbage	*I. aquatica*
	গোত্র Compositae	
১. লেট্যুস	Lettuce	*Lactuca sativa*
	গোত্র Moringaceae	
১. সাজনা	Drumstick	*Moringa oleifera*
	গোত্র Agaricaceae	
১. মাশরুম	Mushroom	*Agaricus bisporus*
	গোত্র Dioscoreaceae	
১. মেটে আলু বা পেস্তা আলু	Dioseorea	*Dioscorea alata*
	গোত্র Lliaceae	
১ অ্যাসপারাগাস	Asparagus	*Asparagus officinalis*

৩.৭. সবজির উদ্যানতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ

উদ্যানতাত্ত্বিক চাষ নীতিমালার ভিত্তিতে সবজিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন–

ক. ছিটানো সবজি : বীজ জমিতে সরাসরি ছিটিয়ে বোনা হয়; যেমন– মুলা, লালশাক, ডাটা।

খ. সরু সারির সবজি : স্বল্প দূরত্বের সারিতে বীজ ছিটিয়ে বোনা যায়। সারির দূরত্ব ২৫-৩৫ সেন্টিমিটার। যেমন– লালশাক, সরিষা শাক, পাটশাক।

গ. চারা প্রশস্ত সারির সবজি : সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০-৬০ সেন্টিমিটার দিতে হয় এবং চারা রোপণ করা হয়। যেমন– ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো।

ঘ. মাদা সবজি : ১-২ মিটার দূরত্বের সারিতে মাদা করে বীজ বুনতে হয়। যেমন– করলা, পটল, মিষ্টি কুমড়া, খিরা।

ঙ. মাচা সবজি : সবজি উৎপাদনের জন্য মাচা তৈরি করতে হয় বা ঘরের চালে বা অন্য গাছে বাইয়ে দিতে হয়। যেমন– লাউ, শিম, চিচিঙ্গা, কাকরোল।

চ. মাঠ ফসল সবজি : এসব সবজি বৃহদাকার জমিতে মাঠ ফসলের মতো চাষ করা হয়। যেমন– মিষ্টি আলু, কচু, মটর।

চতুর্থ অধ্যায়

সবজি উৎপাদনের বাস্তুগত উপাদান

৪.০. বাস্তুগত উপাদান

সবজি উৎপাদনের সাফল্য যেসব বাস্তুগত উপাদানের উপর নির্ভর করে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৪.১. জলবায়ু ও আবহাওয়া : জলবায়ু বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত। যথা- কোনো স্থানের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, সূর্যের আলো, বায়ুর প্রবাহ ও আর্দ্রতা। উদ্ভিদের জীবনচক্র কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত, যেমন বীজের অঙ্কুরোদগম, দৈহিক বৃদ্ধি, ফুল ও ফল ধারণ ও ফলের পরিপক্বতা লাভ ইত্যাদি। জীবনচক্রের এসব পর্যায়ে উপরিল্লিখিত উপাদানের প্রভাব নিম্নরূপ।

৪.১.১. তাপমাত্রা : বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকায় ১০° থেকে ৪০°সেঃ এর মধ্যে উঠা-নামা করে বাংলাদেশে মাসিক গড় (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন) তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেঃ) নিচে উল্লেখ করা হলো–

মাস	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে.)	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (° সে.)
জানুয়ারি	১৫-২৪	৯-১৫
ফেব্রুয়ারি	১৭-৩০	১১-১৭
মার্চ	১৯-৩৪	১৫-২৩
এপ্রিল	৩১-৩৬	২০-২৪
মে	৩১-৩৮	২০-২১
জুন	২৯-৩৪	২৪-২৬
জুলাই	২৯-৩২	২৫-২৭
আগস্ট	২৯-৩২	২৪-২৭
সেপ্টেম্বর	৩০-৩২	২২-২৬
অক্টোবর	৩০-৩২	২২-২৫
নভেম্বর	২০-৩০	১৭-২১
ডিসেম্বর	১৬-২৭	১১-১৫

তাপমাত্রার আঞ্চলিক ব্যবধান অপেক্ষা ঋতুকালীন ব্যবধান অনেক বেশি। এপ্রিল-মে মাসে তাপমাত্রার উর্ধ্বসীমা সবচেয়ে উপরে উঠে এবং জুন-অক্টোবর মাসে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ব্যবধান কমে আসে

৪.১.১.১. তাপমাত্রার প্রভাব : উদ্ভিদের জীবনচক্র নিচের তিনটি মৌলিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যথা–

১) সালোকসংশ্লেষণ : সালোকসংশ্লেষণের সাহায্যে উদ্ভিদ খাদ্যোপাদান থেকে আলোর সাহায্যে যৌগিক পদার্থ তৈরি করে।

২) শ্বসন : শ্বসনের মাধ্যমে উদ্ভিদ কর্তৃক সংশ্লেষিত যৌগিক পদার্থ নিজের কাজে লাগায়।

৩) খাদ্য সংগ্রহ : মাটি ও বায়ুমণ্ডল থেকে খাদ্যোপাদান শোষণ এবং বিভিন্ন অঙ্গে ব্যবহার করে।

উপরিলিখিত প্রক্রিয়াসমূহ তাপমাত্রা নির্ভর। ফলে উদ্ভিদের জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায়েই তাপমাত্রার প্রভাব রয়েছে। উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি প্রধানত সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের ভারসাম্যের উপর নির্ভরশীল। শ্বসনের হার তাপমাত্রার সাথে সমানুপাতিক। কিন্তু সালোকসংশ্লেষণ হার একটি বিশেষ তাপমাত্রার উপরে গেলেও বাড়ে না। অধিকাংশ উদ্ভিদ জন্মে থাকে ৩০° সেঃ এর কাছাকাছি তাপমাত্রায়। শীতপ্রধান অঞ্চলের অধিকাংশ সবজি ফসলে ফুল ধরার জন্য নির্দিষ্ট নিম্ন তাপমাত্রা আবশ্যক। এসব সবজি আমাদের দেশে দ্বিবর্ষজীবী সবজি নামে পরিচিত প্রকৃতপক্ষে এদের জীবনচক্র পূর্ণ হতে ২ বছর লাগে না। ফল ধরার উপর শৈত্যের এ প্রভাবকে হিমাবেশন (vernalization) বলা হয়। দ্বিবর্ষজীবী সবজি বপনের পূর্বে বীজ নিম্ন তাপমাত্রায় রেখে শীতের প্রভাব কমানো যায়। কপি গোত্রের সব সবজি যথা– শালগম, মুলা, সরিষা, চীনাকপি, এবং গাজর, বিট, পালংশাক, পেঁয়াজ, লেটুস ও মটর ইত্যাদি দ্বিবর্ষজীবী সবজির উদাহরণ।

৪.১.১.২. উদ্ভিদের উপর তাপমাত্রার প্রভাব : উদ্ভিদের উপর তাপমাত্রার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো

(১) শারীরবৃত্তীয় ও জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর তাপমাত্রার প্রভাব : বিশিষ্ট উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ববিদ Van Hoff এর সূত্রানুসারে প্রতি ১০° সেঃ তাপমাত্রা বাড়ার জন্য গাছের ভিতরে সম্পন্ন বিভিন্ন রাসায়নিক ও আলোক রাসায়নিক প্রক্রিয়া যথাক্রমে ২-৩ এবং ১-২ গুণ বেড়ে যায়। দেখা গেছে যে, তাপমাত্রা যখন ০-৩৫° সেঃ এর মধ্যে থাকে তখন প্রতি ১০° সেঃ তাপমাত্রা বাড়ার জন্য সংলোকসংশ্লেষণ ১.৫-১.৬ গুণ এবং শ্বসন ২-২.৫ গুণ বেড়ে যায়। যেমন–

(১) শর্করা সঞ্চিত হওয়া;
(২) গোল আলুর ২০° সেঃ সালোকসংশ্লেষণ সর্বোচ্চ হয় এবং ৪৮° সেঃ এ শ্বসন সর্বোচ্চ হয়;
(৩) নিম্ন তাপমাত্রা : ০° সেঃ বা তারও নিচে;
(৪) টার্গার চাপ : সঠিক থাকে;
(৫) শিকড় কর্তৃক আহরিত খাদ্য উপাদানের সঞ্চালন ১৮-২২° সে.।

(২) বীজের অঙ্কুরোদগমে তাপমাত্রার প্রভাব : অঙ্কুরোদগমের জন্য শাক-সবজি বীজের একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় উক্ত তাপমাত্রায় বীজের সহজে ও দ্রুত অঙ্কুরোদগম ঘটে তাপমাত্রা উপরে বা নিচে থাকলে অঙ্কুরোদগম প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়

এবং এক পর্যায়ে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। যেমন– টমেটো বীজে ২৫° সেঃ তাপমাত্রায় ৬-৭ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম করে। কিন্তু তাপমাত্রা নিচে নেমে ১২-১৩° সেঃ এ পৌছলে অঙ্কুরোদ্গম হতে ১২ দিন সময় লাগে।

(৩) **শাক-সবজির চারার উপর তাপমাত্রার প্রভাব :** অঙ্কুরোদ্গমের পর বিশেষ করে ১-১২ দিন মধ্যে অনেক শাকসবজির চারাকে অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রায় (১১-১২° সেঃ) জন্মানো উচিত। এ সময়ের নিম্ন তাপমাত্রা চারাকে তেজস্বী শিকড় গুচ্ছ তৈরি করতে সাহায্য করে। কম তাপমাত্রায় শ্বসনের তুলনায় সালোকসংশ্লেষণের হার বেশি থাকে বিধায় চারায় শর্করা মজুদের পরিমাণ বেশি হয়। ফলে মাঠে রোপণের পর পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা সহ্য করে চারা সহজেই বেঁচে উঠতে পারে। তাপমাত্রা শাক সবজির ফুল ধারণকেও প্রভাবান্বিত করে। যেমন– টমেটো শীতকালীন সবজির ক্ষেত্রে চারা রোপণের সময় পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত একটু বেশি হওয়া উচিত (১৫-২০° সেঃ)।

৪) **অঙ্গজ বৃদ্ধিতে তাপমাত্রার প্রভাব :** শাক সবজির অঙ্গজ বৃদ্ধিতে তাপমাত্রার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এ পর্যায়ে বিভিন্ন শাক সবজির তাপমাত্রার চাহিদা বিভিন্ন রকম। মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাপমাত্রা এমন হওয়া উচিত যাতে গাছে সালোকসংশ্লেষণের মাত্রা অধিক হয় এবং শ্বসন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক হারে চলে। এতে গাছ অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করে যা গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি এবং অধিক ফলনে সহায়ক হয়।

(১) পাতাজাতীয় শাক, সবজি	:	১২-১৭° সেঃ দিবসকালীন তাপমাত্রা;
(২) টমেটো, শিম, বেগুন, পেঁয়াজ	:	২০-২৫° সেঃ;
(৩) ফলজাতীয় সবজি	:	২৫-৩০° সেঃ;
(৪) মূলজাতীয় সবজি	:	১৫-২২° সেঃ;

এছাড়া–

(১) অধিক তাপমাত্রা ও বায়ুতে কম জলীয় বাষ্প;

(২) অধিক তাপমাত্রা ও অতিরিক্ত বায়বীয় জলীয় বাষ্প

(৩) রাতের তাপমাত্রা

পালংশাক, লেটুস, বাঁধাকপি : ৭-১৩° সেঃ;

বেগুন : ১৩-১৮° সেঃ; টমেটো, মিষ্টি আলু, ঢেঁড়শ : ১৮-২৪° সেঃ

(৫) **ফলোৎপাদনে তাপমাত্রার প্রভাব :** শাক-সবজির ফুল ও ফল উৎপাদন কালে তাপমাত্রা তুলনামূলক কিছুটা কম থাকা উচিত। তাতে গাছে শ্বসনের চেয়ে সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি পায় এবং ফলে সঞ্চিত শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়। ফুল ও ফল উৎপাদনের সময়ে গাছ খুব অল্প সংখ্যক দেহকোষ তৈরি করে থাকে। এজন্য অঙ্গজ বৃদ্ধিতে সঞ্চিত শর্করার ব্যবহার এ সময় কম হয়। গাছে শ্বসনের হারও এ সময় কম থাকার কারণে গাছ তার সঞ্চিত খাদ্য অধিক পরিমাণে ফুল ও ফল উৎপাদনে

ব্যবহার করতে পারে টমেটো গাছের ফুলের পরাগায়নে তাপমাত্রার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। যথা– অধিক তাপমাত্রায় টমেটো ফুলের গর্ভকেশর অতিরিক্ত লম্বা হয়ে যায়। উচ্চ তাপমাত্রায় গর্ভমুণ্ড শুকিয়ে যায়।

নিম্ন তাপমাত্রায় পরাগ রেণু নষ্ট হয়ে যায়– যা স্ব-পরাগায়নকে বিঘ্নিত করে।

অত্যধিক নিম্ন তাপমাত্রায় কীট-পতঙ্গের তৎপরতা তুলনামূলকভাবে কমে যায় বিধায় শীতকালে জন্মানো Cucurbitaceae গোত্রের সবজি যেমন– লাউ এবং কুমড়ার পর পরাগায়নের হার কমে যায় ফলের গুণাগুণকেও তাপমাত্রা প্রভাবিত করে।

লেটুস	:	২১° সেঃ
গাজর	:	১২-২১° সেঃ
বিট	:	ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়
টমেটো	:	১৮-২৪° সেঃ থাকলে উত্তম লাল

২৭° সেঃ এর চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় টমেটো হলুদ রঙের ভাব বাড়তে থাকে।

(৬) সংগৃহীত ফসলের উপর তাপমাত্রার প্রভাব : যেসব সবজি ফসলে সাধারণত অধিক পরিমাণে শর্করা থাকে, সংগ্রহের পর সেগুলোতে প্রধানত নিম্নলিখিত বিক্রিয়া ঘটে থাকে

(১) চিনি → শর্করা

(২) শর্করা → চিনি

(৩) চিনি → (CO_2+H_2O+Heat+শক্তি)

নিম্নতাপমাত্রায় : ১ম ও ৩য় বিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম হারে চলে। এজন্য নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষিত সবজি ফসলে চিনি বেশি পরিমাণে সঞ্চিত হয়। উদাহরণ– আলু ০-৪° সেঃ তাপমাত্রায় সঞ্চিত করলে মিষ্টি হয়ে যায়।

উচ্চ তাপমাত্রায় তিন ধরনের বিক্রিয়াই বেশি হারে চলে। তবে তৃতীয় বিক্রিয়া তুলনামূলকভাবে বেশি মাত্রায় হয়। এমতাবস্থায় চিনির পরিমাণ কমে আসে। অতিরিক্ত নিম্ন তাপমাত্রায় বেশিদিন গুদামজাত করা হলে সবজি ৩০-৭০% ভিটামিন সি বাড়ায়। বিশেষ করে গোলআলুর ক্ষেত্রে এটি ঘটে থাকে।

(৭) শাক-সবজির সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা : তাপমাত্রা এরূপ হওয়া উচিত যাতে গাছের সালোকসংশ্লেষণ অধিক হয় কিন্তু শ্বসন স্বাভাবিক হারে চলে ফলে গাছে অঙ্গজ বৃদ্ধি এবং ফলোৎপাদনের জন্য অধিক পরিমাণে শর্করা সঞ্চিত হয়।

ক. সর্বোত্তম তাপমাত্রা : যে তাপমাত্রায় গাছ যথেষ্ট পরিমাণ শর্করা সঞ্চয়ের মাধ্যমে তার স্বাভাবিক অঙ্গজ বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে অধিক ফলন দেয় তাকেই সে গাছের কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রা বলে।

খ. সর্বোচ্চ তাপমাত্রা : সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বলতে সেই তাপমাত্রাকে বোঝায় যাতে গাছ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে তৈরি শর্করার প্রায় সবটাই অতিরিক্ত শ্বসন কাজে ব্যবহার করে– যার ফলে স্বাভাবিক অঙ্গজ বৃদ্ধি আর অব্যাহত থাকে না।

গ. সর্বনিম্ন তাপমাত্রা : সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় গাছে সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের হার কমে যায় এবং গাছে শর্করার সঞ্চয় আর হয় না। পরিণতিতে অঙ্গজ বৃদ্ধি থেমে থাকে।

৮. গাছের উপর বিভিন্ন তাপমাত্রার প্রভাব

উষ্ণতার মাত্রা	প্রভাব
১. সর্বনিম্ন তাপমাত্রার নিচে	গাছের মৃত্যু ঘটে
২. সর্বনিম্ন তাপমাত্রায়	সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন সর্বনিম্ন হারে চলে
	$\frac{\text{সালোকসংশ্লেষণ}}{\text{শ্বসন}} = ১$
	গাছ বৃদ্ধি পায় না।
	এই তাপমাত্রা বেশি দিন বিদ্যমান থাকলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে।
উপযোগী	$\frac{\text{সালোকসংশ্লেষণ}}{\text{শ্বসন}} = > ১$
উপযোগীর কিছু উপরে	
সর্বোচ্চ	$\frac{\text{সালোকসংশ্লেষণ}}{\text{শ্বসন}} = ১$
সর্বোচ্চের উপরে	$\frac{\text{সালোকসংশ্লেষণ}}{\text{শ্বসন}} = < ১$

৪.১.২. আলোর প্রভাব : উদ্ভিদের উপর আলোর প্রভাব দু'ধরনের। যথা-

১) সালোকসংশ্লেষণের জন্য আলো প্রয়োজন। আলোর প্রখরতা (দীপনমাত্রা) পরিমাপের জন্য বিভিন্ন একক ব্যবহৃত হয়, যথা- ফুটবাতি অধিকাংশ উদ্ভিদে ১২০০ ফুটবাতি পর্যন্ত সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি পায়।

ভূপৃষ্ঠে পতিত সূর্যের আলোর গড় প্রখরতা ৬০,০০০ ফুটবাতি, চন্দ্রের মাত্র ১ ফুটবাতি। স্পষ্টতই সূর্যালোকের অতি সামান্য অংশই উদ্ভিদ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। তদুপরি সত্ত্বেও মেঘাচ্ছন্নতার কারণে সালোকসংশ্লেষণে আলোর ঘাটতি হয়।

২) দিবস দৈর্ঘ্য দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রভাবিত হয়। দিবস দৈর্ঘ্যের প্রভাব ২ ধরনের অর্থাৎ দৈর্ঘ্য কমবেশি হওয়ার সাথে সাথে সালোক সংশ্লেষণের জন্য প্রাপ্ত মোট সময়ের ভিন্নতা ঘটে।

কিছু সংখ্যক উদ্ভিদের ফুল ধারণ সম্পূর্ণভাবে দিবস দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর। দিবস দৈর্ঘ্যের প্রভাব অনুযায়ী উদ্ভিদকে খাটো দিবস, দীর্ঘ দিবস এবং দিবস নিরপেক্ষ-এ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। একটি বিশেষ দিবস দৈর্ঘ্যের নিচে এবং দীর্ঘ দিবসী উদ্ভিদ একটি বিশেষ দিবস দৈর্ঘ্যের উপরে ফুল ধারণ করে।

সবজি ফসলের অনেকগুলোই দিবস দৈর্ঘ্যের প্রতি স্পর্শকাতর। সাধারণভাবে শীতপ্রধান অঞ্চলের অনেক সবজির ফুল ধরার জন্য দীর্ঘ দিবস আবশ্যক নিরক্ষীয় এলাকার অনেক সবজির কেবল খাটো দিবসে ফুল ধারণ করে। অবস্থান অনুযায়ী বাংলাদেশে দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ১০.২ থেকে ১৩.৮ ঘণ্টার মধ্যে। তবে মেঘের কারণে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত দৈনিক গড়ে সর্বোচ্চ ৯ ঘণ্টা আলো দিনে পাওয়া যায়। জুন-সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ণ আলো দিনে গড়ে ৫ ঘণ্টারও কম হয়।

৪.১.২.১. বাংলাদেশে প্রতি মাসের গড় দৈনিক আলোকিত সময়

মাসের নাম	দৈনিক আলোক সময় (ঘণ্টা)	মাসের নাম	দৈনিক আলোক সময় (ঘণ্টা)
জানুয়ারি	৮.৯	জুলাই	৪.৭
ফেব্রুয়ারি	৯.২	আগষ্ট	৪.৮
মার্চ	৮.৬	সেপ্টেম্বর	৫.২
এপ্রিল	৮.৭	অক্টোবর	৭.৩
মে	৮.২	নভেম্বর	৯.১
জুন	৪.৪	ডিসেম্বর	৮.৯

৪.১.২.২. আলোর প্রকারভেদ : গাছের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বিজ্ঞানী Ceausescuc (1975) আলোক রশ্মিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করেছেন–

(১) অতিরশ্মি : তরঙ্গ দৈর্ঘ ৪০-২০০ mμ ক্ষতিকারক
(২) বেগুনি : ২৯০-৫০০ mμ; প্রোটিন সংশ্লেষণ
(৩) কমলা : ৫০০-৭০০ mμ ; সালোকসংশ্লেষণ
(৪) ইনফ্রারেড : > ৭০০ mμ; ক্ষতিকারক।

৪.১.২.৩. আলোর প্রখরতা : বিজ্ঞানী তিমিরিয়াজেভ (১৯৪৯) লক্ষ্য করেছেন যে, গাছ ২০-৩০ হাজার লাক্স আলোর প্রখরতায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণ খাদ্য তৈরি করে।

আলোর প্রখরতার ভিত্তিতে শাক-সবজির প্রকারভেদ

(১) আলো পছন্দকারী শাক-সবজি : ৮০০০ লাক্স আলোর প্রখরতা প্রয়োজন যেমন–*Lycopersicon esculentum*

(২) মধ্যম আলো পছন্দকারী শাক-সবজি ৪০০০-৫০০০ Lux আলোর প্রখরতা প্রয়োজন। যেমন– *Basella alb*

(৩) ছায়া পছন্দকারী শাক-সবজি ২০০০ লাক্স আলোর প্রখরতা প্রয়োজন। যেমন– কচু (মৌলভী কচু)

৪.১.২.৪. আলোর স্থিতিকাল : শিমের বীজ যখনই বপন করা হোক না কেন কেবল ছোট দিবসেই এ গাছে ফুল আসে। পুষ্প উৎপাদন আলোর স্থিতিকালের উপর নির্ভর করে। শাক-সবজিকে আলোর স্থিতিকালের উপর ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. ছোট দিবস উদ্ভিদ : সঙ্কট দিবস দৈর্ঘ্যের নিচে ফুল দেয় তখন তাকে ছোট দিবস উদ্ভিদ বলে যেমন– শিম;
২. দীর্ঘ দিবস উদ্ভিদ : যখন কোনো গাছ সঙ্কট দিবস দৈর্ঘ্যের উপরে গিয়ে ফুল দেয় তখন তাকে দীর্ঘ দিবস উদ্ভিদ বলে। যেমন– পেঁয়াজ, গাজর;
৩. দিবস নিরপেক্ষ উদ্ভিদ : এগুলোর উপর আলোর স্থায়িত্বের এর প্রভাব নেই। সারা বছরই ফুল দেয়। যেমন– টমেটো।

৪.১.৩. **বৃষ্টিপাতের প্রভাব** : উদ্ভিদের উপর বৃষ্টিপাতের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে মাটি ও বাতাসের আর্দ্রতা প্রধানত বৃষ্টিপাত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শস্য উৎপাদনের জন্যে বৃষ্টিপাত যথেষ্ট না হলে সেচের মাধ্যমে ফসলের পানির চাহিদা পূরণ করতে হয় কিন্তু বৃষ্টিপাতের আধিক্য জলাবদ্ধতা সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতিবৃষ্টির কারণে সবজি ফসল নষ্ট হওয়া বাংলাদেশে একটি সাধারণ ঘটনা। বাতাসে আর্দ্রতার আধিক্য সবজিতে রোগ ও পোকার উপদ্রব বাড়ায় বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের সাথে ঝড়-তুফানের ঘনিষ্ট যোগ রয়েছে। ঝড় তুফান ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে।

৪.১.৩.১. বাংলাদেশে মাসিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সেন্টিমিটারে উল্লেখ করা হলো

মাস	সিলেট	চট্টগ্রাম	ঢাকা	যশোর	দিনাজপুর	সারাদেশের গড়
জানুয়ারি	১.৯	০.৬	০.৮	১.৫	০.৮	১.০
ফেব্রুয়ারি	৪.১	১.৩	১.৪	১.৬	০.৫	১.৫
মার্চ	৯.৫	৩.৬	৫.২	৩.০	৪.৩	৪.৩
এপ্রিল	৩০.৮	১০.৯	৯.৩	৮.৩	৬.০	১০.৮
মে	৫৪.৫	১৬.৬	২২.২	৯.৩	১৩.৩	২০.২
জুন	১০২.০	৬৪.৪	৩৭.৭	৩৩.৯	৩৪.৩	৪৮.৬
জুলাই	৭৮.১	৮১.৭	৩৯.২	৩৩.৯	৪৩.৯	৫০.০
আগস্ট	৭৪.২	৫৪.৯	৩২.৯	২৭.৪	৩৩.৭	৪২.৭
সেপ্টেম্বর	৪৬.২	২৪.৪	২৭.৫	২৫.৪	২৬.৭	২৯.৭
অক্টোবর	২০.১	২০.০	১৭.২	১৬.০	১০.৮	১৯.৪
নভেম্বর	২.৫	২.১	৩.১	১.৭	১.০	২.১
ডিসেম্বর	০.২	১.৬	০.৫	০.২	০.০	৫.০
মোট	৪২৪.১	২৮২.১	১৯৭.০	১৬২.২	১৭৫.৩	২৩০.৮

ঘ. বায়ু প্রভাব : শাক-সবজি উৎপাদনে বাতাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বাতাস একদিকে তার উপাদান এবং অন্যদিকে তার প্রবাহের গতিবেগ দিয়ে শাক-সবজি উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। বাতাসে প্রায় ০.৮ ভাগে নাইট্রোজেন, ০.২ ভাগ O_2. ০.০৩ ভাগ CO_2 আছে। এছাড়াও বায়ু প্রভাব পরাগায়নে সহায়তা করে

ক. বাতাসের আর্দ্রতা : বাংলাদেশে প্রায় সারা বছরই বাতাস যথেষ্ট আর্দ্র থাকে ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল বছরের শুষ্কতম মাস। এ সময় সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ৭৫% ও ৮৫% এবং সর্বনিম্ন আর্দ্রতা ৪০%-৬৫% এর মধ্যে অবস্থান করে

খ. ঝড় তুফান : বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে ঝড় তুফান বয়ে যাওয়া বাংলাদেশের জলবায়ুর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য মার্চ মে মাসে প্রতিবছরই ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় হয়। কোনো কোনো সময় এর সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসেও কিছু ঝড় হয়ে থাকে

পঞ্চম অধ্যায়

সবজির বীজ ও চারা

৫.০. বীজের সংজ্ঞা

বীজ উদ্ভিদের বংশবিস্তারের মাধ্যম। উদ্ভিদতাত্ত্বিকভাবে বীজ বলতে নিষিক্ত ও পরিপক্ব ডিম্বককে বোঝানো হয়ে থাকে; যেমন শস্য দানা। তাই কৃষি বীজ বলতে উদ্ভিদের যে অংশ যা অনুকূল পরিবেশে নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয় তাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন- শস্য দানা, আলুর কন্দ, মিষ্টি আলুর লতা, কচুর গুঁড়িকাণ্ড। ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন বীজের প্রয়োজন তেমনি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ভালো বীজের প্রয়োজন। সর্বাধিক ফলন পেতে হলে ভালো বীজ ব্যবহার করতে হয়।

৫.১. **ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য :** ভালো বীজ বলতে কিছু নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন বীজকে বোঝানো হয়ে থাকে। ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য নিচে বর্ণনা করা হলো।

ক. বীজের জীবনীশক্তি অটুট থাকতে হবে : বীজের জীবনীশক্তি হলো বীজের গজানো ক্ষমতা, সংরক্ষণ ক্ষমতা ও গাছ গজানোর পর তাকে শক্তিশালী করে তোলার ক্ষমতার সমষ্টি। চারা গজানো হতে শুরু করে বেড়ে উঠার সব পর্যায়েই বীজের জীবনীশক্তির প্রভাব রয়েছে। বীজের জীবনীশক্তি কম হলে ফসল দুর্বল হয়।

খ. বীজে অন্য কোনো জাতের বীজের মিশ্রণ থাকবে না : ভালো বীজে অন্য কোনো জাতের বীজের মিশ্রণ দূষণীয়, কারণ বীজের মধ্যে অন্য জাতের বা অন্য শস্যের বীজের মিশ্রণ থাকলে এক সঙ্গে ফসল পরিপক্ব হতে পারে না। তাই বিশুদ্ধ বীজ উচ্চ ফলনশীল হয়ে হয়। বীজ ফসলের জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হয়। ফসল কাটার পর পরিচ্ছন্নভাবে মাড়াই ঝাড়াই করতে হয়।

গ. বীজের আকার-আকৃতি ও রঙ স্বাভাবিক হয় : প্রত্যেক জাতের বীজের স্বতন্ত্র আকার-আকৃতি ও রঙ থাকে। তাই ভালো বীজ আকৃতি ও অন্যান্য দিক থেকে স্বাভাবিক হতে হয়।

ঘ. বীজ পরিপক্ব ও পুষ্ট হতে হবে : ভালো বীজ পরিপক্ব ও পুষ্ট হওয়া দরকার। ফসল ভালোভাবে পরিপক্ব হওয়ার পর সংগ্রহ করা হলে বীজ পরিপক্ব ও পুষ্ট হয়। বীজ সংগ্রহের পর বীজ বাছাই করে সংরক্ষণ করতে হয়।

ঙ. বীজ রোগজীবাণু মুক্ত থাকবে : রোগমুক্ত ফসল থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

চ. বীজের মধ্যে আবর্জনা ও আগাছার বীজ থাকবে না : বীজের মধ্যে জড় পদার্থ থাকলে ওজন বেড়ে যায়। এসব বীজ ওজনের ভিত্তিতে জমিতে বপন করলে জমিতে প্রকৃত বীজের সংখ্যা কমে যায়। ফলে-গাছের সংখ্যা কম হয় ও ফলন কম হয়। বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় যাতে বীজের সাথে জড় পদার্থের মিশ্রণ না ঘটে।

ছ. বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা বেশি হবে : বীজের গজানোর ক্ষমতা নির্দিষ্ট একটি সীমার মধ্যে থাকতে হয়, যেমন-কপি, লালশাক বীজের গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ এবং গাজর ও শালগমের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০-৭০ ভাগের বেশি হতে হয়।

জ. বীজের আর্দ্রতার পরিমাণ কম হবে : বীজের আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ একটি সীমার মধ্যে রাখতে হয়। তা না হলে বীজে নষ্ট হয়ে যায়। নিচে উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি ফসলের আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ দেওয়া হলো।

সারণি ৫.১. বিভিন্ন সবজি বীজে গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ আর্দ্রতার পরিমাণ

ক্রমিক	শস্যের নাম	আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ (%)
১.	কপি	১১
২.	ডাটা, লালশাক	৮
৩.	ঢেঁড়স, চুকাই	১০
৪.	সরিষা	১১
৫.	শসা, লাউজাতীয় ফসল	১৫
৬.	শিম, বরবটি	১৩
৭.	মূলা	৮
৮.	পেঁয়াজ	৭
৯.	টমেটো	৮
১০.	বেগুন	৮

আর্দ্রতার পরিমাণ আবার বেশি কমে গেলেও অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তবে এসব সবজির বীজে ন্যূনতম ৬-৮% আর্দ্রতা থাকা দরকার।

৫.২. বীজের শ্রেণিবিভাগ

সব বীজের গঠন, আকার আকৃতি, বৈশিষ্ট্য এক রকম নয়। বীজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বীজকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। এখানে সেগুলোর কয়েকটি ভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

৫.২.১. ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : ব্যবহারের ভিত্তিতে বীজকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

ক. **উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ** : নিষিক্ত ও পরিপক্ব ডিম্বককে উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ বলে, যেমন– মরিচ, শসা, ঢেঁড়স ও ফুলকপির বীজ।

খ. **কৃষিতাত্ত্বিক বীজ** : উদ্ভিদের যে কোনো অংশ যা উপযুক্ত পরিবেশে নতুন উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে তা-ই কৃষিতাত্ত্বিক বীজ, যেমন- মিষ্টি আলুর লতা, আলুর কন্দ ইত্যাদি

৫.২.২. আবরণভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : বীজের আবরণের উপস্থিতির ভিত্তিতে বীজকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

ক. **অনাবৃত বীজ** : যে বীজে কোনো আবরণ থাকে না তাকে অনাবৃত বীজ বলা হয়, যেমন- গাজর, লেটুস

খ. **আবরিত বীজ :** যে বীজের আবরণ থাকে তাকে আবরিত বীজ বলা হয়, যেমন- শিম, বাঁধাকপি।

৫.২.৩ **বীজপত্রভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ :** বীজপত্রের সংখ্যানুযায়ী বীজকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

ক. **একবীজপত্রী বীজ :** যে সব বীজে একটি মাত্র বীজপত্র থাকে, সেগুলোকে একবীজ-পত্রী বীজ বলে, যেমন- পেঁয়াজ, মরিচ, বেগুন।

খ. **দ্বিবীজপত্রী বীজ :** যে সব বীজে দুটি বীজ পত্র থাকে, তাদেরকে দ্বিবীজ-পত্রী বীজ বলে, যেমন- লাউ, কুমড়া, করলা ইত্যাদি।

গ. **বহুবীজপত্রী বীজ :** যে বীজে দুইবারের বেশি বীজপত্র থাকে, সেগুলোকে বহুবীজ পত্রীবীজবলে, যেমন- পাইন।

৫.২.৪. **বীজের ভ্রূণভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ :** বীজে ভ্রূণের সংখ্যা অনুসারে বীজকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

ক. **একভ্রূণী বীজ :** যে বীজে একটি মাত্র ভ্রূণ থাকে, তাকে একভ্রূণী বীজ বলে, যেমন- লাউ, শসা।

খ. **বহুভ্রূণী বীজ :** যে বীজে বেশি ভ্রূণ থাকে, তাকে বহুভ্রূণী বীজ বলে, যেমন- আম, নারিকেল ইত্যাদি।

৫.২.৫. **বীজের প্রত্যয়নগত শ্রেণিবিভাগ :** জাতের মৌলিক বিশুদ্ধতা, উৎপাদন ও বিতরণের প্রকৃতির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শস্য উন্নয়ন সমিতি বীজকে প্রত্যায়নগতভাবে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে। এগুলো হলো-

ক. মৌল বীজ (Breeder seed)
খ. ভিত্তি বীজ (Foundation seed)
গ. নিবন্ধিত বীজ (Registered seed)
ঘ. প্রত্যায়িত বীজ (Certified seed)

বাংলাদেশের বীজ নীতি অনুসারে বীজকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

ক. **মৌল বীজ :** যে বীজ গবেষকের তত্ত্বাবধানে উৎপন্ন এবং যা থেকে ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা হয় তাকে মৌল বীজ বলে। মৌল বীজের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পর্যায়ের বীজ বর্ধন শুরু হয়। নতুন জাত অবমুক্তির পর এর মৌল বীজ সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

খ. **ভিত্তি বীজ :** বীজের পরবর্তী বিস্তারের জন্য মৌলিকভাবে শনাক্তকরণের জাতের উৎসকে ভিত্তি বীজ বলে। ভিত্তি বীজ অতি সতর্কতার সাথে উৎপাদন করতে হয়। এ সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে অন্য কোনো বীজ এ বীজের সাথে না মিশতে পারে।

গ. **প্রত্যায়িত বীজ :** ভিত্তিবীজ হতে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করা হয়। এতে বংশগত ও বাহ্যিক বিশুদ্ধতা নির্ধারিত মানের রাখতে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করে।

৫.৩. বীজ হিসেবে অঙ্গজ বংশবিস্তার

বীজ ছাড়াও গাছ তার অঙ্গ দিয়ে চারা উৎপাদন করে বংশবিস্তার করতে পারে। অধিকাংশ সুদৃশ্য ও ফল গাছের বংশবিস্তার অঙ্গজ চারা দিয়ে কলম পদ্ধতিতে করা হয়।

৫.৩.১. অঙ্গজ বংশবিস্তার : বিভিন্ন ধরনের অঙ্গজ বংশবিস্তার সম্বন্ধে বর্ণনা করা হলো।

ক. কাটিং : কর্তন বা ছেদ কলমের উৎপাদন কৌশল, সংরক্ষণ ও চারা হিসেবে ব্যবহারের বিভিন্ন ধাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। গাছের অংশ যেমন- শাখা, মূল, পাতা প্রভৃতি কেটে উপযুক্ত মাধ্যম ও পরিবেশে রেখে যে কলম করা হয় তাকে কাটিং বা কর্তন বলে। এ প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার সুবিধাজনক। সীমিত মাতৃগাছ থেকে স্বল্প পরিসর জায়গায় অনেক নতুন গাছ উৎপন্ন করা হয়। এতে মাতৃগাছের গুণগতমান বজায় থাকে। উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরনের কর্তনের উদাহরণ হলো– পাতা কর্তন, বড় মূল কর্তন, ক্ষুদ্রমূল কর্তন, শক্ত ডাল কর্তন ও নরম ডাল কর্তন।

ক.১. পাতা কলম : পাতা বা পাতার অংশ উপযুক্ত মাধ্যমে স্থাপন করে যে কলম করা হয় তাকেই পাতা কলম বলা হয়। বসন্ত ও বর্ষাকালে এ কলম করা হয়। স্নেক প্ল্যান্ট, পাথরকুচি, বিগোনিয়া, আফ্রিকান ভায়োলেট, রাবার ইত্যাদি গাছে এ কলম করা যায়। কর্তন বিভিন্ন পাতার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন- পাতাকে মাতৃ গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ৭.০-১০.০ সেন্টিমিটার লম্বা টুকরা করা হয়। এসব টুকরার তিন-চতুর্থাংশ বালি বা মাটির বেডে রোপণ করা হয়। ৩-৪ সপ্তাহ পর এগুলোর গোড়া থেকে নতুন গাছের জন্ম দেয়। স্নেক প্ল্যান্ট ও পাথরকুচি গাছে এভাবে কলম করা হয়। ১-২ সপ্তাহ পরে শিরা থেকে অস্থানিক মূল গজিয়ে চারা জন্ম দেয়। পাথরকুচির পাতা কলম এ প্রক্রিয়ায় করা হয়ে থাকে।

ক.২. ডাল কর্তন : কাটা শাখাতে মূল গজাতে দিয়ে যে কলম করা হয় তাকে ডাল কর্তন বা শাখা কলম বলে। গাজর, ডুমুর প্রভৃতি গাছের শাখা কলম হতে পারে।

ক. ২.১. **মাটিতে শাখা কলম :** ছায়াযুক্ত দোআঁশ মাটিতে শাখা কলম করতে হয়। মাটি ২৫ সেন্টিমিটার করে খুঁড়ে তার সাথে গোবর সার ও বালি মিশাতে হয়। বেশির ভাগ গাছের ১-২ বছর বয়সের শাখা থেকে ১০ ২০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ খণ্ড কেটে নিতে হয়। প্রতিটি খণ্ডে কমপক্ষে ৩-৪টি পর্ব থাকবে। শাখাটির অর্ধাংশ মাটির নিচে দিয়ে কাত করে পুতে দিতে হয়। চার-পাঁচ সপ্তাহে কলম স্থানান্তরের উপযোগী হয়।

ক. ২.২. **পানিতে শাখা কলম :** পানিতে শাখা কলমের জন্য দ্রুত বর্ধনশীল শাখার অগ্রভাগ কেটে নিতে হয়। রঙিন বোতলে পানি ভরে শাখার গোড়া ডুবিয়ে রাখা হয়। বোতলটি ছায়াতে রাখা হয়। শাখা লম্বায় ১০-২০ সেন্টিমিটার হতে পারে। চার-পাঁচ দিন পর পর পানি বদলাতে হয়। দুই-তিন সপ্তাহ পর শাখায় শিকড় গজায়। মোট দেড় মাসের মধ্যে কলম রোপণের উপযুক্ত হয়। পাতাবাহার, পয়েন্টসেটিয়া প্রভৃতি গাছে এ ধরনের কলম করা হয়ে থাকে

ক. ২.৩. **বালিতে শাখা কলম :** শুষ্ক মরুসদৃশ স্থানে জন্মানো ফনিমনসা গাছে এ পদ্ধতিতে শাখা কলম করা যায়। এসব গাছের ৬-১০ সেন্টিমিটার লম্বা টুকরা করতে হয়। শুষ্ক বালি ভর্তি টবে পুতে রাখলে এসব শিকড় উৎপন্ন করে।

খ. দাবা কলম : মাতৃ গাছের শাখায় শিকড় গজিয়ে যে কলম তৈরি করা হয় তাকে দাবা কলম বলে। লেবু, গোলাপ, পেয়ারা, কাঁঠাল, চালতা, লিচু, সফেদা ইত্যাদি গাছে দাবা কলম করা হয়। দাবা কলমের মধ্যে সরল দাবা কলম ও বায়বীয় বা গুটি কলম

প্রধান শীতকাল ছাড়া প্রায় সারা বছরই এই পদ্ধতিতে কলম করা যায়। দাবা কলম করার জন্য সতেজ ও নিরোগ পেন্সিল-মোটা ডাল নির্বাচন করতে হয়। যে ডাল মাটির কাছাকাছি সে ডাল নির্বাচন করা ভালো। ডালটির আগা হতে ৫০-১০০ সেন্টিমিটার নিচের দিকে গিটের নিচে ধারালো ছুরি দিয়ে গোলাকার করে বাকল কাটতে হয়। এই কাটার ৩-৪ সেন্টিমিটার নিচে আর একবার গোলাকার করে বাকল কাটতে হয়। দুই কাটার মাঝের বাকল তুলে ফেলতে হয়। এভাবে আরও ২-৩ সপ্তাহ রাখার পর চারাটি সাবধানে মাটিসহ উঠিয়ে রোপণ করতে হয়। দাবা কলম তিন প্রকার হতে পারে, যথা- (১) সরল দাবা কলম; (২) ঢিবি দাবা কলম; (৩) যৌগিক দাবা কলম।

গ. **গুটি কলম :** বিভিন্ন ধরনের কলমের মধ্যে গুটি কলমই সবচেয়ে জনপ্রিয়। লেবু, পেয়ারা, রঙ্গন এসব গাছে বর্ষাকালে গুটি কলম করা হয়। গুটি কলম বাঁধার জন্য সতেজ পেন্সিলের মতো ডাল নির্বাচন করতে হয়। ডাল নির্বাচন করার পর তিন ভাগ দোআশ মাটি সাথে একভাগ পচা গোবর ও পানি মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে রাখতে হয়। নির্বাচিত ডালটির অগ্রভাগ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার নিচে ধারালো গ্রাফটিং চাকু দিয়ে ৪-৫ সেন্টিমিটার অংশের বাকল ছাড়িয়ে নিতে হয়। বাকল তোলার পর কাঠের উপর বিদ্যমান এক ধরনের পিচ্ছিল পদার্থ ছুরি দিয়ে চেঁছে পরিষ্কার করে নিতে হয়। অতঃপর ৩০০ গ্রাম পরিমাণ পেস্ট নিয়ে বাকল ছাড়িয়ে নেওয়া অংশসহ ডালে মোট ৭ সেন্টিমিটার অংশ ভালোভাবে ঢেকে দিতে হয়। পেস্ট লাগানো হলে মোটা পলিথিন দিয়ে তা ভালো করে ডালের সাথে দুই মাথায় বেঁধে দিতে হয়। তিন-চার সপ্তাহের মধ্যে বাকল তোলা অংশের উপরের দিকে শিকড় দেখা যাবে। শিকড় গজালে ডালটিকে কেটে টবে লাগিয়ে কয়েকদিন ছায়ায় রাখতে হয়।

ঘ. **জোড় কলম :** অনেক কাঙ্ক্ষিত গাছের অঙ্গ জোড়া লাগানো হয়। যে গাছের সাথে জোড় লাগানো হয়, সে গাছটিকে আদিজোড় বা স্টক (Stalk) বলা হয়। আর কাঙ্ক্ষিত গাছের অঙ্গকে উপজোড় (scion) বলা হয়। এ জোড়া লাগানো পদ্ধতিতে যে কলম তৈরি করা হয় সেটিকে জোড় কলম বলা হয়। জোড় কলম প্রধানত দুই প্রকার। যথা- সংযুক্ত জোড় কলম ও বিযুক্ত জোড় কলম।

ঘ.১. **সংযুক্ত জোড় কলম :** এ পদ্ধতিতে কলম করার জন্য ৯-১৮ মাস বয়সের চারা টবে তৈরি করে নিতে হয়। তারপর চারাটির গোড়া থেকে ২০-৩০ সেন্টিমিটার উপরে ৪-৬ সেন্টিমিটার লম্বা এবং প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গভীর করে কিছু পরিমাণ কাঠসহ বাকল কেটে উঠিয়ে ফেলতে হয়। চারা গাছটির সাথে মিল রেখে মাতৃ গাছের একটি ডাল একইভাবে কাঠসহ বাকল কেটে ফেলতে হয়। তারপর চারা গাছটিকে টবসহ একটি ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে নির্বাচিত ডালের কাটা অংশ মিলিয়ে বেঁধে দিতে হয়। ২-৩ মাসের মধ্যে কাটা অংশ জোড়া লেগে যায়। এবার জোড়ের ঠিক নিচে মাতৃ গাছের শাখা ১-২ কিস্তিতে ৭-৮ দিন পরপর একটু একটু করে কেটে নামিয়ে আনতে হয়। তারপর টবটি ৪-৫ সপ্তাহ ছায়ায় রাখলে চারাটি রোপণ উপযোগী হয়। চারাটি নিচে নামানোর পর অনুন্নত অংশ কেটে ফেলতে হয়।

ঘ.২. **বিযুক্ত জোড় কলম :** বিযুক্ত জোড় কলম আবার সাত প্রকার যথা-

ঘ.২.১. **ভিনিয়ার কলম :** ভিনিয়ার কলম আম ও কাঁঠাল গাছে প্রচলিত। বসন্ত থেকে শরৎকালে গাছের সুপ্তাবস্থা শেষ হয়ে বৃদ্ধি শুরু করার সময় এ কলম করতে হয়।

১. এ কাজের জন্য প্রথমে বীজতলায় বা টবে ৯-১২ মাস বয়স্ক আদি জোড় গাছ তৈরি করে নিতে হয়।
২. চারাটির গোড়া থেকে ২০-৩০ সেন্টিমিটার উপরে কলম করতে হয়।
৩. চারার এক পাশে কিছু কাঠসহ বাকল কাণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ পুরু এবং ৫-৭ সেন্টিমিটার লম্বা তেরচা করে কেটে নিচে নামাতে হয়।
৪. শেষ অংশের উপরে ১ সেন্টিমিটার লম্বা খাঁজ করে কেটে নিতে হয়।
৫. এরপর উন্নত জাতের গাছ থেকে ১৫-২০ সেন্টিমিটার লম্বা কুঁড়িসহ শাখা অর্থাৎ উপজোড় কেটে দিতে হয়।
৬. শাখাটির নিচের অংশ একই পরিমাপে কেটে এবং নিচের উল্টোদিক ১ সেন্টিমিটার তেরচা করে কাটতে হয়।
৭. দুই কার অংশ মিশিয়ে পলিথিনের ফিতা দিয়ে শক্ত করে বাঁধতে হয়
৮. পলিথিনের ঢাকনা দিয়ে কলমটি ঢেকে দিতে হয়।
৯. কলম করার ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে জোড়া লেগে (সায়ন) যায়। তখন পলিথিনের ঢাকনা খুলে দিতে হয়।
১০. গজানো পাতা সবুজ রং ধারণ করলে জোড়ার ১.৫-২.০ সেন্টিমিটার উপরে ২-৩ ধাপে আদি জোড়ের আগা কেটে দিতে হয়
১১. সাধারণত ৯-১২ মাস পর জমিতে রোপণ করতে হয়।

ঘ.২.২. অঙ্কুর জোড় কলম : এ পদ্ধতিতে নতুন এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বেশি। এ পদ্ধতিতে আমের কলম করা হয়। এ কাজের জন্য আমের আঁটি থেকে গজানো ৮-১০ দিনে তেজী চারা স্টক গাছ হিসেবে নিতে হয়।
১. এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত চারার গোড়া থেকে ৪-৫ সেন্টিমিটার উপরে কলম করতে হয়।
২. ভিনিয়ার পদ্ধতিতে আদিজোড় কেটে উপজোড় সঠিকভাবে বসিয়ে পলিথিন দিয়ে বেঁধে দিতে হয়।
৩. কলম করা শেষে আঁটিসহ চারাটি পুনরায় প্রচুর জৈব পদার্থযুক্ত মাটিতে লাগাতে হয়।
৪. টবটি পলিথিন দিয়ে ঢেকে ছায়ায় রাখতে হয়
৫. দুই-চার সপ্তাহে জোড়া লেগে যায়

ঘ.২.৩. পার্শ্ব জোড় কলম : পার্শ্ব জোড় কলমও স্টক এবং সায়ন ভিনিয়ার কলমের অনুরূপ।
১. স্টক গাছে (T) আকারে বাকল কাটা হয়।
২. 'T' এর মাথাটি ১-২ সেন্টিমিটার এর চোখ অংশটিতে ৩-৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ করে কাটা হয়
৩. 'T' এর উপরের বাকলটি "T" এর আকারে কেটে ফেলা হয়।
৪. সায়নটির নিচের অংশ তেরচাভাবে ৩-৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ করে কাটতে হয়।
৫. কাটা এমন গভীর হয় যাতে নিম্ন প্রান্তে ০.৫ সেন্টিমিটার পরিমাণ স্থানে কেবল বাকল থাকে।

৩. আদিজোড়ের চোখ অংশ ফাঁক করে উপজোড় স্থাপন করা হয় এবং পলিথিন ফিতা দিয়ে বাঁধতে হয়।

ঘ.২.৪. **জিহ্বা জোড় কলম :** জিহ্বা জোড় কলম সাধারণত বসন্ত ও শরৎকালে করা হয়। আম, আপেল, নাশপাতি প্রভৃতি ফলে এ কলম করা হয়।

১. আদি জোড়ের গোড়া ২০-৩০ সেন্টিমিটার উপরে কেটে ফেলে প্রথমে ২.৫-৬ সেন্টিমিটার লম্বা করে কাটতে হয়

২. দ্বিতীয়বার প্রথম কাটা স্থানের মধ্যভাগ থেকে ১-৩ সেন্টিমিটার গভীর করে নিচের দিকে কাটতে হয়।

৩. উপজোড়ের নিচের দিকে একই মাপে ও ২ ধাপে কেটে মধ্যভাগ থেকে ১-২ সেন্টিমিটার গভীর করে নিচের দিকে কাটতে হয়।

৪. উপজোড়ের নিচের দিকে একই মাপেও ২ ধাপে কেটে পলিথিন ফিতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিতে হয়।

এছাড়াও বিযুক্ত জোড় কলম বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যথা– শীর্ষ জোড় কলম, আরোহ জোড় কলম, কীলক জোড় কলম ইত্যাদি।

৫.৩.২. অঙ্গজ বীজের ব্যবহারিক সুবিধা ও অসুবিধা

৫.৩.২.১. **অঙ্গজ বীজের ব্যবহারিক সুবিধা :** গাছের অঙ্গজ বীজের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচে অঙ্গজ বীজের ব্যবহারিক সুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হলো।

ক. গাছে স্বল্প সময়ে ফল ধরানো যায়। আম, লিচু, পেয়ারা, লেবু প্রভৃতিতে ২-৪ বছরের মধ্যে ফল ধরে।

খ. অঙ্গজ বীজে মাতৃ গাছের সব গুণ বিদ্যমান থাকে।

গ. স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক চারা তৈরি করা যায়। যেমন- টিস্যু কালচার দ্বারা অত্যন্ত কম সময়ে হাজার হাজার চারা তৈরি করা যায়।

ঘ. স্থানীয় গাছের শিকড়ে উচ্চ ফলনশীল জাতের উপজোড় কলম করলে মাটির প্রতিকূল পরিবেশ এড়িয়ে যাওয়া যায়।

ঙ. অনেক গাছ আছে যাতে কেবল অঙ্গজ পদ্ধতিতেই বংশবিস্তার সম্ভব। যেমন- কলা, আনারস, মিষ্টি আলু, কচু, আদা, বাঁশ।

চ. উন্নত জাতের গাছের শাখা বা কুঁড়ি চোখ সংযোজন করে ক্রমান্বয়ে গাছটিকে নতুন জাতের গাছে পরিণত করা যায়।

ছ. গোলাপ গাছে কুঁড়ি সংযোজন করে বিভিন্ন রঙের ও আকারের ফুল ফোটানো যায়।

জ. বংশবিস্তারের জন্যে অঙ্গজ পদ্ধতি অবলম্বন করলে কোনো গাছে ফুল-ফল বীজ উৎপাদনের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় না।

ঝ. অঙ্গজ বীজ দ্বারা বাগান প্রতিষ্ঠা করে অল্প সময়ে লাভবান হওয়া যায়।

৫.৩.২.২. **অঙ্গজ বীজের ব্যবহারিক অসুবিধা :** উদ্ভিদের অঙ্গজ বীজ ব্যবহারের অনেক সুবিধা থাকলে এর বেশ কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন-

ক. অঙ্গজ গাছের জীবনকাল কম।
খ. জোড় কলমের জোড়ার স্থানে ক্যাঙ্কার হয়ে থাকে
গ. গাছের কাণ্ডের শক্তি কম হয়।
ঘ. খরা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনশীলতা কমে যায়
ঙ. শিকড় বিস্তার কম হয়।
চ. টিস্যু কালচার গবেষণাগার স্থাপন খুব ব্যয়সাপেক্ষ।
ছ. অঙ্গজ চারা গাছের পরিবহণ ব্যয় বেশি।
জ. অঙ্গজ চারা গাছের মূল্য বেশি পড়ে।

যাহোক, অঙ্গজ বীজের সুবিধা-অসুবিধাগত ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে বলা যায়, আধুনিক কৃষিতে অঙ্গজ বীজের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলে অর্থাৎ ফল, ফুল ও সুদৃশ্য গাছের বংশবিস্তারের জন্যে বীজ উৎপাদন পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫.৪. সবজির চারা উৎপাদন

বংশবিস্তার সবজি ফসল উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এজন্য প্রত্যেক সবজি উৎপাদনকারীর বংশবিস্তার সম্পর্কিত খুটিনাটি জ্ঞান এবং এ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। ফসলের বংশবিস্তারের পদ্ধতি আছে সেগুলোকে যৌন ও অযৌন-এ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যৌন বংশবিস্তারের জন্য আসল বা উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ ব্যবহৃত হয় এবং অযৌন পদ্ধতিতে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ বা তার অংশবিশেষ থেকে নতুন গাছ সৃষ্টি করা যায়। কোনো কোনো সবজিতে যৌন পদ্ধতিই বংশবিস্তারের একমাত্র উপায়, আবার কিছু সবজিতে অযৌন পদ্ধতি ব্যবহার করতেই হয় কারণ এগুলো বীজ উৎপাদন করে না।

৫.৪.১. বীজ দ্বারা বংশবিস্তার : অধিকাংশ সবজিতেই প্রকৃত বীজ দিয়ে বংশবিস্তার করা হয়। প্রকৃত বীজ ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। প্রকৃত বীজ অনেক দিন সংরক্ষণ করে রাখা যায় এবং এগুলো দূরে পাঠানোও সহজ। সবজি ফসলের অনেক ক্ষতিকর রোগ আছে যেগুলো বীজের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। যৌন পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হলো আসল বীজের মাধ্যমে সবজির জাতের কৌলিক বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত রাখা দুঃসাধ্য। বংশবিস্তারের জন্য আসল বীজ দু'ভাবে ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বীজ সরাসরি ক্ষেতে বুনে দেয়া হয় অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রথমে চারা উৎপাদন করে সেগুলো রোপণ করা হয়।

৫.৪.২. সরাসরি বপন : অবস্থাভেদে যে কোনো সবজির বীজই সরাসরি বপন করা যেতে পারে, কিন্তু কিছু সবজিতে বাস্তবে এটি সম্ভব হয় না সরাসরি বপনকৃত বীজের গাছের বৃদ্ধি কোনো পর্যায়েই ব্যাহত হয় না বলে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে ফসল সংগ্রহের উপযোগী হয়। সরাসরি বপনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচ্য :

৫.৪.২.১. বপনের সময় : প্রতিটি সবজির বীজ বপনের একটি উপযুক্ত সময় রয়েছে। যেসব ফসলের উপর তাপমাত্রা, দিনের দৈর্ঘ্য ইত্যাদির বিশেষ প্রভাব রয়েছে সেসব বীজ বপনের ক্ষেত্রে সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে জাতের বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন।

৫.৪.২.২. বপনের পদ্ধতি : বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক সবজির বীজ ছিটিয়ে বুনে থাকেন। এতে কিছু সংখ্যক বীজ মাটির বেশি গভীরে গিয়ে পড়ে এবং কিছু সংখ্যক মাটির উপরেই থেকে যায়। ফলে গজানোর ক্ষেত্রে অসমতা সৃষ্টি করে। তাছাড় হাতের আন্দাজে বীজ ছিটাতে হয় বলে ক্ষেতের সর্বত্র বীজের ঘনত্ব সমান রাখা কঠিন এজন্য সব সময় সারিতে বীজ বোনো বাঞ্ছনীয়। ছোট লাঙল দিয়ে নির্ধারিত দূরত্বে নালা করে বীজ বপন করা একটি উত্তম ব্যবস্থা। হাত দিয়ে একটি একটি করে বীজ বোনো প্রক্রিয়াকে ডিবলিং (dibbling) বলা হয়। বড় আকৃতির অল্পসংখ্যক বীজ বোনার জন্য এ প্রক্রিয়া ভালো।

৫.৪.২.২.১. সারি করে বীজ বোনার সুবিধা

১. সব বীজ মাটির প্রায় একই গভীরতায় বোনা যায়, ফলে সব বীজ একই সাথে গজায়।
২. ক্ষেতের সর্বত্র বপনের ঘনত্ব সমান রাখা হয়।
৩. ছিটানো পদ্ধতির তুলনায় এতে বীজ কম লাগে।
৪. সারিতে বীজ বুনলে আগাছা দমন, অন্তঃকর্ষণ ও সেচ ইত্যাদি পরিচর্যার কাজ সহজ হয়
৫. আন্তঃকর্ষণে যন্ত্র ব্যবহার করলে সারিতে বীজ বপন অপরিহার্য

৫.৪.২.৩. বপনের গভীরতা : বপনের গভীরতা বীজের আকার ও মাটির আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে বোনার সময় মাটি শুষ্ক হলে এবং বোনার পর সেচ দেওয়া সম্ভব না হলে একটু গভীরে বীজ বোনা উচিত। কিছু সংখ্যক সবজির বীজ অপেক্ষাকৃত শুষ্ক মাটিতেও ভালোভাবে অঙ্কুরিত হয়। এর মধ্যে বাঁধাকপি, শালগম, মিষ্টি কুমড়, মরিচ, ইত্যাদি। ভেজা মাটিতে বেশি গভীরে বীজ বুনলে অঙ্কুরিত বীজ বা কচি চারা রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

৫.৪.২.৪. বপনের দূরত্ব ও বীজের হার : বপনের দূরত্ব এমনভাবে নির্ণয় করতে হয় যাতে পাশাপাশি দুটি গাছ স্থান, আলো ও খাদ্যের জন্য প্রতিযোগিতা না করে। মাটির উর্বরতা, আবহাওয়ার অনুকূলতা, ফসল উদ্ভিদের আকার ইত্যাদি বিবেচনা করে বপনের দূরত্ব নির্ণয় করতে হয়। অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা থাকলেও বপনকৃত সব বীজ থেকে চারা পাওয়া যায় না। গজানোর পরও বিভিন্ন কারণে অনেক চারা মারা যায়। নির্দিষ্ট ক্ষেতফলের এক খণ্ড জমির জন্য যতটা আকাঙ্খিত, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক বীজ বপন করতে হয়। ঠিকমত গজালে ক্রমান্বয়ে চারা পাতলা করে কমিয়ে কাঙ্ক্ষিত সংখ্যায় আনতে হয়।

৫.৪.২.৫. চারা উৎপাদন ও রোপণ : কিছু সংখ্যক সবজিতে ফসল উৎপাদনের জন্য প্রথমে চারা তৈরি করে সেগুলো রোপণ করা হয়। অল্প পরিমাণ জমিতে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চারা উৎপাদনের মাধ্যমে প্রতিকূল আবহাওয়া এড়িয়ে আগাম ফসল ফলিয়ে উৎপাদন মৌসুম প্রসারিত করা হয় বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি শীতকালীন সবজি সঠিক সময় বাজারজাত করতে হলে আগাম চাষকাজ শুরু করতে হয়। কিন্তু অতিবৃষ্টি ও অন্যান্য কারণে তখন সরাসরি মাঠে এগুলো বীজ বপন করা হয় না। কিন্তু চারা উৎপাদনের মাধ্যমে সহজেই এ অসুবিধা দূর করা যায় বাংলাদেশে চারা উৎপাদন করে লাভজনকভাবে যে সব সবজির চাষ করা হচ্ছে

সেগুলোর মধ্যে চীনা কপি, বেগুন, টমেটো, মরিচ, পুঁইশাক, লেটুস ও পেঁয়াজ উল্লেখযোগ্য।

৫.৫. নার্সারি ব্যবস্থাপনা : যে স্থানে সবজি, ফল, ফুল এবং বনজ বৃক্ষের চারা উৎপাদন করা হয় তার নাম নার্সারি। এখানে চারা বলতে প্রকৃত বীজ থেকে উৎপাদিত চারা ছাড়াও উদ্ভিদের বংশবিস্তারের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য অংশকেও বোঝানো হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক সরকারি ও বেসরকারি নার্সারি গড়ে উঠেছে। নার্সারির স্থান নির্বাচনের সময় যেসব বিষয় বিবেচনা করা উচিত তা নিম্নরূপ :

- ক. যতদূর সম্ভব ক্রেতাদের কাছাকাছি এবং ভালো যোগাযোগ সম্পন্ন স্থানে নার্সারি স্থাপন করা উচিত।
- খ. পাহারা ও সার্বক্ষণিক তদারকির সুবিধার্থে নার্সারি মালিকের বাসগৃহ অফিসের কাছাকাছি হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- গ. জমি আশপাশ থেকে উঁচু হওয়া দরকার, যাতে বৃষ্টি পর পানি না জমে।
- ঘ. জায়গা ছায়াবিহীন হতে হয়।
- ঙ. এর পাশে ভালো পানির উৎস থাকা প্রয়োজন।
- চ. নির্বাচিত স্থানের মাটি দোঁআশ বা বেলে দোঁআশ হওয়া দরকার।

শীতপ্রধান দেশসমূহে আজকাল সাধারণত গ্রিন হাউজে চারা উৎপাদন করা হয়। গ্রিন হাউজে শৈত্য, উষ্ণতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে আলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ভারী বৃষ্টি থেকে চারা রক্ষার জন্য স্বচ্ছ পলিথিনের ছাউনি তৈরি করা। উন্নত দেশসমূহে এখন প্লাস্টিক ট্রের মধ্যে পিট, মস, পার্লাইট, ভার্মিকুলাইট ইত্যাদির মাধ্যমে চারা উৎপাদন করা হয়।

৫.৫.১. জমি তৈরি ও বীজ বপন : অল্প সংখ্যক চারা মাটির টবে, কাঠের চারাবাক্সে অথবা প্লাস্টিকের ট্রে তে উৎপাদন করা যেতে পারে। এগুলো স্থানান্তরযোগ্য বলে বৃষ্টি ও রোদ থেকে সহজেই চারাকে রক্ষা করা যায়। মাটি হিসেবে নদীর তলায় দোআঁশ পলিমাটি ও পচা গোবরের ৫০:৫০ মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে। বেশি সংখ্যক চারা প্রয়োজন হলে উন্মুক্ত জমিতে উৎপাদন করতে হয়। প্রথমে সম্পূর্ণ জমি গভীরভাবে অন্তত ২০ সেন্টিমিটার কর্ষণ করে মাটি ঝুরঝুরে এবং ঢেলামুক্ত করতে হয়। কর্ষণের পর সম্পূর্ণ কয়েকটি ভাগ করা প্রয়োজন। সাধারণত এদেশে ৩×১ মিটার ক্ষেত্রফলের বীজতলা সুবিধাজনক। পাশাপাশি দুটি বীজতলার মধ্যে অন্তত ৬০ সেন্টিমিটার ফাঁকা রাখতে হবে। বীজতলায় সারি করে অথবা ছিটিয়ে বীজ বোনা যায়। ছিটিয়ে বুনতে হলে উপরের কিছু মাটি (১-১.৫ সেন্টিমিটার) সরিয়ে নিয়ে বোনার পর সে মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয়। সারিতে বুনলে কাঠের ফলি দিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে নালা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। বোনার পর মাটি হালকা করে চেপে দেওয়া যেতে পারে। শুষ্ক মাটিতে বীজ বুনে ভারি সেচ দিলে উপরে চটা বেঁধে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে বপনের পূর্বে বীজ কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে অঙ্কুরোদগম দ্রুত হয়। দ্বিতীয় বেডে স্থানান্তর করলে একটু বেশি ঘন করে বীজ বোনা যায়, অন্যথায় এমন ভাবে বীজ বুনতে হয় যাতে পাশাপাশি দুটো চারা ২-৩ সেন্টিমিটার দূরত্বে থাকে।

৫.৫.২. চারার যত্ন : বীজ বোনার পর বীজতলা চাটাই দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত। চারা গজানোর পরও কিছুদিন আংশিক ছায়া প্রদান আবশ্যক। এ ছাড়া মাটি দ্রুত শুকিয়ে যায়। চারার শিকড় বৃদ্ধি পাওয়ার পর রোদে কোনো ক্ষতি করতে পারে না। গজানোর পূর্বে ও পরে চারা বৃষ্টি থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। এক হেক্টর জমির জন্য চারা উৎপাদন করতে বিভিন্ন সবজিতে প্রয়োজনীয় বীজের পরিমাণ নিচে উল্লেখ করা হলো। (বীজতলার আকার (৩ × ১) বর্গমিটার)।

সারণি ৫.২. বিভিন্ন সবজির জন্য বীজের পরিমাণ, বীজতলার সংখ্যা ও বীজের সংখ্যা

সবজির নাম	বীজের পরিমাণ (গ্রাম)	বীজতলার সংখ্যা	প্রতি গ্রামে বীজের সংখ্যা (গ্রামে)
ফুলকপি	১২৫-১৫০	২০	৩৭০
বাঁধাকপি	১৫০-১৮০	২০	২৮০
ওলকপি	৮০০-১০০০	৫০	২৬০
ব্রোকলি	১৪০-১৬০	২০	২৮০
বেগুন	২৫০-৩০০	১৮	২৭০
মরিচ (দেশী)	২০০-২২৫	২০	২৯০
লেটুস	১৯০-২১০	২৫	১০০০
পুঁইশাক	৯০০-১০০০	১২	৩২
পেঁয়াজ (দেশী)	১৪০০-১৬০০	১২৫	৩২০
টমেটো	২৫০-৩০০	১৫	৩২০

মাটি অম্লীয় হলে বীজতলা তৈরির সময় প্রতি শতকে ২-৩ কেজি চুন ব্যবহার করতে হয়। চারার পাতা মেলতে শুরু করলে ইউরিয়া ও মিউরেট অফ পটাশ সার প্রয়োগ করতে হয়। এসব সার সেচের পানি সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা উত্তম। প্রয়োজনবোধে চারা পাতলা করে দিতে হয়।

৫.৫.৩. চারার রোগ দমন : বপনকৃত বীজতলায় কচি চারা রোগাক্রান্ত হতে পারে। গজানোর পর রোগের আক্রমণ হলে চারার কাণ্ড মাটি সংলগ্ন স্থানে পচে গিয়ে চারা নেতিয়ে পড়ে। চারার এভাবে নষ্ট হওয়াকে নেতিয়ে পড়া (damping off) বলে। রোগ বাংলাদেশে চারা উৎপাদনের এক বড় সমস্যা। বীজতলায় মাটি সবসময় ভেজা থাকলে এবং মাটিতে বাতাস চলাচলের ব্যাঘাত হলে এ রোগ দেখা দেয়, এজন্য বীজতলায় মাটি সুনিষ্কাশিত রাখা দরকার

৫.৫.৪ দ্বিতীয় বীজতলায় চারা স্থানান্তর : জমিতে লাগানোর পূর্বে সবজির চারা মূল বীজতলা থেকে দ্বিতীয় বীজতলায় রোপণ করতে হয়। দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরিত করা হলে কপি গোত্রের সবজি ও টমেটোর চারার শিকড় বিস্তৃত ও শক্ত হয়। পাশ্চাত্যে

স্থানাভাবে কাঁচঘরে প্রথমে খুব ঘন করে বীজ বোনা হয় এবং গজানোর পর চারা পাতলা করে অন্যত্র রোপণ করা হয়।

৫.৫.৫. চারা রোপণ : রোপণের উপযুক্ত হলে দেরি না করে সবজির চারা রোপণ করতে হয়। অধিকাংশ সবজির বয়স ৩০-৩৫ দিন হলেই চারা রোপণ করা যায়। এ বয়সে চারায় ৪-৫টি পাতা গজায়। বয়স্ক চারা রোপণ করলে ফলন কমে যায়। বীজতলা থেকে উত্তোলনের পূর্বে চারার কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়িয়ে নিতে হয়। উত্তোলনের সপ্তাহ খানেক পূর্ব থেকে বীজতলায় সেচ ও সার দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে চারা শক্ত করা যায়।

৫.৫.৬. ভালো চারার গুণাগুণ : ভালো চারার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়

ক. চারা স্বাভাবিক আকারের হয়।
খ. ৩-৫টি অধিক ৬টি পাতাযুক্ত হয়।
গ. রোগের সবরকম লক্ষণ থেকে মুক্ত থাকবে।
ঘ. শিকড় অক্ষত এবং মাটির দলায় জড়ানো থাকবে।
ঙ. কাণ্ড পুরু ও সতেজ হয়।
চ. পাতা স্বাভাবিক সবুজ থাকবে।

বেড থেকে উত্তোলনের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চারা রোপণ করতে হয়। বিকেলে চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। মেঘলা দিনে যে কোনো সময় রোপণ যায়। রোপণের সময় দুর্বল ও রোগাক্রান্ত চারা ফেলে দিতে হয়। উত্তোলিত চারার শিকড়ে মাটির দলা লেগে থাকা ভালো।

৫.৫.৭. বুস্টার দ্রবণ ব্যবহার : রোপণের সময় চারার শিকড় খুবই সীমিত সংখ্যক থাকে বলে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যোপাদান শোষণ করতে পারে না। এ অবস্থায় খাদ্যোপাদান সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে রোপণের পরপরই খাদ্যোপাদানের হালকা দ্রবণ চারার গোড়ায় প্রয়োগ করা হয়। একে বুস্টার দ্রবণ বলা হয়। বুস্টার দ্রবণ একাধিক রকমের হতে পারে। বুস্টার ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট ও মনোপটাসিয়াম ফসফেট মিশিয়ে এর ৫০০ গ্রাম প্রতি ১০০ লিটার পানিতে দ্রবীভূত করে বুস্টার দ্রবণ তৈরি করা হয়। বুস্টার দ্রবণ তৈরির উপাদানসমূহ উল্লেখ করা হলো।

ক. ডাইএমোনিয়াম ফসফেট (DAP)-২৫০ গ্রাম,
খ. পটাসিয়াম ফসফেট (KH_2PO_4) - ২৫০ গ্রাম
গ. পানি ১০ লিটার।

৫.৬. অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার : সবজি ফসলের অযৌন বংশবিস্তারের জন্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহৃত হয়। এগুলোর বিবরণ দেয়া হলো।

ক. **শাখা কলম :** সাধারণ কাণ্ডের খণ্ডিত অংশ থেকে নতুন গাছ উৎপাদন করা হয়। এর সাহায্যে বাঁধাকপির বংশবিস্তার করা যায়। শাখা কলম দিয়ে আলু, টমেটো কাকরোল, পটল প্রভৃতির বংশবিস্তার করা যায়।

খ. **শল্ক কন্দ :** শল্ককন্দ একটি বিশেষ ধরনের ভূ-নিম্নস্থ অঙ্গ, যা অত্যন্ত খাটো কাণ্ড ও পুরু শল্কের সমন্বয়ে গঠিত। এতে কাণ্ড এবং এর অগ্রভাগের বৃদ্ধিকেন্দ্র শল্ক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। শল্ককন্দ দ্বারা রসুন ও পেঁয়াজের বংশবিস্তার করা হয়।

গ. **গুঁড়ি কন্দ :** কাণ্ডের নিচের অংশের নিরেট অংশকে গুঁড়িকন্দ বলা হয়। এর গায়ে সমান্তরাল রেখার আকারে পত্রদাগ থাকে। গুঁড়িকন্দের আইশ থেকে যেসব

ক্ষুদ্রাকার শাখা বের হয়ে সেগুলো মুখী বা গুঁড়িকন্দিকা নামে পরিচিত মুখীর গায়ে শল্কপত্রের দাগ থাকে। হলুদ ও বিভিন্ন জাতের কচুর বংশবিস্তারের জন্যে গুঁড়িকন্দ ও মুখী ব্যবহৃত হয়।

ঘ. **রাইজোম** : রাইজোম (Rhizome) এক ধরনের রূপান্তরিত কাণ্ড, যা মাটি সংলগ্ন বা মাটির ভিতরে থেকে পাশের দিকে বিস্তারলাভ করে কাণ্ডে সুস্পষ্ট পর্ব, পর্বমধ্য ও শল্কপত্র থাকে। কাণ্ডের প্রধান অক্ষ ও তার শাখার অগ্রভাগ থেকে বায়ব বিটপ উৎপন্ন হয়। আদার কাণ্ড রাইজোমের একটি উদাহরণ

ঙ. **কন্দ** : কাণ্ডের ভূ-নিম্নস্থ শাখার অগ্রভাগ খাদ্য সঞ্চিত হওয়ার দরুণ স্ফীত হয়ে টিউবার উৎপাদন করে। এর গায়ে অবস্থিত চোখসমূহ কাণ্ডের কুঁড়ির অবস্থান নির্দেশ করে। সাধারণত চোখের নিচে শল্কপত্রের দাগ থাকে টিউবার দ্বারা আলুর বংশবিস্তার করা হয়

চ. **টিউবার কন্দ** : কাণ্ডের ভূ-উপরস্থ অংশের কাক্ষিক কুঁড়ি অনেক সময় স্বাভাবিক শাখায় পরিণত না হয়ে মাংসল অঙ্গ সৃষ্টি করে, এগুলোকে টিউবারকন্দ বা বুলবিল বলা হয়। মেটে আলুর জাত বুলবিল উৎপাদন করে।

ছ. **গুঁড়িচারা বা সাকার** : কোনো কোনো উদ্ভিদের কাণ্ডের ভূ-সংলগ্ন অংশ বা মূল থেকে পার্শ্বমুকুল বের হয়। প্রথমাবস্থায় এগুলো মাতা উদ্ভিদ থেকে খাদ্যগ্রহণ করে, পরে নিজস্ব শিকড় ও পত্রপল্লব উৎপাদন করে স্বয়ং-সম্পূর্ণ উদ্ভিদে পরিণত হয় এগুলোকে অবগুট, স্লিপ ইত্যাদি বিভিন্ন নামেও উল্লেখ করা হয়। কোনো কোনো জাতের কচু গুঁড়িচারা উৎপাদন করে বাঁধাকপি ও ফুলকপি ফসল সংগ্রহের পর কাণ্ডের পরিত্যাক্ত অংশ থেকে গুঁড়িচারা বের হয়। এগুলো দিয়ে বংশবিস্তার করা যায়।

জ. **কন্দমূল** : খাদ্য জমা হওয়ার কারণে স্ফীত হয়ে উঠা মূলের নাম কন্দমূল। কোনো কোনো উদ্ভিদে কন্দমূল থেকে চারা বের হয়। যেমন- কাকরোল, মিষ্টিআলু প্রভৃতি

২.৫. **মুলার বীজ উৎপাদন পদ্ধতি (উদাহরণ)** : মূল গাছ এবং পুনঃ রোপিত গাছ থেকে মূলার বীজ উৎপাদন করা যায়। বীজ বপন করে চারা পাতলা করে দেওয়া হয় এবং গাছ যথাস্থান থেকেই বীজ উৎপাদন করে। জাতের বৈশিষ্ট্য ও সমরূপিতা বজায় রাখার জন্য বাছাই করে অনভিপ্রেত গাছ সরিয়ে ফেলা হয়। পুনঃরোপিত পদ্ধতির ক্ষেত্রে গাছের ফুল ধরার পূর্বে অনভিপ্রেত গাছ উপড়ে ফেলে দিয়ে আবার রোপণ করা হয় বাছাইয়ের মাধ্যমে জাতের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা হয়। বীজ ফসল লাগানোর আসল সময় জাতের উপর নির্ভরশীল। বীজের ফলন বপন ও রোপণের দূরত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয় গাছ ঘন করে লাগালে ফলন বেশি হয়, কিন্তু অত্যধিক ঘন হলে কন্দমূল সঠিকভাবে বিকশিত হয় না এবং এতে বাছাই কাজে ভুল হয়ে যেতে পারে। বর্ষজীবী জাতসমূহের বীজ ফসল নভেম্বরের পূর্বে লাগানো প্রয়োজন। মূলা সম্পূর্ণরূপে পরপরাগায়িত উদ্ভিদ এবং পরাগায়ন মৌমাছি উপর নির্ভরশীল। যদি কোনো কারণে ফুল ফোটার সময় বীজ ফসলে পোকা কম থাকে তাহলে অনেক ফল বীজবিহীন হতে পারে তাপমান বেশি শুষ্ক হলে এবং তাপমাত্রা বেড়ে গেলে ফুলের গর্ভমুণ্ড শুকিয়ে যায়। এ অবস্থায় পরাগায়ন হলেও পরাগ অঙ্কুরিত হতে পারে না, যার ফলে বীজের ফলন

কম হয়। সঙ্কর বীজ উৎপাদনের জন্য তিন রকমের সঙ্করায়ন করা হয়, যথা- সিঙ্গেল ক্রস, থ্রি-ওয়ে ক্রস এবং ডাবল ক্রস। এ উদ্দেশ্যে স্ব-অসঙ্গতি লাইন তৈরি করতে হয় যাতে মাঠে স্বাভাবিক পরপরাগায়নের মাধ্যমে বীজ উৎপন্ন হয়। মূলার বীজ উৎপাদনে ফসলে স্বতন্ত্রীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উচু মানের বীজ উৎপাদনে একই প্রজাতির দুটি ফসলের মধ্যে এক কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যবধান রাখা হয়। বাংলাদেশে এত দূরত্ব রাখা সম্ভব নয়, তবে যত বেশি রাখা যায় ততই ভালো। ফল পরিপক্ক হওয়ার পর কাণ্ড কেটে আটি বেধে ভালো করে শুকিয়ে বীজ আলাদা করতে হয়।

৫.৮. ফুলকপিতে বীজ উৎপাদন পদ্ধতি (উদাহরণ) : বাংলাদেশের জলবায়ু সাধারণভাবে আগাম ও মধ্য-মৌসুমী জাতের বীজ উৎপাদনের উপযোগী। গাছে মধ্য-ফেব্রুয়ারির পূর্বে ফুল ধরাতে পারলে বীজ উৎপাদনে কোনো অসুবিধা হয় না। বাংলাদেশে মার্চ মাস থেকে আবহাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। মার্চের মধ্যভাগ থেকে তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এমনকি এসময় থেকেই ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। ফুল ধরার সময় ভারি বৃষ্টি ক্ষতিকর। কোনো কোনো বছর মার্চ মাস থেকে ঘন ঘন ভারি বৃষ্টি হতে থাকে। এসব কারণে নাবি জাতের বীজ উৎপাদন ঝুকিপূর্ণ। পুষ্পমঞ্জরীর সম্পূর্ণ গঠিত হওয়ার পূর্বে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে প্রাকমঞ্জরী পত্র সবুজ বর্ণ ধারণ করে এবং তা দৃষ্টিগোচর হয়। মঞ্জরী গঠিত হবার পর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ফুলকুঁড়ির বিকাশ বন্ধ, অযৌন কুঁড়ি বের হতে থাকে। উচ্চ তাপমাত্রা ও ঝড়-বৃষ্টির কারণে পরাগের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে পরাগায়ন প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বীজের ফলন কমে যায়। বীজ উৎপাদনের জন্য ফসল এমনভাবে লাগানো দরকার যাতে প্রাকমঞ্জরী উৎপত্তি হওয়ার সময় গাছে পর্যাপ্ত সংখ্যক পাতা থাকে।

সঙ্কর জাতে বীজ উৎপাদনে মাতা-পিতা জাতে একই সময়ে ফুল ধরাতে হয়। প্রাকমঞ্জরীর অংশ-বিশেষ কেটে ফেলে দিয়ে (scooping) ফুল ধরার সময় কিছুটা পরিবর্তন করা সম্ভব। প্রাকমঞ্জরীর উপরের দিকের শাখা কাটলে ফুল ধরা সামান্য পিছিয়ে যায়। সঙ্কর বীজ উৎপাদনে আজকাল স্ব-অসঙ্গতি কাজে লাগানো হয়। ফুলকপির অনেক জাতে তা অনুপস্থিত। এজন্য সঙ্করের নির্বাচিত পিতা-মাতা জাতের অন্তত একটিতে পুংবন্ধ্যাত্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করানো হয়, আর দুটিতেই উক্ত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে পারলে বীজ উৎপাদনের খরচ অনেক কমে যায়।

ফুলকপির বীজ উৎপাদনে রোগিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। বীজ ফসলে একই ধরনের উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং একই সাথে ফুল ধরে এমন গাছ রেখে দিয়ে বাকি গাছ ফুল ফোটার পূর্বে সরিয়ে ফেলতে হয়। তা না হলে সমগুণিতা নষ্ট হয়ে যায় এবং জাতের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। ফুলকপির পরাগ আঠালো। এজন্য মৌমাছি যথেষ্ট সংখ্যায় না থাকলে পরাগায়ন না হওয়ার ফলের বীজের ফলন কমে যায়। অনেক দেশে আজকাল বীজ ফসলে গৃহপালিত মৌমাছি ব্যবহার করা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সবজি উৎপাদনের নীতি ও পদ্ধতি

৬.০. সবজি উৎপাদনের নীতিমালা

সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ নীতিমালা ও পদ্ধতি রয়েছে। সে সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো।

৬.১. চারা উৎপাদন

কোনো কোনো সবজি সরাসরি জমিতে বপন করা হয়। বেশিরভাগ গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন সবজির জন্য বীজতলা প্রস্তুত করে তাতে বীজ বপন করতে হয়। চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলা বিশেষ যত্নের সাথে প্রস্তুত করা হয় এবং প্রখর রোদ ও বৃষ্টির প্রকোপ হতে চারাকে রক্ষার করার জন্য বীজতলায় ছাউনির ব্যবস্থা করতে হয়।

৬.২. জমি নির্বাচন ও বীজতলা তৈরি

বীজতলার জন্য বায়ু চলাচলের সুবিধা যুক্ত উঁচু স্থান আবশ্যক। কাজের সুবিধার জন্য ৩ মিটার দীর্ঘ ও ১ মিটার প্রশস্ত করে বীজতলা তৈরি করা ভালো। বীজতলার জন্য কোদাল দিয়ে প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার গভীর করে মাটি কর্ষণ করতে হয়। তারপর নিম্নলিখিত তিনটি স্তরে বীজতলা সজ্জিত করা যেতে পারে।

ক. নিম্নস্তর– ৮ সেন্টিমিটার : পুরাতন সুরকি, ভাঙা ইট, পোড়ামাটি

খ. মধ্যস্তর– ৮ সেন্টিমিটার : দোঁআশ মাটি ও বালির সমমিশ্রণ।

গ. উপরিস্তর– ৮ সেন্টিমিটার : দোঁআশ মাটি, পচা গোবর ও পাতা পচা সার।

এরপর বীজতলার পাশে দৃঢ়ভাবে এবং উপরে হাল্কাভাবে চেপে দিতে হয়। রোদ ও বৃষ্টি হতে বীজ ও চারাকে রক্ষা করার জন্য ৫০ সেন্টিমিটার উপরে বাঁশের চাটাই বা খড় দিয়ে তৈরি চাল ব্যবহার করতে হয়।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টিপাতের কারণে শীতকালীন সবজির বীজ বপন করার জন্য বীজতলা তৈরি করা কঠিন। সেক্ষেত্রে বারান্দায় বড় টবের মধ্যে মাটির স্তর সাজিয়ে বীজতলা বানানো যায়।

৬.৩. বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক–

ক. বিশ্বস্ত বিক্রেতার নিকট হতে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

খ. নিজের বাগান হতে বীজ সংগ্রহ করতে হলে সুস্থ, সুপুষ্ট ও বৃহদাকৃতি ফলসমূহকে পূর্ব হতে চিহ্নিত করতে হয়।

গ. ফল পরিপক্ব হলে তা সংগ্রহ করে রোদে শুকাতে হয়।

ঘ. কুমড়া, লাউ প্রভৃতি ফল শুকানো কঠিন। এসব ফলে কেটে বীজ বের করে শুকাতে হয়।

ঙ. বীজ কালো বোতলে পূর্ণ করে ছিপি এঁটে রাখতে হয়

চ. যেসব বীজ পরিমাণে অধিক সেগুলোকে বস্তায় রেখে বস্তার মুখ সেলাই করে রাখা দরকার।

ছ. মাঝে মাঝে সংরক্ষিত পাত্র থেকে বের করে বীজ রোদে শুকাতে হয়।

৬.৪. বীজ পরীক্ষা

কোন বীজের অঙ্কুরোদ্গমের শতকরা হার কত তা বীজ বপনের আগে পরীক্ষা করে নিলে ভালো হয়। এখানে বীজ পরীক্ষার কয়েকটি উপায় বর্ণনা করা হলো।

ক. বীজ পেট্রিডিশ অথবা এ ধরনের কোনো পাত্রে বসাতে হয়।

খ. চোষ কাগজটি পানি দিয়ে ভিজিয়ে বীজ বসাতে হয়।

গ. পেট্রিডিশটি ঢেকে রেখে দিতে হয়

ঘ. ১২ ঘণ্টা পর পর ঢাকনি খুলে কিছু পানি ঢেলে চোষ কাগজ ভিজিয়ে দিতে হয়।

ঙ. বেশির ভাগ সবজির বীজ চার-পাঁচ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে যায়।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সব বীজ অঙ্কুরিত হয় এগুলোর সংখ্যা নিম্নরূপ সূত্রের সাহায্যে গণনা করে সেই পাত্রের বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা জানা যায়।

$$\text{অঙ্কুরোদ্গম \%} = \frac{\text{অঙ্কুরিত বীজের সংখ্যা}}{\text{ডিসে স্থাপিত বীজের সংখ্যা}} \times ১০০$$

চ. লবণ বা ইউরিয়া মেশানো পানিতে বীজ ফেললে যেসব বীজ পানিতে ডুবে যায় সেগুলোকে ভালো বীজ বলা যেতে পারে।

৬.৫. বীজ বপন

জো অবস্থায় মাটি বীজ বপনের জন্যও উপযুক্ত থাকে। বীজতলা তৈরি করা থাকলে তাতে সরাসরি বীজ বপন করা যায়। প্রয়োজনমতো বীজ নিয়ে বীজতলায় সমানভাবে বুনে দিতে হয়। বোনার পূর্বে বীজ এক রাত পানিতে ভিজিয়ে রাখলে সহজে অঙ্কুরোদ্গম হয় কুমড়া, শসা, ঝিঙা, উচ্ছে প্রভৃতির বীজ বপনের পরে পানি সেচ দিতে হয় এবং উপরে নাড়া দিলে ভালো হয়।

৬.৫.১. বীজ বপনের সাধারণ নীতি : ডাঁটা, লালশাক, নটেশাক, ফুলকপি, বাঁধাকপির বীজ আকারে বেশ ছোট। বীজতলায় ভালোরূপে বোনার জন্য এ বীজের সাথে বালি, ছাই, বা গুড়া মাটি মিশিয়ে নিতে হয়। লাউ, ঝিঙা, চিচিঙা শসা প্রভৃতির বীজ তলার মাটিতে একটু চেপে বসিয়ে দিতে হয়। বপনের চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে গেলে চারা বের হবার পূর্ব পর্যন্ত মাটিতে পানি সেচ লাগে না। বীজ বপনের চার-পাঁচ দিন পর হতে মাটিতে বিকালে পানি সেচ দরকার । এ কাজের জন্য ঝাঁঝরি ব্যবহার করতে হয়।

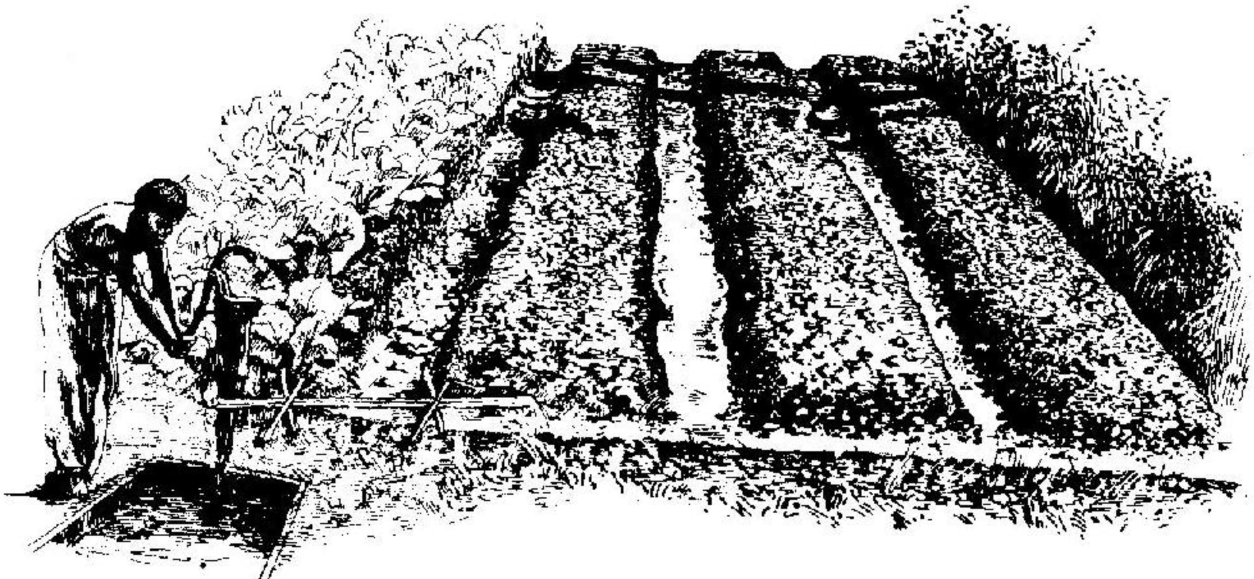

চিত্র ৬.১ : দেশী পদ্ধতিতে বীজতলায় পানি সেচ

৬.৫.২. চারা রোপণ : চারা রোপণের কয়েকদিন পূর্বে জমি কর্ষণ করে কম্পোস্ট, খড় খণ্ড ছাই প্রভৃতি মেশাতে হয়। বিকালে চারা রোপণ করা উত্তম। চারা এমনভাবে রোপণ করতে হয়, যাতে গোড়ার যে স্থান পর্যন্ত বীজতলায় মাটির নিচে ছিল ততটুকু কিংবা তার সামান্য বেশি মাটির নিচে যায়।

৬.৬. চারার যত্ন

ডাঁটা, লালশাক প্রভৃতি সূক্ষ্ম ত্বকবিশিষ্ট ক্ষুদ্র বীজের বপনের তিন-চার দিনের মধ্যেই অঙ্কুরোদ্গম হয়। তবে বেশির ভাগ বীজ অঙ্কুরিত হতে দশদিন পর্যন্ত সময় লাগে। বীজতলায় চারা বের হবার পরে সকালের ও বিকালে ঝাপ সরিয়ে চারায় রোদ লাগানো দরকার। চারা যত বড় হয়, সেগুলোর রোদের তীব্রতা সহ্য করার শক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। শেষের দিকে ১১টা হতে ৩টা পর্যন্ত ছায়া প্রদান করতে হয়। চারাগাছে পানি সেচের কাজটি অতি সাবধানে করা আবশ্যক। ঝাঁঝরির মুখ চারার কাছে রাখতে হয়। পরপর কয়েকবার পানি সেচের পর মাটি শক্ত হয়ে গেলে ছোট নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হয়। ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, প্রভৃতি শাক-সবজির চারা বাগানে রোপণের পূর্বে দুই-একবার অন্য বীজতলায় স্থানান্তরিত করলে ভালো হয়।

৬.৬.১. পানি সেচ : রোপণের পরে চারায় পানি সেচ দিতে হয়। চারা রোপণের চার/পাঁচ দিন পর কলাগাছের খোল, কচুরিপনা অথবা খড় দিয়ে চারাগাছকে ছায়াদান করা দরকার। সবজি বাগানে পানি সেচের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার হয়। যেমন–

- ক. বীজতলায় এবং মাঠের চারাগাছে ঝাঁঝারি দিয়ে পানি সেচ দেয়া হয়।
- খ. ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো প্রভৃতি গাছে নালা পদ্ধতিতে পানি সেচ দেয়া ভালো।
- গ. কুমড়া, লাউ, ঝিঙা, চিচিঙ্গা প্রভৃতিতে থালা পদ্ধতিতে পানি সেচ দিতে হয়।

৬.৬.২ নিকাশ : সবজি উৎপাদনের পানি ও নিকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি সবজি উৎপাদনের বড় সমস্যা। এজন্য বর্ষাকালে সবজির জন্য নির্বাচিত জমিতে নালা কেটে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হয়। এঁটেল মাটির অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশন ব্যবস্থা অপ্রতুল হলে তাতে বালি মাটি যোগ করে এ ধরনের মাটি সবজি চাষের জন্য উপযোগী করে নিতে হয়।

৬.৬.৩. আন্তঃকর্ষণ : ফসল জমিতে থাকা অবস্থায় মাটির ভৌত অবস্থা উন্নয়নের জন্য আন্তঃকর্ষণ করা হয়। মাটি আলগা করা, সেচের পর সৃষ্ট চটা ভাঙা, গাছের গোড়ায় মাটি দেয়া আন্তঃকর্ষণের প্রধান কাজ।

৬.৬.৪. মালচিং : মাটি থেকে পানির বাষ্পীভবন কমানোর উদ্দেশ্যে ফসলের সারির মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা খড়কুটা দিয়ে ঢেকে দেওয়াকে মালচিং বলে। কচুরিপানা মালচিং এর জন্য ভালো। এ উদ্দেশ্যে খড়, বিচালি, মরা পাতা, ঘাস ইত্যাদিও ব্যবহার করা যায়।

৬.৭. সার প্রয়োগ

সারের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে বোঝতে হলে মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গঠন, সারের রাসায়নিক ধর্ম, ফসল কর্তৃক সারের চাহিদা, মাটির উর্বরতা, সার প্রয়োগের সময় ও পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা থাকা আবশ্যক। যেমন–

১) জমির উর্বরতা গবেষণাগারে মাটি পরীক্ষা করে মাটির উর্বরতা জানা যায়।
২) মাটিতে জৈব সার প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হয়।
৩) ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, জিঙ্ক, বোরন, মলিবডেনাম ইত্যাদির ঘাটতিতে এসব গৌণ সার প্রয়োগ করতে হয়।
৪) বাংলাদেশে ইউরিয়া সারের অপচয় সর্বাধিক। প্রয়োগকৃত সারের ৬০% এরও বেশি ফসলের কাজে লাগে না। তাই ইউরিয়া প্রয়োগের ব্যাপারে অধিক যত্নবান হতে হয়।

সবজি বাগানের জন্য জৈব সার বিশেষ উপযোগী। গোবর সার, কম্পোস্ট, সবুজ সার, তেলের খৈল প্রভৃতি সার সবজি গাছের বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক। বেশিরভাগ শাক-সবজি অল্প দিনের ফসল। এ জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক অজৈব সার ব্যবহার করে অল্প সময়ের মধ্যে ভালো ফলন আশা করা যায়।

৬.৭.১. গাইড হিসেবে ব্যবহারের জন্য সাধারণীকৃত সার মাত্রা

সবজি বীজ হার, রোপণ দূরত্ব এবং সার ব্যবহারের নির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রতিটি সবজির চাষ প্রযুক্তিতেও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু একটি সাধারণ গাইড লাইন দেওয়া হলো।

সারণি ৭.১ ফসলের নাম, সারের পরিমাণ, ফসল সংগ্রহের সময় ও ফলন।

ফসল	সারের পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)			শস্য সংগ্রহ	ফলন (টন/হেক্টর)
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	সময়	
আলু	১৫০	১৬০	৬০	ডিসেম্বর	৯-২৩
উচ্ছে বা করলা	১৩০	৮০	৭০	মার্চ-মে জুলাই-সেপ্টেম্বর	৮-১২
ওলকচু	১৪০	৭৫	১৯০	১-২ বছর পর	২০-২৫
ওলকপি	২০০	৫০	২৫	নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি	১৪-২৮
কদল	১৪০	৭০	৬০	মার্চ-মে	১২-১৭
কলমি শাক	২৮০	১২০	৭৫	সারা বছর	৩৫-৪০
কচু	১০০	৫০	১০০	আগ-নভেম্বর	৯-১৫
কাকরল	১২৫	১০০	১০০	মে-নভেম্বর	৮-১০
গাজর	১৭০	১৫০	১৭৫	ডিসেম্বর-মার্চ	২৫-৩০
গোলমরিচ	১৫০	১৫০	১৭৫	ডিসেম্বর-মার্চ	৯.১৮
চাল কুমড়া	১১০	১৭৫	১৩০	জুন-অক্টোবর	২৫-৩০
ঢেঁড়স	১২৫	৮০	৬০	মে-অক্টোবর	১০-১২

চীনা বাঁধা কপি	১৫০	২৫	২৫	নভেম্বর-জানুয়ারি	২০-২৫
ঝিঙা	১২৫	৮০	৬০	মে-সেপ্টেম্বর	১০-১৫
টমেটো	২৬০	১৮০	২২০	নভেম্বর-এপ্রিল	২৫-৩০
ডাটা	২৬০	১০০	১৬০	মার্চ-সেপ্টেম্বর	৩০-৪০
ঢেঁড়স	১৪০	১২০	১১০	এপ্রি-আগ সারা বছর	৬-৮
ধনিয়া	৫০	৫০	২৫	নভেম্বর-মার্চ	০.৪-০.৫
ধুন্দুল	১২৫	৮০	৬০	মে-অক্টোবর	১০-৫০
নটেশাক	৫০	২৫	২৫	মার্চ-সেপ্টেম্বর	৪.৫-৭০
পটল	১০০	১৫০	৫০	মার্চ-সেপ্টেম্বর	৭০-১১১
পক্ষমুখী	১০০	৫০	১০০	নভেম্বর-মার্চ	৯-১১
পাটশাক	১০০	২৫	৫০	এপ্রিল-সেপ্টেম্বর	৭-১১
পালংশাক	২২৫	৭০	৬০	অক্টোবর-মার্চ	৩০-৪০
পুঁইশাক	২৮০	৮০	৭৫	জুন-অক্টোবর	৩০-৩৫
পুদিনা	৫০	৫০	২৫	সারাবছর	৩.৫-৪.৫
পেঁয়াজ	২৬০	১৬০	১৩০	ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল	১৩-১৫
ফুলকপি	২২০	১৩০	১৩৫	নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি	৩০-৪০
বরবটি	৩০	১২৫	১২০	সেপ্টেম্বর-জানুয়ারি	১০-১৫
ব্রকোলি	১০০	২২৫	৫০	ডিসেম্বর-মার্চ	৯-১৬
বাঁধাকপি	৩০০	১২০	১২০	ডিসেম্বর-মার্চ	৮০-৯০
বেগুন	৩০০	২২০	২৬০	সারা বছর	৩-৫
মরিচ	১৮০	২৫০	১৬০	মে-জুলাই, জানুয়ারি-মার্চ	১-২
মটর	৭৫	১৫০	২৫	ডিসেম্বর-মধ্য মার্চ	১-১.৫
মানকচু	১০০	৫০	১৫০	১-৩ বছর	১৩-৪০
মিষ্টি আলু	১০০	৫০	৫০	মার্চ মে	১৫-২৫
মিষ্টি কুমড়া	১১০	১৭৫	১৩০	মার্চ-সেপ্টেম্বর	২৫-৩০
মুখীকচু	১৫০	১২৫	১৪০	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর	১০-১৫
মুলা	১০০	৫০	৫০	নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি	৩০-৪০

উল্লেখ্য যে, পাতাজাতীয় গাছের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন এবং শিকড় জাতীয় গাছের জন্য অধিক পরিমাণে পটাশিয়ামের প্রয়োজন। বড় পাতা বিশিষ্ট সবজির

জন্য ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োগ করতে হয়। এছাড়া অম্লীয় মাটিতে নিয়মিত চুন প্রয়োগ করতে হয়। সবজি ফসলে টি.এস.পি ও জিপসাম সার ব্যবহার করা হলে সে জমির অম্লত্ব প্রশমন হয় ও মাটির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য ডলো চুন ব্যবহার অধিক উপকারী। লিগিউমজাতীয় সবজিতে নাইট্রোজেন ব্যবহার কমিয়ে দিতে হয়। আন্তঃফসল ও মিশ্র ফসলে সার প্রয়োগের সময় অন্তর্ভুক্ত সব ফসলের সার চাহিদা ও উৎপাদন মাত্রা বিবেচনা করতে হয়।

সারণি ৭.২. বিভিন্ন ফসল কর্তৃক পরিশোষিত খাদ্য উপাদানের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)

সবজি	নাইট্রোজেন (N)	ফসফরাস (P_2O_5)	পটাশ (K_2O)
বাঁধাকপি	৩৮	১৮	১৮
ফুলকপি	৩১	৪৫	২২
ওলকপি	৩১	১৮	১৩
বিট	২৭	৩৬	২৭
শালগম	২৭	৩৬	২৭
পালংশাক	৩৩	২২	১৮
লেটুস	২৭	২২	১৮
আলু	৪৫	৩৬	৫৪
মিষ্টি আলু	২০	৩১	৩৬
মটর	১৩	২৭	১৩
টমেটো	৩৬	৫৪	২৭
বেগুন	২২	৩৬	১৮
মরিচ	১৮	৩৬	১৩
শসা	১৩	৩৩	১১
গাজর	২২	২২	২২

উল্লিখিত খাদ্যোপাদানের পরিমাণের ২০% মাটি হতে পাওয়া যাবে ধরে নিয়ে অবশিষ্ট ৮০% সারের মাধ্যমে দিতে হয়। এর অর্ধেক পরিমাণ জৈব সারের মাধ্যমে ভূমি প্রস্তুতির সময় প্রয়োগ করে বাকি অর্ধেক রাসায়নিক সারের মাধ্যমে চারার একমাস হতে দুমাস বয়সে প্রয়োগ করা যেতে পারে। গোবর সার, খামার সার, কম্পোস্ট, সবুজ সার খৈল ইত্যাদির মাধ্যমে যতোটা পারা যায় জমিতে জৈব পদার্থ যুক্ত করা উচিত।

৭.৮. রোগ দমন

সবজি ফসল সংখ্যায় অনেক এবং প্রতিটি ফসলের বহু রোগ রয়েছে। নিচে রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণ বর্ণনা করা হলো।

৭.৮.১. হলুদায়ন (Yellowing) : ক্লোরোফিল নষ্ট হওয়ার কারণে উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গ হলুদ বর্ণ ধারণ করে। হলুদ হওয়ার ধরন ও মাত্রা দেখে বেশির ভাগ রোগই চেনা যায়।

৬.৮.২. দাগ : (Spot/Lesion) দাগও একাধিক রোগের প্রধান লক্ষণ। দাগের আকার যেমন– পাতা ধসা রোগ ও বর্ণ দেখে পাতায় দাগরোগ সনাক্ত করতে হয়।

৬.৮.৩. পচন : (Rottening) উদ্ভিদের কলা বিয়োজিত হওয়ার নাম পচন আক্রমণকারী জীবাণুর ধরন এবং আক্রান্ত অঙ্গের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রোগ সনাক্ত করা যায়।

৬.৮.৪. নেতিয়ে পড়া : (Wilting) পানির অভাবে পাতা বা জীবাণুর আক্রমণে পাতা ঝুলে পড়ে। রোগের আক্রমণে শিকড় ও কাণ্ডের পানি সঞ্চালন নালীসমূহ বন্ধ হলে পাতা নেতিয়ে পড়ে।

৬.৮.৫. আগামরা : (Dieback) গাছের অগ্রভাগ থেকে গোড়ার দিকে ক্রমান্বয়ে ডালপালা মারা যেতে শুরু করে। যেমন– মরিচের আগামরা রোগ।

৬.৮.৬. পাতা কুঁকড়ানো : (Leaf curling) পাতা কুঁকড়ে যায়। কুঁকড়ানোর ধরন দেখে রোগ নির্ণয় করা যায়।

৬.৮.৭. খর্বায়ন : (Dwarfness) উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ ছোট হয়ে যায়।

৬.৮.৮. মরচে পড়া : (Rusting) নানা আকারের মরচে দাগ লক্ষণ দেখা যায়।

জীবাণু এবং রোগ বিস্তারের ধরন অনুযায়ী রোগের দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। ফসল পর্যায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের চাষ এবং জমি পরিচ্ছন্ন রাখা রোগ দমনের একটি উত্তম ব্যবস্থা।

ছত্রাক ও নেমাটোডজনিত রোগ দমনের জন্য ছত্রাকনাশক ও নেমাটিসাইড ব্যবহার করতে হয়। বীজের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে এমন রোগ দমন করার জন্য বীজ শোধন করতে হয়।

৬.৯. ফসল কর্তন : বীজ ফসলের সর্বোচ্চ ফলন ও মান পেতে হলে উপযুক্ত সময়ে ফসল কাটতে হয়। বীজ পুরোপুরি পরিপক্ব হওয়ার পর বৃষ্টিতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না, তখনই ফসল কাটার সময়।

৬.১০. বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ

বীজ ফসল কাটার পর বাছাই, শুকানো, ঝড়াই, আকার অনুসারে গ্রেডিং, শোধন ও প্যাকিং করাকে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে। মাঠ থেকে ফসল কেটে আনার সময় অন্য ফসলের বীজ মিশে যেতে পারে। এ সময় বীজের আর্দ্রতা ও বেশি থাকতে পারে। তাই বীজ সংরক্ষণ করার আগে অবাঞ্ছিত দ্রব্য বেছে ফেলতে হয়। আর্দ্রতা কমানোর জন্যে বীজ ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হয়।

৬.১০.১. বীজ শুকানো : ফসল কাটা ও মাড়াইয়ের সময় সব বীজে আর্দ্রতা বেশি থাকে। কাজেই সজীবতা ও জীবনীশক্তি রক্ষার জন্য বীজকে শুকিয়ে আর্দ্রতা কমিয়ে আনা জরুরি।

বীজকে দু' ভাবে শুকানো যেতে পারে।

ক. প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বা স্বাভাবিক বাতাসে।

খ. উত্তপ্ত বাতাস দিয়ে

যান্ত্রিক উপায়ে বাতাস ঢুকিয়ে বীজ শুকানো ব্যবস্থা শুধু সরকারি খামারে আছে আমাদের দেশে প্রধানত রোদে বীজ শুকানোর প্রচলনই বেশি। মাড়াইয়ের পরপরই

বীজ শুকানো উচিত। বীজ সঠিকভাবে শুকানো হলে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং বীজ পরিষ্কার থাকে বলে সংরক্ষণ ব্যয় ও শ্রম কম লাগে।

৩.১০.২. **বীজ সংরক্ষণ** : বীজ ভালোভাবে গুদামজাত করে সংরক্ষণ না করতে পারলে এর সজীবতা ও সতেজতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কাজেই বীজের উপযোগিতা ঠিক রাখার জন্য বীজ সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন

৩.১০.৩. **বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তাপ** : গুদাম ঘরের বায়ুতে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি থাকলে তা গুদাম ঘরে রাখা বীজের আর্দ্রতাও বাড়িয়ে দিতে পারে। কারণ বীজ বায়ু হতে আর্দ্রতা শোষণ করতে পারে। অবশ্য পুরু ও শক্ত বীজত্বক সম্পন্ন বীজের ক্ষেত্রে এর প্রভাব কম হয়। গুদামের তাপমাত্রাও নানাভাবে বীজের সজীবতাকে প্রভাবিত করে। আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বেশি হলে সেখানে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়াজাতীয় রোগজীবাণু বেশি জন্মায়। আর্দ্রতা শতকরা ৬০-৭৫ ভাগ হলে বীজ বেশ ভালো থাকে। অধিক আর্দ্রতা সম্পন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক বীজ, যেমন- গোল আলু, শাখা কলম বা গুটি কলম ৪০° সেঃ এর কম তাপে সংরক্ষণ করা যাবে।

৩.১০.৪. **বীজ সংরক্ষণের নীতিমালা**

ক. সংরক্ষণের আগে বীজ শুকিয়ে ও ছায়ায় ঠাণ্ডা করে নিতে হয়।
খ. বীজ রাখার পরিবেশ শুষ্ক ও ঠাণ্ডা হতে হয়
গ. গুদাম বা বীজ রাখার জায়গা রোগ ও পোকার আক্রমণের প্রতিরোধক হতে হয়
ঘ. গুদাম ঘরে বীজ রাখার স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা থাকতে হয়।
ঙ. উন্নতমানের বীজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করতে হয়

৩.১১. **বীজ পরিবহণ**

বীজ পরিবহণের সময় প্রতিকূল পরিবেশে সজীবতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই বীজ পাত্র বা বস্তা অবশ্যই বায়ুবিরোধী হতে হয়

আমাদের দেশে প্রধানত ট্রাক, ট্রেন, নৌকা, লঞ্চ ইত্যাদির মাধ্যমে বীজ পরিবহণ করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

৩.১২. **সবজি চাষের সংক্ষিপ্ত তথ্য**

ফসল	বীজের ধরন	বীজের হার/হেক্টর	বপন/রোপণের সময়
আলু	কন্দ	৪৫০-৬০০ কেজি	অক্টোবর-ডিসেম্বর
অ্যাসপারাগাস	চারা	২২,০০০ টি	মার্চ-এপ্রিল
আর্টিচোক	মূল	৪৪০০	মার্চ-এপ্রিল
উচ্ছে	বীজ	১-১.৫ কেজি	ডিসেম্বর-জানুয়ারি; মার্চ-মে
ওলকচু	মুখী	১০,০০০	মার্চ-জুন

করলা	বীজ	৭০০-৯০০ গ্রাম	মার্চ-মে ; ডিসে-জানু
কলমি শাক	বীজ	১০ কেজি	জুন-জুলাই ; সবসময়
কচু	মুখী	১৫০০	মার্চ-মে
কাকরল	মোথা	৭৯ কেজি	মার্চ-মধ্য জুন
কাঁকড়	বীজ	২৯০-৫৮০ গ্রাম	ডিসেম্বর-মার্চ
গাজর	বীজ	৬.৫-১১ কেজি	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর
চালকুমড়া	বীজ	৩৫০-৭০০ কেজি	এপ্রিল-আগস্ট
চিচিঙ্গা	বীজ	১.৭-২.০ কেজি	মার্চ-জুলাই
চীনা বাঁধাকপি	বীজ	৩৫০-৭০০ কেজি	অক্টোবর-ডিসেম্বর
চুকুর	চারা	৬৫০০-৭৫০০	মার্চ-জুন
ঝিঙা	বীজ	৭-১.১৫ কেজি	ফেব্রুয়ারি-জুন
টমেটো	বীজ	১৪০-২৮০ গ্রাম	অক্টোবর-ডিসেম্বর
ডাঁটা	বীজ	৩৫০-৪৫০ গ্রাম	ফেব্রুয়ারি-জুলাই
ঢেঁড়স	বীজ	৩ ৪ কেজি	ফেব্রুয়ারি-আগস্ট; সারাবছর
ধুন্দল	বীজ	১১০-১২০ কেজি	মার্চ জুলাই
পটল	লতা	২১-২৪ হাজার	অক্টোবর-জানুয়ারি
পঞ্চমুখী কচু	মুখী	৩৫৮১৯	ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল
পাটশাক	বীজ	১০-১২ কেজি	মার্চ-জুলাই
পালংশাক	বীজ	১০-১৫ কেজি	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর
পুঁইশাক	বীজ	৭-১০ কেজি	মার্চ-জুলাই
পেঁয়াজ	বীজ	৪.৫ কেজি	অক্টোবর-ডিসেম্বর
ফুলকপি	বীজ	৩৫০-৭০০ গ্রাম	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর
বরবটি	বীজ	১২-১৫ কেজি	জুন-আগস্ট
ব্রোকোলি	বীজ	৩৫০-৭০০ গ্রাম	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর
বাঁধাকপি	বীজ	৩৫০-৭০০ গ্রাম	অক্টোবর-ডিসেম্বর
ব্রাসেলস স্প্রাউট	বীজ	২৮০-৪২০ গ্রাম	নভেম্বর-ডিসেম্বর
বেগুন	বীজ	১৫০-৩০০ গ্রাম	সেপ্টেম্বর-মার্চ
মরিচ	বীজ	৩০০-৪৫০ গ্রাম	মার্চ-এপ্রিল, আগস্ট-নভেম্বর
মটর	বীজ	৩৫-৫০ কেজি	অক্টোবর-ডিসেম্বর
মিষ্টি আলু	লতা	১১-১২ হাজার	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর
মিষ্টি কুমড়া	বীজ	১.১-১.৭ কেজি	মার্চ-জুলাই
মুখী কচু	মুখী	৭১৬৩০	মার্চ-জুন
মুলা	বীজ	৬-১০ কেজি	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর

৬.১২.১. সবজির সাধারণ রোপণ দূরত্ব

সবজি	রোপণ দূরত্ব (সেন্টিমিটার)		মন্তব্য
	সারি	গাছ	
আলু, মুখীকচু	২৫-৪০	১৫-২৫	দেশী জাতে কম
ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকোলি	৩০-৪০	২৫-৩৫	বড় জাতে বেশি
উচ্ছে, ওলকচু, পটল	৮০-১০০	৬০-৭০	উর্বর মাটিতে বেশি
কলমিশাক, ওলকপি, মরিচ	৩০-৪০	১৫-২০	নিয়মিত কাটতে হয়।
কচু, পুঁইশাক, ঢেঁড়স, টমেটো, বেগুন	৭০-৯০	৪০-৫০	প্রধানত পানি কচু
গাজর, লেটুস, পালংশাক, মূলা	৩০-৪০	১৫-২৫	সবজি হিসেবে
চালকুমড়া, ঝিঙা, মিষ্টিকুমড়া, চিচিঙ্গা, শসা, ধুন্দুল	১৫০-২০০	১৫০-২০০	–
ডাটা, লালশাক, পাটশাক, পেঁয়াজ	৩০-৪০	৮-১৫	–
মিশ্র ফসল	৪০-৬০%	৪০-৬০%	–
আন্তঃ ফসল	একক/সারি	৪০-৬০%	–

৬.১৩. সবজি চাষের ফসলবিন্যাস

বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিশ্র চাষ ও আন্তঃফসল নীতিতে সবজি চাষ করা হয়। এখানে সবজির চাষ নীতির উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি ফসলবিন্যাস উল্লেখ করা হলো।

ক. আলু + রসুন + পটল- সবুজ সার ফসল বিন্যাস

(১) এলাকা ও পরিবেশ : বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জন্য উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তি। এই ফসল ধারা জমির যথোপযুক্ততা নিশ্চিত হয়। জমির উর্বরতা বাড়ে এবং বেশি লাভ হয়।

(২) মৃত্তিকা : উঁচু ও মাঝারি উঁচু দোঁআশ মাটি।

(৩) আলুর জাত : সকল উফশী জাত ব্যবহার করা যায়; তবে কার্ডিনাল ও কুফরী সিন্দুরী ভালো ফলন দেয়।

(৪) রসুন : স্থানীয় জাত।

(৫) পটল : দেশী ডোরা কাটা জাত

(৬) সবুজ সার : মাশকলাই স্থানীয় জাত।

(৭) জমি তৈরি : ৪-৫টি চাষ মই দিয়ে সবুজ সার মাটির সাথে মিশিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হয়।

(৮) সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া (১)	২৭৫-৩০০
টিএসপি	১৪০-১৫০
এমপি	১৫০-২০০
গোবর	৩-৫ টন/হেক্টর

উল্লেখ্য, অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সবটুকু সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া দু' ভাগ করে আলু লাগানোর ৩০ দিন ও ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

(৯) বীজ হার/হেক্টর

মাশকলাই : ৪০ কেজি, আলু বীজ ১৩৫০ কেজি, রসুন- ১১০ কেজি,
পটল লতার আঁটি : ১৬০০ (৫৫ হাজার লতা) (৫ পুরুষ গাছ থাকতে হয়।
বীজ বপন সময় : নভেম্বর-ডিসেম্বর :
রোপণ দূরত্ব : আলুর সারি থেকে সারি- আলু থেকে আলু ৩০ সেন্টিমিটার।
রসুন : সারি থেকে সারি গাছ থেকে গাছ ১০ সেন্টিমিটার।

(১০) ফসল কাটার সময় :

আলু-বীজ রোপণের ১০০ দিনের মধ্যে
রসুন-বীজ রোপণের ১৩০ দিনের মধ্যে
পটল-বীজ রোপণের ২৬০ দিন পর্যন্ত

(১১) ফলন : আলু ১০০ টন/হেক্টর
রসুন-৬০০ কেজি/হেক্টর
পটল- ৭ টন/হেক্টর।

খ. মাশকলাই (সবুজ সার) আলু+রসুন+পটল

দেশের উত্তরাঞ্চলে এই উন্নত ফসল ধারা ভালো ফলন হয়। প্রচলিত পাট রোপা আমন পতিত/আলু ফসল ধারার পরিবর্তে নিম্নেবর্ণিত ফসল ধারার প্রবর্তন করে প্রায় দ্বিগুণ ফসল উৎপাদন করা সম্ভব

(১) প্রযুক্তি সারমর্ম

ফসল বিন্যাস	মাশকলাই (সবুজ সার)	আলু+রসুন+পটল
জাত	স্থানীয়	কার্ডিনাল+স্থানীয়+স্থানীয়
বপন বা রোপণের সময়	(আগস্ট ৩য় ও ৪র্থ) সপ্তাহ	নভেম্বরের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ

বীজের হার (কেজি/হেক্টর)	৩০	১২০০-১৫০০+১১০+৫০০
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর) এবং প্রয়োগ পদ্ধতি		ইউরিয়া ৩০০, টিএসপি ১৪৫ ও এমপি ৩০০ টিএসপি, এমপি এবং ইউরিয়া সারের অর্ধেক শেষ চাষের সময় এবং বাকি ইউরিয়া রোপণের ৩০ এবং ৫০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হয়।
ফসল সংগ্রহ	বপনের ৪০-৪৫ দিন পর	
ফলন (টন/হেক্টর)	১০-১৫ (সবুজ সার)	২০.০+ -.৬০+৫.০

গ. উফশী মাঠ ফসল

(১) আলু-বোরো ধান : রোপা আমন ফসল বিন্যাস
(২) এলাকা ও পরিবেশ : সমতল বরেন্দ্র অঞ্চল। বগুড়া, জয়পুরহাট, নাটোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলা।
(৩) বৃষ্টিপাত : ২০০০ মিলিমিটার
(৪) শীত : বিলম্বিত ও বেশি।
(৫) মৃত্তিকা : এটেল দোআঁশ অম্লীয়।
রোপা আমন ও বোরো ধান চাষ : স্বাভাবিক পদ্ধতি (উফশী)
(৬) আলু চাষ : বীজ রোপন সময়– নভেম্বর।
(৭) জাত : উচ্চ ফলনশীল কার্ডিনাল জাত।
(৮) বীজের হার : ১৮০০ কেজি (সম্পূর্ণ আলু)
(৯) জমি তৈরি : ৫-৬টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়
(১০) সার প্রয়োগ :

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	৩০০-৩২০ কেজি
টিএসপি	১৭০-২০০ কেজি
এমপি	১৫০-২০০ কেজি
গোবর	৭-১০ টন

টীকা: অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া আলু রোপণের ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

(১০) পরিচর্যা : স্বাভাবিক পরিচর্যা সম্পাদন করতে হয়।
(১১) ফসল কাটা : বীজ রোপণের ৯০ দিন পর।
(১২) ফলন : ২৫ টন/হেক্টর।

ঘ. **দীর্ঘমেয়াদি ফসলের সাথে সবজি আলু + আখ আন্তঃফসল**

(১) আখের জাত : ঈশ্বরদী-১৬, ঈশ্বরদী-১৮, ঈশ্বরদী-১৯, লতারিজন-সি।
(২) আলু জাত : কার্ডিনাল, কুফরী, সিন্দুরী, হীরা, পেট্রনিস।
(৩) আখের বীজ হার : পলিচারা-১৬,০০০-১৮০০০ বি, কাণ্ড ২৭,০০০-২৮,০০০টি হেক্টর।
(৪) আলুর বীজ হার : ১০০০-১৪০০ কেজি/হেক্টর।
(৫) আখ রোপণের সময় : অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বর।
(৬) আলু রোপণের সময় : অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর।
(৭) আখের বীজ শোধন : প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম বেভিস্টিন মিশিয়ে মিশ্রণ দিয়ে বীজ শোধন।
(৮) রোপণ পদ্ধতি : আখের সারির দূরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার।
(৯) নালার গভীরতা : ১৫ সেন্টিমিটার।
(১০) গাছের দূরত্ব : পলি চারা ৫০ সেন্টিমিটার।
(১১) খণ্ড : মাথায় মাথায়।
(১২) আলুর সারি : আখের জোড় সারির মাঝখানে ৬০ সেন্টিমিটার দূরত্বে ২ সারি।
আলু গাছের দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার।

(১৩) আলু+আখ আন্তঃফসলে সার প্রয়োগ (সারের মিশ্রণ কেজি/হেক্টর)।

সারের নাম	আখ (কেজি/হেক্টর)	আলু (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	৩৪০-৩৭০	৭০-৮০
টিএসপি	২৫০-২৭৫	৫০-৬০
এমপি	২৫০-২৭৫	৫০-৬০
জিপসাম	১৮-২০	১০-১২
জিঙ্ক সালফেট	৮-১০	

(১৩.১) সার প্রয়োগ পদ্ধতি : আখের জন্য এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ও এমপিসহ সব সার জমি প্রস্তুতের সময় নালায় প্রয়োগ করতে হয়। এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া বীজ রোপণের ১২০ দিন পর বাকি এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া মে-জুন মাসে বৃষ্টিপাতের পর প্রয়োগ করতে হয়।

আলুর জন্য গোবর ও খৈল আখের ২ সারির মাঝখানে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। আলুর নালায় অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সার প্রয়োগ করতে

হয়। বাকি ইউরিয়া বীজ রোপণের ৪০দিন পর আলুর সারির কিছুটা দূরে দিয়ে পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হয়।

ঘ. রবি ও গ্রীষ্ম ফসল মিষ্টি কুমড়ার সাথে ভুট্টার আন্তঃফসল

চট্টগ্রামের হাটহাজারী এলাকায় এই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি গবেষণায় লক্ষ্য করা গেছে যে, মিষ্টিকুমড়ার সাথে প্রতি মাথায় ২টি করে ভুট্টাগাছ লাগালে কুমড়ার ফলন কমে না বরং হেক্টর প্রতি প্রায় ২০টন কুমড়া এবং ৭৫-১.০০ টন ভুট্টা (দানা) ছাড়াও যথেষ্ট পরিমাণ গো-খাদ্য ও জ্বালানি (প্রায় ১.৫ টন) পাওয়া যায়। এ সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ করা হলো।

বিষয়	বিবরণ
ফসল	মিষ্টি কুমড়া-ভুট্টা
জাত	স্থানীয়+খই ভুট্টা
জমি ও মাটি	উঁচু বা মাঝারি উঁচু দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ মাটি।
বপন সময়	অগ্রহায়ণের প্রথম থেকে পৌষের মাঝামাঝি
বপন/রোপণের দূরত্ব	মিষ্টিকুমড়া : ২ মিটার দূরত্বে ৫০-৬০ সেন্টিমিটার ব্যাসের মাদা তৈরি করতে হয়।
বীজের হার	ভুট্টা : প্রতি মাথায় চার প্রান্তে ভুট্টার বীজ লাগাতে হয়। মিষ্টি কুমড়া : হেক্টর প্রতি ২৫০০টি মাদা, প্রতি মাদায় তিন/চারটি চারা।
সার প্রয়োগ	মাদা তৈরির সময় প্রতি মাদায় ১ কেজি গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ৬০ গ্রাম এমপি, ১০০ গ্রাম জিপসাম দিতে হয়। এছাড়া ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ভুট্টার চারা গজানোর ২০ এবং ৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হয়।
অন্যান্য পরিচর্যা	প্রথমবার ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের আগে প্রতি মাদায় ৩টি সবল মিষ্টিকুমড়া ও ৩টি ভুট্টার চারা রেখে বাকি গাছ উঠিয়ে ফেলতে হয়। উপরি প্রয়োগের পূর্বে ২টি ভুট্টাগাছ রাখতে হয়।
ফসল সংগ্রহের সময়	চৈত্রের শেষ সপ্তাহ থেকে ১ম সপ্তাহ

বিশেষ উপকারিতা : চৈত্র মাসে ভুট্টা গাছ বা মোচা সংগ্রহের পর ভুট্টা গাছ দিয়ে মিষ্টি কুমড়ার উপর আবরণ দিলে সেটি শিলাবৃষ্টির আঘাত থেকে তা রক্ষা পায়।

সপ্তম অধ্যায়

বসত বাগানে সবজি চাষ

৭.০. সবজি চাষ

গ্রামবহুল বাংলাদেশের অধিকাংশ বাড়িতে অল্প পরিমাণে হলেও পতিত জায়গা পড়ে থাকে যেখানে সবজিসহ নানা ধরনের ফসল উদ্ভিদ চাষ করে বেশ লাভবান হওয়া যায়। বসত বাগানে সবজি চাষের বিভিন্ন মডেল সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

৭.১. বসত বাগানে সবজি চাষ (কালিকাপুর মডেল)

ঈশ্বরদী কালিকাপুরে অবস্থিত ফার্মিং সিস্টেম গবেষণা এলাকায় ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত গবেষণা করে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই মডেল অনুসরণ করে বাড়ির আঙ্গিনায় ছোট আকারের বাগান করে পরিবারের সবজি চাহিদা পূরণ করা যায়। বসত বাড়ির আঙ্গিনায় ৬ মিটার × ৬ মিটার পরিমাপের বাগান তৈরি করতে হয়। সারাদিন রোদ পড়ে এমন স্থান বাগানের জন্য বেছে নিতে হয়। নির্বাচিত জমিতে ৫ মিটার লম্বা ও ৮০ সেন্টিমিটার চওড়া ৫টি বীজতলা তৈরি করতে হয়। পাশাপাশি দুই বীজতলার মাঝে ২৫ সেন্টিমিটার নালা তৈরি করতে হয় প্রত্যেক বীজতলার জন্য নির্ধারিত সবজি বিন্যাস অনুসরণ করতে হয়।

৭.১.১. প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা : প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত সবজি বিন্যাসগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করে বাগান থেকে সারা বছর সবজি পাওয়া যায়। প্রত্যেক ফসলে প্রয়োজনমতো সার এবং সেচ দিতে হয়। গৃহপালিত পশু-পাখির আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচানোর জন্য চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। এ ধরনের একটি বাগান থেকে ৫-৬ জন লোকের সারা বছরের সবজি চাহিদা মেটানো সম্ভব।

৭.২. বসত বাগানে সবজি চাষ (লেবুখালী মডেল)

পটুয়াখালী জেলার লেবুখালীতে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা করে এই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। পটুয়াখালীতে অধিকাংশ সময় জমি জোয়ারের পানিতে ডুবে থাকে বলে সবজি চাষ করা যায় না। তাই পারিবারিক সবজির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। নিচে বর্ণিত সবজি বিন্যাস অনুসরণ করে বছরে প্রায় ২৮০ কেজি সবজি উৎপাদন করা সম্ভব। এজন্য বসত বাড়ির রোদযুক্ত স্থানে ৮ মিটার লম্বা ও ১.৫ মিটার চওড়া পাঁচটি বীজতলা তৈরি করতে হয়।

এ মডেলে সবজি বিন্যাস নিম্নলিখিতভাবে করা যায়।

সবজি বিন্যাস	খরিফ	রবি
প্রথম বেড	ঢেঁড়স+ডাঁটা	পালংশাক/টমেটো
দ্বিতীয় বেড	ডাঁটা	আলু
তৃতীয় বেড	গিমা কলমি	লালশাক/বেগুন
চতুর্থ বেড	পুঁইশাক+বরবটি	লালশাক/মূলা
পঞ্চম বেড	পুঁইশাক+লালশাক	পালংশাক/বাঁধাকপি

৭.৩. বসত বাগানে সবজি চাষ (কলাপাড়া মডেল)

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া থানায় ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা করে এই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। কলাপাড়া লবণাক্ত এলাকা। এখানে রোপা আমন ধান ছাড়া অন্য ফসলের চাষ কম হয়। তাই সবজির আবাদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাগানে ৫ মিটার লম্বা এবং ৫ মিটার চওড়া পাঁচটি বীজতলা তৈরি করতে হয়। পাঁচটি বীজতলায় নিচে বর্ণিত সবজি বিন্যাস অনুসরণ করে বছরে প্রায় ১৬৫ কেজি সবজি সংগ্রহ করা যাবে।

সবজি বিন্যাস	খরিফ	রবি
প্রথম বীজতলা	লালশাক+করলা	পালংশাক/টমেটো
দ্বিতীয় বীজতলা	পুঁইশাক	লালশাক/বেগুন
তৃতীয় বীজতলা	লালশাক+গিমা কলমি	পালংশাক/মূলা
চতুর্থ বীজতলা	ঢেঁড়স	বাঁধাকপি
পঞ্চম বীজতলা	ডাঁটা	মূলা

৭.৪. সর্জান পদ্ধতিতে সবজি চাষ

পটুয়াখালী জেলার লেবুখালী এলাকায় ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা করে এই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। সর্জান হলো ফসল আবাদের একটি বিশেষ পদ্ধতি। যে সব জমি জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় বা বছরের বেশিরভাগ সময় পানি জমে থাকে এমন জমিতে সর্জান পদ্ধতিতে শাক-সবজি ও ফলের চাষ করা যায়। এক্ষেত্রে মাটি কেটে উঁচু বেড তৈরি করতে হয়। পাশাপাশি দুটি বীজতলার মাঝের মাটি কেটে উঁচু বীজতলা তৈরি করে ফসল চাষ করাই সর্জান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। উঁচু বীজতলায় শাক-সবজি এবং ফলের চাষ করা যায় বলে এ পদ্ধতি খুবই লাভজনক।

৭.৪.১. সর্জান পদ্ধতিতে সবজি চাষের জন্য বীজতলা তৈরি : সর্জান বীজতলা তৈরির জন্য উপযুক্ত সময় হলো জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস। এই সময় জমি শুকনা থাকে। প্রায় ২৮ মিটার লম্বা এবং ১১ মিটার চওড়া একখণ্ড জমিতে ১০ মিটার × ২ মিটার সাইজের ৫টি বীজতলা তৈরি করতে হয়। তবে বীজতলার উচ্চতা কমপক্ষে ১

মিটার হয়। প্রথমে নকশা করে নিতে হয়। দু'টি বীজতলার মাঝের মাটি খুঁড়ে দু'পাশের বীজতলা তৈরি করতে হয়। শুরুতে উপরের স্তর থেকে ৮-১০ সেন্টিমিটার কেটে একপাশে রাখতে হয় এবং বীজতলা তৈরি শেষ হলে তা বীজতলার উপর বিছিয়ে দিতে হয়। এ ধরনের ৫টি বীজতলা তৈরি করতে হয়।

৭.৫. মিনি পুকুরভিত্তিক সবজি, ফল ও সমন্বিত চাষ মডেল

পটুয়াখালী জেলার লেবুখালী এলাকায় ১৯৯০ সালে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়। একটি ছোট পুকুর (১২ মিটার লম্বা, ১০ মিটার চওড়া এবং ১.৬ মিটার গভীর) কেটে তার চারিধারের ১ মিটার উঁচু এবং ৩ মিটার চওড়া করে তৈরি করতে হয়। এই উঁচু পাড়গুলোতে সবজি ও ফল-মূলের এবং পুকুরের মাছের চাষ করতে হয়। এ ধরনের একটা পুকুর কাটতে খরচ হয় প্রায় ২৬৫০ টাকা। প্রথম বছরেই ফসল ও মাছ থেকে নিট আয় (পুকুর কাটা খরচ বাদ দিয়ে) হয় প্রায় ৪০০০ টাকা। বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার সবজি চাহিদা পূরণে এই প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৭.৫.১. উৎপাদন প্রযুক্তি : ফসল বিন্যাসের বিবরণ

ফসল আবাদ এলাকা	খরিফ		রবি	
উত্তরপাড়া : ভিতরের কিনারা	বীজতলা	কলা	পেঁপে	লালশাক/ বেগুন লাউ
দক্ষিণ পাড় :		(পশ্চিমার্ধে চিচিংগা)	পূর্বার্ধে	লালশাক/ বাঁধাকপি, শিম, করলা
পূর্ব পাড় : ভিতরের কিনারা	বীজ-তল	শীতকালীন সবজির চারা ঢেঁড়স শশা চিচিঙ্গা		মূলা-বেগুন করলা
পশ্চিম পাড়	বীজ-তল	পুঁইশাক ঝিঙা চিচিঙ্গা		লালশাক/ ফুলকপি শিম করলা

৭.৬. বাঁধাকপির আন্তঃফসল হিসেবে টমেটো চাষ

বাঁধাকপির দুই সারির মাঝে অনায়াসে এক সারি টমেটো লাগিয়ে বাড়তি উৎপাদন এবং অধিক মুনাফা করা যেতে পারে।

প্রযুক্তি এলাকা	শাক-সবজি উৎপাদন এলাকা (নরসিংদী, টাংগাইল, বগুড়া, যশোর ইত্যাদি।
জাত বাঁধাকপি/ টমেটো	উঁচু, মাঝারি উঁচু জমি বেলে দোয়াশ মাটি এই প্রযুক্তির জন্য উত্তম। মাটিতে 'জো' থাকা অবস্থায় জমি ও মাটির প্রকারভেদে ৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ দিতে হয়। চাষের পর মই দিয়ে সমান করে নিতে হয়।
বপনের সময়	মধ্য কার্তিক থেকে অগ্রহায়ন মাসের (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য নভেম্বর)

বপন পদ্ধতি	বাঁধাকপির সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪৫ সেন্টিমিটার। বাধাকপির দুই সারির মাঝে এক সারি টমেটো ৪৫ সেন্টিমিটার (গাছ থেকে গাছের দূরত্ব) দূরত্বে লাগাতে হয় (চিত্র ৬.১)
সারের পরিমাণ কেজি/হেক্টর	ইউরিয়া : ২৪০-২৬০, টি এস পি : ১৩০-১৩৬, এম পি : ১৪৫-১৫৫, এবং শুধু গোবর : ১২-১৮, টন/হেক্টর
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	শতকরা ৫০ ভাগ পঁচা গোবর বাঁধাকপি ও টমেটোর মাদায় ব্যবহার করতে হয়। বাকি পঁচা গোবর ও টি এস পি সার চারা লাগানোর সময় জমিতে ছিটিয়ে নিতে হয়। ইউরিয়া এবং মিউরেট অব পটাশ লাগানোর ১৫-২০ দিন ও ৩০-৩৫ দিন পর গাছের চারিদিকে দিতে হয়।
সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা	সাধারণত উপরি সার প্রয়োগের সময় জমিতে রস না থাকলে সেচ দিতে হয়। সেচ দেওয়ার পর 'জো' আসলে নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হয়।
রোগ ও পোকা	এই সাথী ফসলে ক্ষতিকর কোনো পোকামাকড় ও রোগের উপদ্রব হয় না। টমেটো ভাইরাস রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হয়।
ফসল কাটার সময় বাঁধাকপি	মাঘ মাস (মধ্য জানুয়ারি থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)
টমেটো	মাঘ মাস (মধ্য জানুয়ারি থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)
ফলন বাঁধাকপি	৬০-৭০ টন/হেক্টর
টমেটো	১০-১৫ টন/হেক্টর

৭.৭. আলুর আন্তঃফসল হিসেবে শাক-সবজি চাষ

আলুর দুই সারির মাঝে অনায়াসে শাক-সবজি করা যেতে পারে যেমন– লালশাক, পালংশাক, ওলকপি ইত্যাদি।

প্রযুক্তি এলাকা	মুন্সীগঞ্জ, বগুড়া, পঞ্চগড় ও আলু উৎপাদন এলাকা
জাত আলু, পেঁয়াজ, লালশাক, ওলকপি, পালংশাক	কার্ডিনাল/ডায়মন্ড ফরিদপুর/স্থানীয় স্থানীয় জাত
জমি নির্বাচন ও তৈরি	মাঝারি উঁচু ও মাঝারি বেলে দোআশ মাটি এই প্রযুক্তির জন্য উপযোগী। মাটিতে রস থাকা অবস্থায় ৪-৫টি আড়আড়ি চাষ ও মই দিয়ে সমান করে নিতে হয়।

বপন/রোপণ সময়	কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়ন প্রথম সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহ)
বপন পদ্ধতি	আলুর সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার হতে হয়। আলু বীজ বপনের পর কিছু পরিমাণে মাটি তুলে দিতে হয়। এরপর দুই সারি লালশাক/পালংশাক ৩০ সেন্টিমিটার দূরত্বে বপন করতে হয় (চিত্র ৬.২) অথবা আলুর সারির মাঝে এ সারি ওলকপি একই দিনে লাগানো যায়
সারের পরিমাণ	ইউরিয়া (কেজি/হেক্টর) — আলু ২৬০, ওল কপি ৮৭ টি এস পি (কেজি/হেক্টর) — আলু ২২০, ওল কপি ৬০ এম পি (কেজি/হেক্টর) — আলু ২২০, ওল কপি ৫০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	শেষ চাষের সময় $\frac{১}{৩}$ অংশ ইউরিয়া ও সমুদয় টি এস পি, এম পি জমির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকি ইউরিয়া সার দুভাগ করে এক ভাগ বীজ গজানোর ২৫ দিন ও অপরভাগ ৪৫-৫৫ দিন পর (লালশাক/পালংশাক/ওলকপি কর্তন করার পর) আলুর সারির পাশে প্রয়োগ করতে হয়। ওলকপির অতিরিক্ত সার পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হয়।
অন্যান্য পরিচর্যা	জমিতে রস না থাকলে উপরি সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হয়। এছাড়া ওলকপি কর্তন করার পর উপরি সার প্রয়োগ করে সেচ দিতে হয়। 'জো' আসলেই মাটি আলগা করে কোদাল দিয়ে আলুর গোড়ার মাটি তুলে দিতে হয়।
রোগ ও পোকা মাকড় দমন	ডায়থেনএম-৪৫ অথবা রোডোমিল ছত্রাকনাশক আলুতে অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়।
ফসল আলু কাটার সময় লালশাক, পালংশাক, ওলকপি	ফাল্গুনের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ (ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ), মধ্য পৌষ মাস (জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ)।

বসতভিটায় চাষযোগ্য নানা প্রকারের সবজির মধ্যে গোলআলু, বাঁধাকপি, টমেটো প্রভৃতি ফসল উৎপাদনে একক ফসল চাষের পাশাপাশি আন্তঃফসল চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাঁধাকপি ও গোলআলুর চাষে আন্তঃফসল হিসেবে যেমন টমেটো ও শাক-সবজি চাষ করা যায়, তেমনি ভুট্টা ও মিষ্টিআলুর সাথে আন্তঃফসল হিসেবে মুলা ও ভুট্টা চাষ করা যায়। এছাড়াও মুখীকচুর সাথে গো-খাদ্য ফসল, ছোলার সাথে ধনে, পাতাজাতীয় সবজির সাথে ভুট্টা, গো-মটর প্রভৃতি ফসল চাষ করা যায়। এ সম্পর্কে বর্ণনা ছকাকারে উপস্থাপন করা হলো।

৭.৮. ভুট্টার আন্তঃফসল হিসেবে মূলা চাষ

আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র হাটহাজারিতে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়।

প্রযুক্তি এলাকা	চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল এবং নরসিংদী
জাত : ভুট্টা ও মূলা	বর্ণালি ও তাসাকিসান
জমি নির্বাচন ও তৈরি	মাঝারি উঁচু বেলে দোঁআশ মাটি এই প্রযুক্তির জন্য উপযোগী। মাটিতে 'জো' আসলে ৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ দিতে হয়। চাষের পর মই দিয়ে জমি সমান করে দিতে হয়

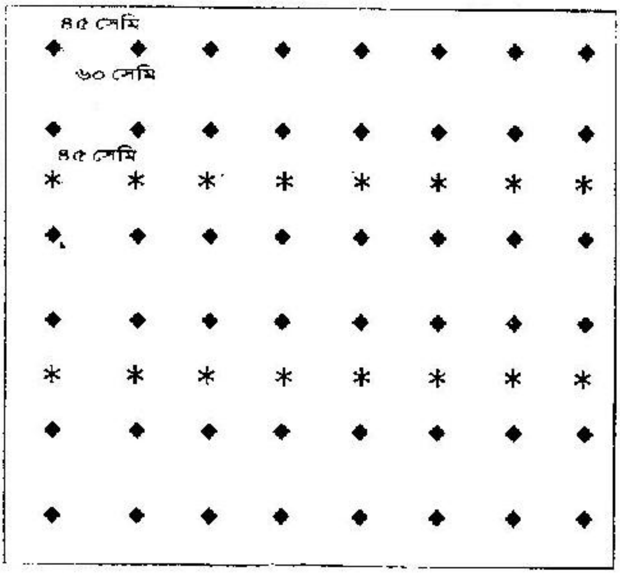

চিত্র ৭.১ : বাধাকপির (◆) আন্তঃফসল টমেটো (✻) বপন পদ্ধতি

বপনের সময়	কার্তিকের শেষ সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়নের প্রথম সপ্তাহ (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্তাহ)
বপন পদ্ধতি	ভুট্টার সারির দূরত্ব ৭৫ সেন্টিমিটার এবং গাছের দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার রাখতে হয়। ভুট্টার স্বাভাবিক সারির মাঝে এক সারি মূলা আবাদ করতে হয়। মূলার গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১৫ সেন্টিমিটার রাখতে হয়। ভুট্টা ও মূলার বীজ একই সাথে বপন করতে হয়। (চিত্র-৬.৩)

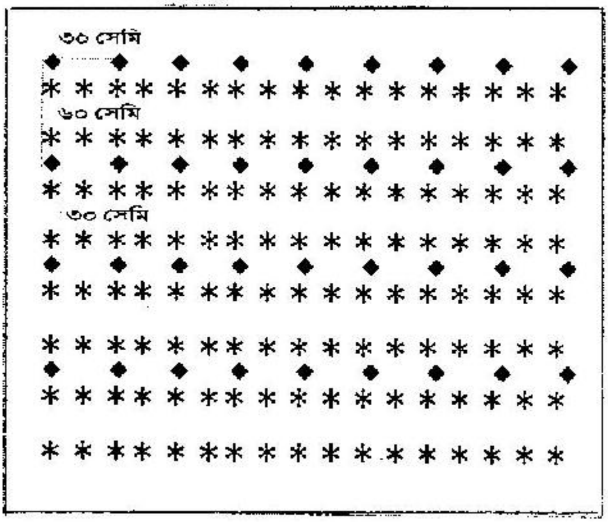

চিত্র ৭.২ : আলুর (◆) সাথে আন্তঃফসল হিসেবে পালংশাক (✱) বপন পদ্ধতি

সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	ইউরিয়া : ৩৪৩-৩৫৩, টি এস পি : ১৩০-১৩৫ এবং এম পি : ৬০-৭০ কেজি/হেক্টর
আগাছা দমন ও অন্যান্য পরিচর্যা	ইউরিয়া সার প্রয়োগের আগে একবার আগাছা পরিষ্কার করতে হয় এবং একটি সুস্থ সবল ভুট্টার গাছ রেখে বাকি গাছ ১৫ দিনের মধ্যে তুলে ফেলতে হয়
সেচ	ইউরিয়া সার প্রয়োগের পর ১ম বার (বীজ বপনের ৩৫ দিন পর) এবং দ্বিতীয় বার ইউরিয়া সার প্রয়োগ ও মূলা কর্তনের পর সেচ প্রয়োগ করতে হয়
রোগ ও পোকা মাকড় দমন	এই আন্তঃফসলে ক্ষতিকর কোনো পোকামাকড় বা রোগের উপদ্রব হতে দেখা যায় না
ভুট্টা কাটার সময়	মধ্য চৈত্র থেকে বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ (এপ্রিল মাস) পৌষ মাস (মধ্য ডিসেম্বর-মধ্য জানুয়ারি) অথবা বপনের ৫৫ দিন পর সংগ্রহ করা যায়।
ফলন : ভুট্টা, মূলা	৬.০-৬.৫ টন/হেক্টর ও ২০-২৫ টন/হেক্টর

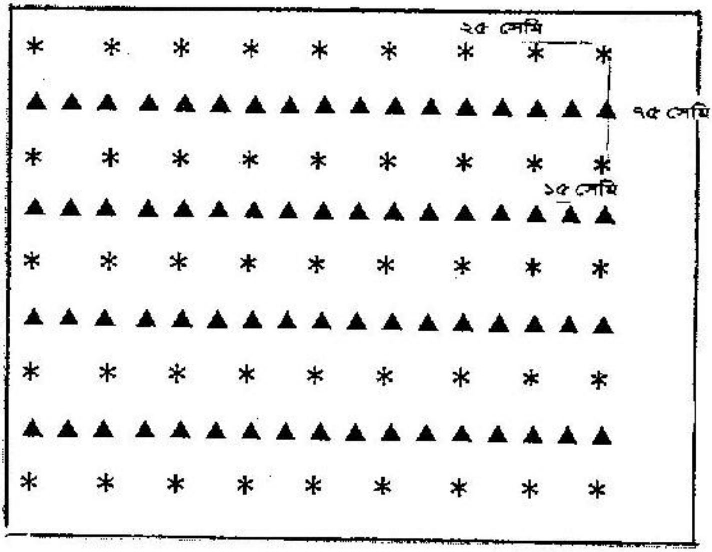

চিত্র ৭.৩ : ভূট্টার (✱) আন্তঃফসল হিসেবে মুলা (▲) চাষ

৭.৯. মিষ্টি আলুর আন্তঃফসল হিসেবে ভুট্টা চাষ

কেন্দ্রীয় গবেষণা খামার, জয়দেবপুর, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারি এবং পাবনা জেলায় ঈশ্বরদী থানার কালিকাপুর খামার পদ্ধতি গবেষণা এলাকায় এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়। এখানে মিষ্টি আলুর স্বাভাবিক ফসলের সাথে ভুট্টা ফসলের শতকরা ২৫ বা ৫০ ভাগ ভুট্টা বিভিন্ন দূরত্বে বপনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

প্রযুক্তি এলাকা	হাটহাজারি, জয়দেবপুর, ঈশ্বরদী ও অন্যান্য মিষ্টি আলু উৎপাদন এলাকা
জাত : মিষ্টিআলু ও ভুট্টা	তৃপ্তি, বর্ণালি ও মোহর
জমি নির্বাচন ও তৈরি	উচু, মাঝারি উচু বেলে দোআঁশ বা দোআশ মাটি এ প্রযুক্তির জন্য উপযোগী।
বপন সময়	মধ্য কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ মাস (নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর)
বীজের হার মিষ্টি আলু ভুট্টা	৫-৬টি লতার খণ্ড/বর্গমিটার, ১০ কেজি/হেক্টর (একক ফসলের শতকরা ২৫ ভাগ) অথবা ২০ কেজি/হেক্টর

বপন পদ্ধতি	মিষ্টি আলুর এক সারি থেকে আর এক সারির দূরত্ব হয় ৬০ সেন্টিমিটার। মিষ্টিআলুর লতা ২৫-৩০ সেন্টিমিটার। মিষ্টি আলুর লতা ২৫-৩০ সেন্টিমিটার খণ্ড করে (আগার খণ্ড ৮ কুড়িসহ) লাগালে ভালো হয়। মিষ্টিআলুর সারির মাঝে ৬০ সেন্টিমিটার দূরত্বে এক সারির (শতকরা ৫০ ভাগ) ভুট্টার বীজ (শতকরা ৫০ ভাগ) বপন করতে হয় (চিত্র ৬.৪) অথবা শতকরা ২৫ ভাগ ভুট্টা ১২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে বপন করতে হয়।
সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	ইউরিয়া : ১২৫-১৩৫, টি এস পি : ১২৫-১৩৫, এম পি : ১৪৫-১৫৫ এবং জিপসাম : ১০০-১২০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	সব টি এস পি, এম পি, জিপসাম ও অর্ধেক ইউরিয়া সার শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। বাকি ইউরিয়া সার সমান দু'ভাগ করে চারা গজানোর ২৫ ও ৪০ দিন পর মিষ্টি আলুর সারির পাশে প্রয়োগ করতে হয়।
সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা	বীজ গজানোর ১৫ দিনের মধ্যে গোছা প্রতি একটি সুস্থ সবল ভুট্টার চারা রেখে বাকিগুলো কেটে ফেলতে হয়। উপরি সার প্রয়োগের সময় জমিতে রস না থাকলে সেচ দিতে হয়। 'জো' আসলে কোদাল দিয়ে মিষ্টি আলুর গোড়ায় মাটি দিতে হয়।

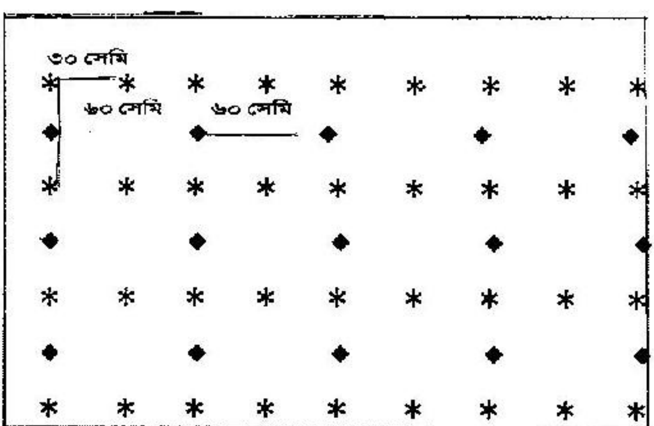

চিত্র ৭.৪ : মিষ্টি আলুর (*) আন্তঃফসল হিসেবে ভুট্টা (♦) চাষ

ফসল মিষ্টি আলু সংগ্রহের সময় ভুট্টা	মধ্য চৈত্র থেকে শেষ সপ্তাহ (মার্চের শেষ থেকে মধ্য এপ্রিল) চৈত্রের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহ (মধ্য মার্চ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ)
ফলন : মিষ্টি আলু ভুট্টা	১৬০০০ কেজি/হেক্টর, ২০০০ কেজি/হেক্টর (শতকরা ৫০ ভাগ) ১৫০০ কেজি/হেক্টর (শতকরা ২৫ ভাগ)

৭.১০. মুখীকচুর সাথে গো-খাদ্য হিসেবে ভুট্টার চাষ

কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ঈশ্বরদী খামারে এই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়। আগাম খরিফ মৌসুমে মুখী কচুর সাথে ভুট্টার চাষাবাদ করা যায়।

প্রযুক্তি এলাকা	ঈশ্বরদী, পাবনা ও মুখীকচু উৎপাদন এলাকা
জাত : মুখী কচু ও ভুট্টা	বিলাসী ও বর্ণালী
জমি নির্বাচন ও তৈরি	উঁচু, মাঝারি উঁচু বেলে দোঁআশ মাটি এই প্রযুক্তির জন্য উপযুক্ত। খরিফ মৌসুমে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা বাঞ্চনীয়। মাটিতে 'জো' থাকা অবস্থায় জমি ও মাটির প্রকার ভেদে ৩-৪টি আড়াআড়ি চাষ দিতে হয়। চাষের পর মই দিয়ে মাটি সমান করে নিতে হয়।
বপনের সময়	চৈত্র মাস (মধ্য মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিল)
মুখীকচু ও ভুট্টা	১০০০ কেজি/হেক্টর, ২০ কেজি/হেক্টর (একক ফসলের শতকরা ৫০ ভাগ)
বপন পদ্ধতি	মুখীকচুর সারি থেকে সারির দূরত্ব হয় ৬০ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার। মুখীকচুর দুই সারির পর এক সারি ভুট্টা বপন করতে হয়। (চিত্র ৬.৫)
সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	ইউরিয়া : ১৪৫-১৫৫, টি এস পি : ১১০-১৩০ এবং এম পি : ১৭০-১৮০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি ও পরিচর্যা	সবটুকু টিএসপি ও এক-চতুর্থাংশ ইউরিয়া সার শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। বাকি এক-চতুর্থাংশ ইউরিয়া ও এমপি বপনের ৪৫ দিন পর এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমপি ৭৫ দিন পর মুখীকচুর পাশে প্রয়োগ করতে হয়। ভুট্টা ৪৫ দিন পর গো-খাদ্য হিসেবে কর্তন করতে হয়। এরপর সার প্রয়োগ করে মুখীকচুর গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হয়। খরিফ মৌসুমে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় বলে সেচের প্রয়োজন পড়ে না।
ফসল সংগ্রহের সময় মুখীকচু ভুট্টা	কার্তিক মাস (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর) বপনের ৪৫ দিন পর (গো-খাদ্য হিসেবে)
মুখীকচু ফলন ভুট্টা	৫০০০ কেজি/হেক্টর, ৬০০০ কেজি/হেক্টর (গোখাদ্য)

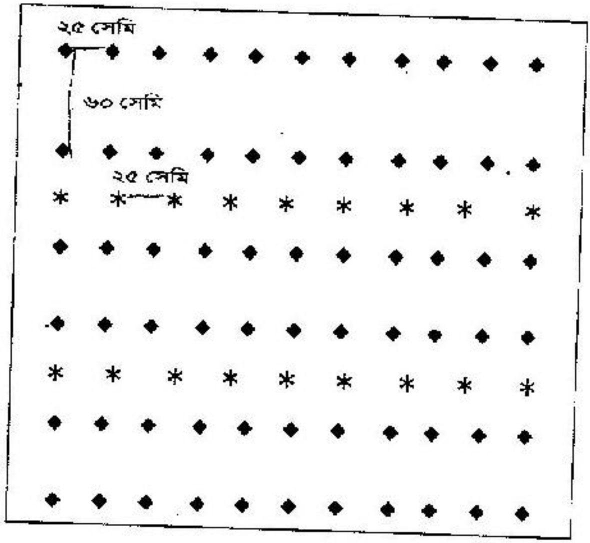

চিত্র ৭.৫ : মুখীকচুর (*) সাথে আন্তঃফসল হিসেবে ভুট্টা (♦) চাষ

৭.১১. ছোলার মিশ্রফসল হিসেবে ধনে চাষ

এই প্রযুক্তি রবি মৌসুমে সেচবিহীন এলাকায় খুবই উপযুক্ত।

প্রযুক্তি এলাকা	বরেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনা ও অন্যান্য ছোলা আবাদি এলাকা
জাত ছোলা, ধনিয়া	বারিছোলা-২/বারিছোলা-৩/বারিছোলা-৪/বারিছোলা-৫/বারিছোলা-৬, স্থানীয়
জমি নির্বাচন ও তৈরি	মাঝারি উঁচু বেলে দোআঁশ মাটি এই প্রযুক্তির জন্য উপযুক্ত। মাটিতে 'জো' থাকা অবস্থায় জমি ও মাটির প্রকার ভেদে ৩-৪টি আড়াআড়ি চাষ দিতে হয়।
বপনের সময়	কার্তিক– মধ্য অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ)
বীজের ছোলা হার ধনিয়া	৩০ কেজি/হেক্টর, ৩ কেজি/হেক্টর
বীজ শোধন	প্রতি কেজি ছোলার বীজের জন্য ২ গ্রাম হারে ভিটাভেক্স ২০০ ব্যবহার করে বীজ শোধন করতে হয়।
বপন পদ্ধতি	ছোলা এবং ধনে বীজ ভালোভাবে মিশিয়ে জমিতে শেষ চাষের সময় সমানভাবে ছিটিয়ে বপন করতে হয়। বীজ বপনের গভীরতা মাটিতে প্রাপ্য রসের উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণত মাটির ২.৫-৩.০ সেন্টিমিটার গভীরে বীজ বপন করলে ভালো হয়।

সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)		ইউরিয়া : ৪০-৫০, টি এস পি : ৮৫-৯৫ এবং এম পি : ৩০-৩৬
সার প্রয়োগ পদ্ধতি		সকল প্রকার সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করে মাটির সাথে মই দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়
পরিচর্যা		চারা গজানোর পর ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত ক্ষেত আগাছামুক্ত রাখতে হয়
রোগ ও পোকা মাকড় দমন		প্রতি এক মিটার সারিতে কমপক্ষে ৫টি ক্ষতিগ্রস্ত শুঁটি দেখা দিলে রিপকর্ড ১০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিলিটার হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়
ফসল কাটার সময়	ছোলা	চৈত্র মাস (মধ্য মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিল)
	ধনে	চৈত্র মাস (মধ্য মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিল)
ফলন ছোলা এবং ধনে		১০০০ কেজি/হেক্টর এবং ৩০০ কেজি/হেক্টর

৭.১২. পাতাজাতীয় সবজির সাথে ভুট্টার আন্তঃফসল

এ প্রযুক্তি খামার বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর কর্তৃক উদ্ভাবন করা হয়। বারি লাঙলের মাধ্যমে জমি চাষ করে ভুট্টার সাথে আন্তঃফসল হিসেবে লালশাক, পালংশাক ও কলমিশাক চাষ করলে বেশ লাভবান হওয়া যায়।

ফসল	ভুট্টা পাতাজাতীয় সবজি (লালশাক, পালংশাক ও কলমিশাক)
জাত ভুট্টা পালংশাক, লালশাক, কলমি শাক	বর্ণালি, স্থানীয় জাত, আলতাপাতী, গিমাকলমি শাক
জমি নির্বাচন	মাঝারি উঁচু দোঁআশ ও পলিদোঁআশ মাটি যেখানে বৃষ্টির পানি জমে না। সেচের সুবিধাযুক্ত স্থানে ভুট্টার আন্তঃফসল চাষ খুব উপযোগী।
বপনের সময়	কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য কার্তিক (মধ্য নভেম্বর থেকে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত)
বপনের দূরত্ব ও পদ্ধতি	ভুট্টার সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭৫ সেন্টিমিটার এবং গাছের দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার রাখতে হয়। ভুট্টার স্বাভাবিক সারির মাঝে ২ সারি সবজি বপন করতে হয়।

বীজ হার (কেজি/ হেক্টর) ভুট্টা, পালংশাক, লালশাক, গিমা এবং কলমিশাক		৩০, ৩.৫, ২.৫ এবং ১৫ কেজি/হেক্টর
সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)		ইউরিয়া : ২১০-২২৩, টি এস পি : ১০০-১১০, এম পি : ৪৫-৫৫ এবং জিপসাম : ১১০-১২০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি		এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং অন্যান্য সব সার শেষ চাষের প্রয়োগ করতে হয়। বাকি ইউরিয়া বীজ গজানোর ৩০ এবং ৬০ দিন পর শুধু ভুট্টার সারিতে উপরি প্রয়োগ করতে হয়
অন্যান্য পরিচর্যা ও সেচ প্রয়োগ		ভুট্টা চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর প্রতি গোছাতে একটি সুস্থ সবল রেখে বাকি গাছগুলো তুলে ফেলতে হয়। চারা গজানোর ৩০, ৬০ এবং ৯০ দিন পর পানি সেচ দিতে হয় এ ছাড়া ৭-১০ দিনর পরপর শুধু সবজির সারিতে সেচ দিতে হয়।
পোকা মাকড় দমন		এক্ষেত্রে ভুট্টার মাজরা পোকার আক্রমণ হতে দেখা যায় এক্ষেত্রে প্রতি হেক্টর জমিতে সুমিথিয়ন/ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি ১.১২ মিলি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়
ফসল কাটার সময়	ভুট্টা	মধ্য ফাল্গুন থেকে চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ (মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ)
	লালশাক	বীজ গজানোর ৩০ দিন পর
	পালংশাক	বীজ গজানোর ৩০ দিন পর
	গিমাকলমি	বীজ গজানোর ৩০ ও ৪৫ দিন পর
ফলন ভুট্টা মূলা		৪-৫ টন/হেক্টর

৭.১৩. ভুট্টা আন্তঃফসল গোমটর

এই পদ্ধতিতে হাটহাজারি, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। কারণ এসব অঞ্চলে চাষীরা গোমটর ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করে থাকে। আমন ধান কাটার পর ভুট্টা - কাউপি আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করা যেতে পারে।

৭.১৩.১. উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ
ফসল	ভুট্টা ও গোমটর
জাত	বর্ণালী ও হাটহাজারি (স্থানীয়)

জমি ও মাটি	মাঝারি উঁচু জমি, দোঁআশ ও এটেল দোঁআশ মাটি
বপনের সময়	অগ্রহায়ণ (মধ্য নভেম্বর-মধ্য ডিসেম্বর)
বপনের দূরত্ব ও পদ্ধতি	ভুট্টা : ৯০x২৫ সেন্টিমিটার এবং কাউপি: ৩০x১০ সেন্টিমিটার। ভুট্টার দুই সারির মাঝে ২ সারি কাউপি বপন করতে হয় (চিত্র ৬.৬)।
বীজের হার	ভুট্টা : ৩০ কেজি/হেক্টর এবং গোমটর ২০ কেজি/হেক্টর
সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	ইউরিয়া : ২২৫-২৬৫, টি এস পি : ১২৫-১৩৫ এবং এম পি : ৮০-৮৬
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং সব টিএসপি ও এমপি শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হয়। বাকি ইউরিয়া দুই ভাগে ভাগ করে বীজ গজানোর ৩০-৬৫ দিন পর ভুট্টা গাছের পাশে প্রয়োগ করতে হয়।

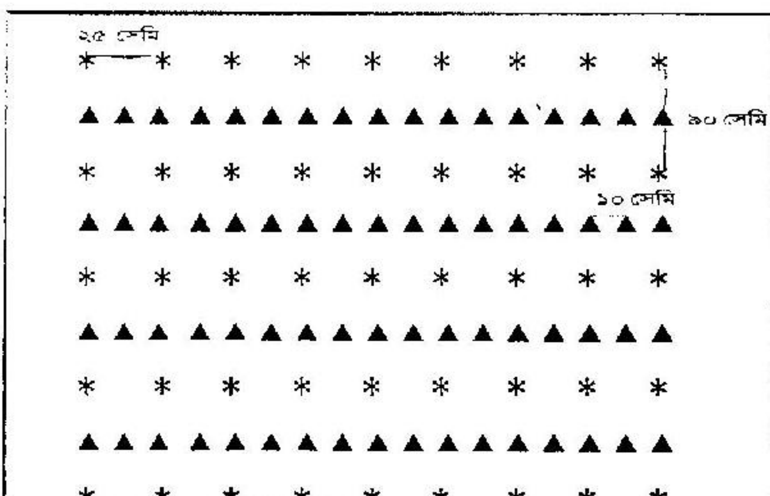

চিত্র ৭.৬ : ভুট্টার (*) সাথে আন্তঃফসল হিসেবে গোমটর (▲) চাষ

বিষয়	বিবরণ
সেচ	জমিতে রস না থাকলে উপরি সার প্রয়োগের সময় সেচ দিতে হয়।
অন্যান্য পরিচর্যা	ভুট্টার চারা গজানোর পর প্রতিটি গুটিতে একটি সুস্থ গাছ রেখে বাকি গাছ তুলে ফেলতে হয়। উপরি সার প্রয়োগের আগে একবার আগাছা পরিষ্কার করতে হয়।
ফসল সংগ্রহ	মধ্য চৈত্র থেকে চৈত্রের তৃতীয় সপ্তাহ (মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ)
ফলন	ভুট্টা : ৩.৫-৪.০ টন/হেক্টর, কাউপি : ১.০-১.৫ টন/হেক্টর

অষ্টম অধ্যায়

বেগুন গোত্রের সবজি

৮.০. বেগুন ও টমেটো

বাংলাদেশে বেগুন গোত্রের সবজির মধ্যে বেগুন ও টমেটো উল্লেখযোগ্য। এ দুটি সবজি সম্বন্ধে বর্ণনা করা হলো।

৮.১. বেগুন

৮.১.১. বেগুন চাষের গুরুত্ব

সারা বিশ্ব ও বাংলাদেশের বিবেচনায় বেগুন একটি গুরুত্বপূর্ণ সবজি ফসল। এর ফল সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। সবজি হিসেবে এর গুরুত্ব এত বেশি হওয়ার কারণগুলো উল্লেখ করা হলো।

(১) মাটি : বেশ প্রশস্ত পরিসরে চাষযোগ্য। বেলে মাটি থেকে এঁটেল মাটিতে জন্মানো যায়।

(২) জলবায়ু : শীতল ও উষ্ণ জলবায়ুতে জন্মানো যায়।

(৩) প্রচুর জাত রয়েছে : সারা বিশ্বে প্রায় ২ শতাধিক চাষযোগ্য জাত রয়েছে। বাংলাদেশেই প্রায় ৪০ জাতের বেগুন পাওয়া যায়।

(৪) সবজি হিসেবে বহুমুখী ব্যবহার : ভর্তা, ভাজি, তরকারি, পোড়াসহ নানাভাবে বেগুন খাওয়া যায়।

(৫) সারা বছর জন্মানো যায় : বেগুন প্রায় সারা বছরই মাঠে ও বসতবাড়িতে মাটিতে ও টবে জন্মানো যায়।

(৬) উৎপাদন দীর্ঘায়িত : যত্ন করলে একটি গাছ থেকে কয়েক মাস ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়।

(৭) বীজের সমস্যা কম : বীজের অঙ্কুরোদ্গমে ও বীজ তলায় চারা তৈরিতে তেমন সমস্যা হয় না।

৮.১.২. বেগুনের উৎপাদন তথ্য

সারা বিশ্ব ও বাংলাদেশে বেগুন উৎপাদনের কিছু তথ্য তালিকার আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব তালিকা বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়।

(১) বিশ্ব বেগুন চাষের জমি ও উৎপাদন : সারা বিশ্বে বেগুন চাষাধীন জমির পরিমাণ বাড়ছে। ১৯৯৯ সালে বিশ্বে প্রায় ১২.৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে বেগুন চাষাবাদ হয়েছিল। হেক্টর প্রতি উৎপাদন ১৬.৩ টন।

(২) মহাদেশীয় জমি ও উৎপাদন : মহাদেশ হিসেবে এশিয়ায় বেগুনের চাষাধীন জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ প্রায় ১১.৬ লক্ষ হেক্টর যা বিশ্বের প্রায় ৯৪%।

(৩) হেক্টর প্রতি উৎপাদন : বেগুনের হেক্টর প্রতি উৎপাদন ওসেনিয়া মহাদেশে (ফিজি দ্বীপপুঞ্জ একত্র) সবচেয়ে বেশি, ৫৩ টন, যদিও চাষাধীন জমির পরিমাণ খুবই কম। তবে ইউরোপে হেক্টর প্রতি বেগুনের উৎপাদন ২৫.৮ টন।

(৪) দেশ হিসেবে জমি : দেশ হিসেবে বেগুনের চাষাধীন জমি সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ চীন (৫.৫ লক্ষ হেক্টর) ও ভারতে (৪.২ লক্ষ হেক্টর)।

(৫) দেশ হিসেবে উৎপাদন : দেশ হিসেবে বেগুনের হেক্টর প্রতি উৎপাদন সবচেয়ে বেশি নেদারল্যান্ডে ৩৫৯ টন। এছাড়া তুরস্ক ও ফিলিপাইনে উৎপাদন যথাক্রমে ৬৪ ও ৬৮ টন/হেক্টর

(৬) বাংলাদেশে বেগুনের জমি ও উৎপাদন : বাংলাদেশে বেগুন চাষাধীন জমির পরিমাণ রবি ও খরিফ মৌসুমে যথাক্রমে ১৯২৩ এবং ১১ হাজার হেক্টর। গড় ফলন মাত্র ৬ টন/হেক্টর।

(৭) বাংলাদেশে উৎপাদন এলাকা : বাংলাদেশে যশোর, ঢাকা, রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা এলাকায় বেগুন উৎপাদন বেশি তবে ফলন ৬-৮ টন/হেক্টর

৮.১.২.১. বিশ্বে বেগুন উৎপাদন

সাল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
১৯৮৯-৯১	৮৫৩	১৩.৩	১১২৮৭
১৯৯৭	১২৩৯	১৬.৩	২০০৮৮
১৯৯৮	১২৩৬	১৬.৩	২০১৬৪
১৯৯৯	১২৩৬	১৬.৩	১০১৪৭

৮.১.২.২. মহাদেশীয় বেগুন উৎপাদন (১৯৯৯)

সাল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
আফ্রিকা	৪৪	১৮.২	৮০০
উ: আমেরিকা	৪	২০.২	৫৭
দ: আমেরিকা	-	১২.২	৫
এশিয়া	১১৬০	১৬.০	১৮৫৪৯
ইউরোপ	২৭	২৫.৮	৭০৫
ওসেনিয়া	-	৫৩.০	১

৮.১.২.৩. বিশ্বের কয়েকটি দেশে বেগুন উৎপাদন (১৯৯৯ সাল)

দেশের নাম	জমির পরিমাণ হাজার হেক্টর	ফলন টন/হেক্টর	মোট উৎপাদন হাজারটন
চীন	৫৫১	১৮.২	১০০২৬
ভারত	৪২০	১৪.৩	৬০০০

আমিরাত	৩৩	২৬.০	৮৫০
ইন্দোনেশিয়া	৪৩	৩৩.৭	১৪৫
মিশর	২৯	১৯.৩	৫৬০
ফিলিপাইন	২৫	৬৮.০	১৭০
তুরস্ক	১০	৬৪.০	৬৪
ইটালি	১১	৩২.৮	৩৬২
মেক্সিকো	১	৩৬.৪	৪০
সাইপ্রাস	-	৫০.০	৩
গাজা স্ট্রিপ	-	৪৭.০	৯
ইসরায়েল	১	৫৩.৩	৪৮
কুয়েত	১	৫৫.৪	১৩
নেদারল্যাণ্ড	-	৩৫৯.০	৩৬

৮.১.২.৪. বাংলাদেশে বেগুন উৎপাদন (খরিফ) মৌসুম

সাল	জমির পরিমাণ হেক্টর	ফলন টন/হেক্টর	মোট উৎপাদন হাজার টন
১৯৯৩-৯৪	৯.৫	৫.[illegible]	৫৬.২
১৯৯৪-৯৫	৯.৭	৬.১	৫৯.৪
১৯৯৫-৯৬	১০.১	৫.৯	৬০.০
১৯৯৬-৯৭	১০.২	৬.০	৬১.২
১৯৯৭-৯৮	১১.০	৫.৭	৬২.৫

৮.১.২.৫. খরিফ মৌসুমে এলাকাভিত্তিক বেগুন উৎপাদন (১৯৯৬-৯৭)

এলাকা	জমির পরিমাণ হাজার হেক্টর	ফলন টন/হেক্টর	মোট উৎপাদন হাজারটন
ঢাকা	১০৮০	৪.১	৪৩৯০
যশোর	১৬৩০	৮.০	১২৩৮৩০
দিনাজপুর	৮০০	৬.১	৪৯৭৫
রংপুর	৮০০	৬.৭	৫৩৩৫
খুলনা	৭০০	৫.৪	৩৭৬৫
কুষ্টিয়া	৭০০	৮.০	৫৫৭০
ফরিদপুর	৬.৫০	৪.২	২৭৬০
বগুড়া	৫০০	৬.৩	৩১৬০

৮.১.২.৬. বাংলাদেশে বেগুন উৎপাদন (রবি মৌসুম)

সাল	জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজারটন)
১৯৯৩-৯৪	১৯০৪	৭.০	১৩২৫০
১৯৯৪-৯৫	১৮৮৫	৬.৮	১২৮২৯০
১৯৯৫-৯৬	১৯০৩	৬.৮	১২৮৯০০
১৯৯৬-৯৭	১৯১৭	৬.৮	১৩০৬৮৫
১৯৯৭-৯৮	১৯২৩	৬.৭	১২৯৫৯০

৮.১.২.৭. রবি মৌসুমে এলাকাভিত্তিক বেগুন উৎপাদন (১৯৯৭-৯৮)

সাল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজারটন)
ঢাকা	১৩০৮	৬.০	৭৮৬৫
যশোর	১৫৯২	৮০৬	১৩৬৮৫
রংপুর	১৪২২	৬০২	৮৮৭৫
দিনাজপুর	১৩৬২	৩০৭	৪৬৩০
জামালপুর	১৩৬৫	৮০১	১০২৭৫
চট্টগ্রাম	১১২৪	৮.১	৯১৫০
বগুড়া	১০৬৭	৭.৮	৭৩১০
ময়মনসিংহ	৮৮৫	৬.১	৫৪১০
কুমিল্লা	১০৭৬	৭.৪	৭৯৬০

৮.১.৩. বাংলাদেশে বেগুন চাষ

বেগুন বাংলাদেশের অতি পরিচিত সবজি এদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, জাপান, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ ইউরোপীয় দেশসমূহ, প্রভৃতি দেশে এর চাষ হয়ে থাকে।

রবি মৌসুমে বেগুন উৎপাদনে অগবর্তী জেলা রাজশাহী (১৩,০০০ টন), চট্টগ্রাম (১২,০০০), যশোর (৯,০০০), খুলনা (৯,০০০), বগুড়া (৯,০০০), পাবনা (৭,০০০), দিনাজপুর (৭,০০০), ও সিলেট (৬,৫০০)। খরিপ মৌসুমে অগ্রবর্তী জেলা যশোর (৮,০০০ টন), রংপুর (৭,৬০০), কুষ্টিয়া (৬,৪০০), রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর ও খুলনা

৮.১.৩.১. বেগুনের জাত

বেগুনের প্রধান প্রধান জাতের মধ্যে ইসলামপুরী, নয়নকাজল, খটখটিয়া, শিংনাথ, মুক্তকেশী, তাল, উল্লেখযোগ্য। বারমাসী কালো ও সাদা বর্ণের জাত রয়েছে. বিদেশী

জাতের মধ্যে ব্ল্যাক বিউটি, ফোর্ট, মায়ার্স, মার্কেট, ফ্লোরিডা বিউটি, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বেগুনের জাত বিষয়ে বর্ণনা করা হলো।

(১) **ইসলামপুরী** : বেগুন বড় গোলাকার ধরনের ব্যাস অপেক্ষা দৈর্ঘ্য বেশি। গাছ উঁচু, পার্শে কম, শাখা ও পাতার সংখ্যা কম। পাতা বড় ও চওড়া। বেগুন বীজ খুব কম। শাঁস মোলায়েম ও সুস্বাদু। এটি ময়মনসিংহ এলাকার বেগুন।

(২) **শিংনাথ** : ফল বেশি, দীর্ঘ ও সরু। গাছ উঁচু, পার্শ্বে অধিক ; শাখা ও পাতার সংখ্যা অধিক। পাতা সরু, বেগুনের বীজ মাঝারি।

(৩) **খটখটিয়া** : বেগুন দীর্ঘ, কিন্তু শিংনাথ অপেক্ষা অনেকটা মোটা এবং গাছ উচ্চতায় ও বিস্তৃতিতে মাঝারি, পাতা মাঝারি চওড়া। রংপুর এলাকার বেগুন।

(৪) **তাল বেগুন** : বেগুন গোলাকার চ্যাপ্টাকৃতি ; দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ব্যাস বেশি, গাছ উঁচু, বিস্তৃতিতে কম; পাতা সংখ্যায় কম। পাতা বড় ও চওড়া। বীজ মধ্যম সংখ্যক। খুলনা এলাকার বেগুন।

(৫) **নয়নকাজল** : অনেকটা ইসলামপুরীর মতো। বেগুন গাঢ় বেগুনি.

(৬) **নয়নতারা** : বেগুন গোলাকার মধ্যম বড়, গাঢ় বেগুনি।

(৭) **উত্তরা** : বেগুন মধ্যম বড় লম্বাটে রঙ বেগুনি

(৮) **সঙ্কর বেগুন** : বিভিন্ন আকার আকৃতি ও বর্ণের বেগুন দেখা যায়।

(৯) **ঈশ্বরদী** : বেগুন বড়, গোল অগ্রভাগ অপেক্ষা বোঁটার নিকটস্থ স্থান অধিক চওড়া। অগ্রভাগ সাদা ছিটছিটে দাগ। পাতা খাটো ও চওড়া।

(১০) **ব্ল্যাক বিউটি** : বেগুন বড় ও গাঢ় বর্ণের। অনেকটা ডিম্বাকৃতি. পাতা চওড়া।

এ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে উন্নত জাতের বেগুন উৎপাদিত হয়। যথা–

১। কেজি বেগুন (কুমিল্লা)
২। লাফফা (গফরগাঁও)
৩। আখির পটলা কাটা বেগুন (দিনাজপুর)
৪। আঙ্গুলি (রংপুর) উওরা, শ্বেতী বেগুন, চিনিয়াপাড়া
৫। মি. চৌধুরী (সিলেট)
৬। ডিম বেগুন (নেত্রকোণা)
৭। বারমাসী বেগুন (সারাদেশ)
৮। ঝুমকা বেগুন (বগুড়া)
৯। দোহাজারী বেগুন (চট্টগ্রাম)
১০। পতেঙ্গা বেগুন (চট্টগ্রাম)
১১। বালিশ বেগুন (বরিশাল)
১২। হাটহাজারি বেগুন (চট্টগ্রাম)
১৩। রাজশাহী ঝুমকা (রাজশাহী)

৮.১.৩.১.১. **বাংলাদেশ উদ্ভাবিত বেগুনের উন্নত জাত :** বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত বেগুন জাতের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হলো।

(ক) বারিবেগুন ১ (উত্তরা)

১৯৮৫ সালে বারিবেগুন ১ বা 'উত্তরা' জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।

(১) এ জাতের গাছ খাটো ছড়ানো।
(২) পাতা শাখার রঙ হালকা বেগুনি।
(৩) ফল সরু ও ১৮-২০ সেন্টিমিটার লম্বা
(৪) ত্বক পাতলা।
(৫) শ্বাস মোলায়েম।
(৬) চারা রোপণের ৪০-৫০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ শুরু হয়।
(৭) দীর্ঘ ৩-৪ মাস পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়।
(৮) প্রতিটি গাছে গড়ে ১০০-১৫০টি ফল ধরে।
(৯) গাছে গুচ্ছাকারের ফল ধরে।
(১০) ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলেপড়া রোগ সহনশীল।
(১১) ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম।
(১২) জীনবকাল বীজ বপন থেকে শেষ সংগ্রহ ১৭০-১৮০ দিন।
(১৩) উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ৬০-৬৫ টন হয়।
(১৪) বাংলাদেশের সর্বত্র শীতকালে এ জাতের বেগুন চাষ করা যায়।
(১৫) আগাম জাত হিসেবে-এর চাষ করা যায়।

(খ) বারিবেগুন ২ (তারাপুরি)

১৯৯২ সালে বারিবেগুন ২ বা তারাপুরি নামে অবমুক্ত করা হয়। এ জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

(১) বেগুন বেলুনাকৃতি।
(২) ফল কালচে বেগুনি রঙের।
(৩) ফলের ত্বক খুব পাতলা।
(৪) শ্বাস মোলায়েম।
(৫) গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৬০-৭৫টি।
(৬) উচ্চ ফলনশীল।
(৭) ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলেপড়া রোগ প্রতিরোধী।
(৮) জীবনকাল বীজ বপন থেকে শেষ সংগ্রহ পর্যন্ত ১৫০-১৮০ দিন।
(৯) উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ৭০-৮০ টন হয়।
(১০) শীতকালে বাংলাদেশের সবত্র এ বেগুন চাষ করা যায়।

(গ) বারিবেগুন ৪ (কাজলা)

নির্বাচন প্রক্রিয়ার বারিবেগুন ৪ কাজলা নামে ১৯৯৮ সালে অবমুক্ত করা হয়। কাজলা জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

(১) ফলের আকার মাঝারি।
(২) ফল লম্বাকৃতি।
(৩) রঙ কালচে বেগুনি চকচকে।
(৪) গাছ মাঝারি ছড়ানো।
(৫) গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৭০-৮০টি।
(৬) প্রতি ফলের ওজন ৫৫-৬০ গ্রাম।
(৭) ঢলেপড়া রোগ সহনশীল।
(৮) বীজ লাগানো ৯০-৯৫ দিন পরে ফল ধরে এবং প্রায় ১৯০ দিন পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়।
(৯) ফলন হেক্টর প্রতি ৬০-৭০ টন হয়।
(১০) এ জাতটি উচ্চ ফলনশীল এবং আকর্ষণীয় বিধায় বাংলাদেশের সব জায়গায় চাষ করা সম্ভব

(ঘ) বারিবেগুন ৫ (নয়নতারা)

১৯৯৮ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে এ উচ্চ ফলনশীল জাতটি বারিবেগুন ৫ বা নয়নতারা নামে অবমুক্ত করা হয়।

(১) ফল গোলাকৃতি।
(২) রঙ উজ্জ্বল কালচে বেগুনি।
(৩) গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ২৫-৩০টি।
(৪) প্রতি ফলে ওজন ১২০-১৩০ গ্রাম।
(৫) অন্যান্য জাতের তুলনায় আগাম ফলন দেয়।
(৬) মোটামুটিভাবে ৮৫ দিনের মাথায় প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়
(৭) ফলন ৪৫-৫০ টন/হেক্টর।
(৮) এ জাতটি বেগুনের ফল ও কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা এবং ঢলেপড়া রোগ কিছুটা প্রতিরোধী।

৮.১.৩.২. বেগুনের উদ্ভিদতত্ত্ব

বেগুন ওমফটভটডণটণ গোত্রের উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম ওমফটভলবব বণফমঙথণভট বেগুনের ক্রোমোজম সংখ্যা ২৪। বেগুন একটি দীর্ঘজীবী গুল্ম; তবে বিভিন্ন দেশে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বর্ষজীবী হিসেবে এর চাষ হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় অনেক জাতের গাছ একবার লাগালে কয়েক বছর বেঁচে থাকতে পারে। বেগুনের প্রধান রঙ বিভিন্ন মাত্রার বেগুনি, সবুজ, সাদা ও এগুলোর মিশ্রণ। অনেক বেগুন কেলিতাত্ত্বিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে বিচিত্র বর্ণ ধারণ করেছে।

পাতা : বেগুনের পাতা সরল, একান্তভাবে সাজানো থাকে। ফলক আকৃতিতে ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাটে ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্মকোণী। ফলকের কিনারা খণ্ডিত গোড়ার দিকে মধ্যশিরার

উভয় পার্শ্ব সাধারণত অসমান। পাতা দৈর্ঘ্যে ১০ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার সবুজ অথবা বেগুনি রঙের যা মোলায়েম লোমে ঘনভাবে আবৃত। কাঁটাবিশিষ্ট জাতে পাতার প্রধান শিরায় তীক্ষ্ণ কাঁটা থাকে।

কাণ্ড : বেগুন একটি ঝোপাল উদ্ভিদ। গাছ উচ্চতায় ৩০ থেকে ১৫০ সেন্টিমিটার উঁচু হয়ে থাকে। গাছ খাড়া ও উর্ধ্বমুখী এবং খাটো ও ছড়ানো হতে পারে। অধিকাংশ জাত দ্ব্যগ্র (ঢধভদর্মমবমহ্র) ধরনের শাখা বিস্তার করে। কাণ্ড সবুজ অথবা বেগুনি এবং রোমে আবৃত থাকে অনেক জাতের কাণ্ডে শক্ত কাটা থাকে

শিকড় : রোপণের সময় চারার ভ্রূণমূল সাধারণত নষ্ট হয়ে কয়েকটি শাখা শিকড় বের হয়। বেগুনের শিকড় কাষ্ঠল প্রকৃতির। শিকড় মাটির নিচে ১.৫ মিটার গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম।

ফুল : বেগুনের ফুল একক অথবা সাইম ফুলগুচ্ছ উৎপন্ন হয়। সাইমের ক্ষেত্রে প্রতি গুচ্ছে ২ থেকে ৬টি ফুল থাকে। ফুল বেগুনি, চওড়ায় ৩ থেকে ৫ সেন্টিমিটার। ফুলে গর্ভকেশরের দণ্ড পাঁচটি। বেগুনের ফুল সকালবেলা ফোটে।

ফুলের পরাগায়ন ও ফল ধারণ : বেগুন মূলত স্বপরাগায়িত উদ্ভিদ হলেও পোকাদ্বারা পরাগায়ণও ঘটে থাকে। বেগুনের ফুল ৪ প্রকার। যথা–

(১) দীর্ঘ-গর্ভদণ্ডধারী ফুলের গর্ভমুণ্ড পরাগধানী সৃষ্ট কোণকের বাইরে চলে আসে

(২) ফুলে গর্ভমুণ্ড কোণকের সমান উচ্চতায় অবস্থান করে। এ দু'প্রকার ফুল থেকে স্বাভাবিকভাবে ফল উৎপন্ন হয় মাঝারি গর্ভদণ্ডধারী।

(৩) ফুলের গর্ভমুণ্ড কোণকের ভিতরে অনেন নিচে থেকে যায়, এসব ফুল থেকে সাধারণত ফল উৎপন্ন হয় না, খাটো আকৃতির ভুয়া গর্ভদণ্ডধারী।

(৪) খাটো আকৃতির প্রকৃত গর্ভদণ্ডধারী।

৩০° সে. তাপমাত্রা এবং ৭০% আর্দ্রতায় পরাগ ৭-১০ দিন সজীব থাকে। এ অবস্থায় ফুলের গর্ভমুণ্ড ৭-৮ দিন পরাগগ্রাহী থাকে। বেগুন গাছে এবং ফুলে বিভিন্ন প্রকার হরমোন ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক দ্রব্য প্রয়োগ করে আগাম ও অধিক সংখ্যায় ফল ধরানো যায় প্রতিকূল পরিবেশেও হরমোনের কার্যকারিতা রয়েছে

ফল ও বীজ : বেগুনের ফল বেরি, ফলের ভিতরের প্রায় সবটুকুই অমরার টিস্যু দ্বারা পূর্ণ। ত্বকের বাইরের স্তর পাতলা। আকার, আকৃতি ও বর্ণে বেগুনের ফল খুবই বৈচিত্র্যময় জাতভেদে এক একটি ফলের ওজন কয়েক গ্রাম থেকে শুরু করে এক কেজির অধিক হতে পারে। ফল গোলাকার, ডিম্বাকার, দণ্ডাকার ফলের বর্ণ বেগুনি, সবুজ, সাদা ও ডোরাকাটা হতে পারে। বেগুনের বীজ দেখতে চেপ্টা ছোট হালকা বর্ণ কিন্তু অনেকটা হলুদাভ, আকৃতিতে বৃক্কাকার বীজ রোমশ নয়। বীজে বীজত্বক, অঙ্কুর এবং সামান্য পরিমাণ সস্য টিস্যু থাকে।

৮.১.৪. বেগুন চাষের পরিবেশগত চাহিদা : বেগুনের ফল ধরার উপর তাপমাত্রার প্রভাব খুব বেশি। ফল ধারণের জন্য গড় তাপমাত্রা ১৫ থেকে ২৫° মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। উচ্চ তাপমাত্রায় পরাগের সজীবতা ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায় বাংলাদেশে রবি মৌসুমেই অধিকাংশ জাতের বেগুনের চাষ করা যায়। খরিফ মৌসুমে

চিত্র ৮.১ : বেগুন গাছের কাণ্ড, পাতা ফুল ও ফল

কোনো কোনো জাতে ফুলই হয় না এবং অন্যান্য জাতে ফুল ঝরে পড়ে। ফল ধরার জন্য প্রতিকূল জলবায়ুতে গাছে অক্সিনজাতীয় হরমোন দিয়ে উপকার পাওয়া যায়

৮.১.৫. বারি বেগুন চাষ প্রযুক্তি : প্রায় সব ধরনের মাটিতেই বেগুন জন্মে তবে দোঁআশ ও এটেল দোঁআশ মাটি এ ফসল ফলানোর জন্য বেশি উপযোগী।

বীজ বপন ও চারা রোপণ : বীজতলায় চারা তৈরি করে নিয়ে ৫-৬ সপ্তাহ বয়সের চারা ৬০-৮০ সেন্টিমিটার দূরত্বে সারি করে ৫০-৭০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে লাগাতে হয়।

চারা উৎপাদন : সরাসরি বীজ বুনে বেগুনের চাষ করা যায় না। প্রথমে বীজতলায় চারা তৈরি করে পরবর্তীতে রোপণ করতে হয়। প্রতি হেক্টর জমির জন্য ২৫০-৩০০ গ্রাম বীজ লাগে। এ পরিমাণ বীজ ৩×১ মিটার পরিমাপের ১৬-২০টি বীজতলায় বোনা যেতে পারে। বপনের আগে বীজ ১০-১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে ভালো হয় বীজতলায় শীতের বেগুনের বীজ জুলাই এবং বর্ষার বেগুনের বীজ এপ্রিল-মে মাসে বোনা যায়

রোপণের সময় : গ্রীষ্মকালীন ফসল জানুয়ারি-মার্চ, বর্ষাকালীন ফসল এপ্রিল-মে এবং শীতকালীন ফসলের জন্য আগস্ট-অক্টোবর মাসে চারা রোপণ করতে হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি : অর্ধেক গোবর সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হয়। বাকি অর্ধেক গোবর, সম্পূর্ণ টিএসপি এবং $\frac{1}{3}$ অংশ করে ইউরিয়া ও এমপি সার মাদা তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হয়। বাকি ইউরিয়া এবং এমপি সার তিনটি সমান কিস্তিতে রোপণের ২১, ৩৫ ও ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

উচ্চ ফলনের জন্য বেগুনের সার প্রয়োগ : এ বিষয়ে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো

সারের নাম	সারের পরিমাণ (হেক্টর)
কমপোস্টগুঁড়া (শক্তি)	৪০০-৬০০ কেজি
বা সাধারণ গোবর	৪০৬ টন
ইউরিয়া	৩০০-৪০০ কেজি
টিএসপি	১৩০-১৫০ কেজি
এমপি	১৫০-২৫০ কেজি
জিপসাম	৮০-১০০ কেজি
ডলোচুন	৩০০-৫০০ কেজি
বরিক এসিড	৮-১০ কেজি
জিঙ্ক সার (৩৬%)	৪-৬ কেজি

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা : গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে গাছের গোড়ার কাছের মাটি আলগা করে দিতে হয়। শীতকালীন ও আগাম লাগানো বর্ষাকালীন ফসলের জন্য বেগুনে পানি সেচের প্রয়োজন হয়।

বেলে মাটিতে ১০-১৫ দিন পর পর সেচ দেয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালীন ও বারমাসী ফসলে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হয়। বীজতলায় শীতের বেগুনের বীজ জুলাই এবং বর্ষার বেগুনের বীজ এপ্রিলেও বপন করা যায় বপনের আগে বীজ পানিতে ১০-

১২ ঘন্টাকাল ভিজিয়ে নিলে ভালো হয়। চারা ৫-৬ পাতাবিশিষ্ট হলে জমিতে স্থানান্তরিত করে রোপণ করা হয়।

মাটিতে অধিক পরিমাণে জৈব-পদার্থ দিলে ভালো হয়। চারা রোপণকালে চারার অগ্রভাগ ছিড়ে দিলে গাছের প্রচুর শাখা-প্রশাখা বের হয় এবং তাতে গাছের অধিক পরিমাণ ফল দানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। রোপণের ৪০-৬০ দিন পরে মাটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে গাছের গোড়ার মাটি উঠিয়ে দেয়া ভালো।

পোকা দমন : 'এপিলাকনা' বা কাটালে পোকার কীড়া ও বয়স্ক পোকা বেগুনের পাতা খায়, মাজরার পোকা ডগা ও ফলে ছিদ্র করে, মেলি-বাগ কাণ্ড ও পাতার রস চুষে এবং উরচুঙ্গা পোকা চারার গোড়া কেটে দেয়। পিঁপড়া শিকড় খায়, কাটুই পোকা চারার গোড়া কেটে দেয়, লিফ-রোলার পাতা মোড়ায় ও ভিতরে খায়।

ম্যালাথিয়ন ছিটিয়ে এসব দমন করা যায়। উরচুঙ্গা ও কাটুই পোকা দমনের জন্য সেভিন ডাস্টিং অথবা বিষটোপ, পিঁপড়া দমনে ক্লোরডেন, মেথোক্সিক্লোর, বাইড্রিন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোগ দমন : বেগুন মাটিস্থ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়; যথা- ব্যাক্টেরিয়াজনিত, ফিউজেরিয়ামজনিত ও ভার্টিসিলিয়ামজনিত ঢলে পড়া ইত্যাদি। বেগুনের রোগের মধ্যে ফল পচা ও উইল্ট রোগ প্রধান।

ফল পচা রোগে পাতা ও কাণ্ডে বাদামি দাগ পড়ে। এর জন্য রোগ মুক্ত বীজ ব্যবহার, প্রতিরোধ জাত ও শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হয়। একই জমিতে বারবার বেগুনের চাষ করা ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলেপড়া রোগ প্রতিরোধের জন্য বন্য প্রজাতি ও. মসধভটরধলব, ও. মরশলব ও ও. ধর্তণথরধতমফধলব-এর সাথে বেগুন কলম জুড়ে দেয়া যায়

৮.১.৬. বারমাসী বেগুনের চাষ : রবি মৌসুমে অধিকাংশ জাতের বেগুন চাষ করা সম্ভব, কিন্তু খরিফ মৌসুমে সব জাত ফল ধারণ করে না। যে জাত খরিফ মৌসুমে ফল দিতে পারে তা বারমাসী ফসল হিসেবে জন্মানো যেতে পারে বারমাসী হিসেবে চাষ করার জন্য স্থানীয়ভাবে কৃষকদের কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য জাতের বীজ সংগ্রহ করাই উত্তম

বেগুনের গাছ দীর্ঘজীবী বলে একবার লাগালেই গাছ ২-৩ বছর ফল দেয়। ফল ধরার পর গাছ ছাঁটাই করে দিলে নতুন ও সতেজ শাখা গজায়।

ফসল সংগ্রহ : বারমাসী ব্যতীত অন্যান্য জাতের গাছের সময়সীমা রোপণের সময় থেকে প্রায় ৫ মাস। জমি থেকে দুই একদিন পরপরই বেগুন সংগ্রহ করা উচিত। অন্যথায় বেগুনের কচি অবস্থা নষ্ট হয়ে খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। বড় আকারের বেগুন জন্মাতে হলে মাঝে মাঝে কিছু কিছু বেগুন ক্ষুদ্র অবস্থায় ছিঁড়ে ফেলতে হয়।

৮.২. টমেটো

৮.২.১. বিশ্বে সবজি ও টমেটো উৎপাদন

সবজি জগতে টমেটো অতি পরিচিত। কাঁচা সালাদ, তরকারি, আচার, চাটনি, কেচাপ, সস, সুপ ইত্যাদি তৈরিতে টমেটো ব্যবহৃত হয়।

ট.২.১.১. বিশ্বে কয়েকটি সবজির উৎপাদন (১৯৮৯)

সবজি	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
টমেটো	২৪০৪	২৫.৫	৬৮৩
বাঁধাকপি	১৬৯৫	২২.০	৩৬৬
পেঁয়াজ	১৯৮০	১৩.৮	২৬৩
গাজর	৬১৫	২২.২	১৩৬
শসা-খিরা	৮৮৮	১৪.৫	১২৮
কাঁচামরিচ	১০৫৭	৮.৩	৮৭
লাউ-কুমড়া	৫৮৬	১১.২	৬৬
ফুলকপি	৪০৭	১৩.৬	৫৫
বেগুন	৪২৩	১৩.২	৫৭
শিম-বরবটি	৪৫১	৬.৯	৩১
রসুন	৪৮৭	৬০১	৩০

ট.২.১.২. বিশ্বে টমেটো উৎপাদন ধারা

সাল	জমি হাজার হেক্টর	ফলন টন হেক্টর	মোট উৎপাদন হাজার টন	মন্তব্য
১৯৮৯-৯১	২৯০০	২৬.০	৭৫৩২১	
১৯৯৭	৩১৯৮	২৭.১	৮৬৬৬৩	ক্রমেই বাড়ছে
১৯৯৮	৩২৪৬	২৮.৮	৯০৪৬৮	ক্রমেই বাড়ছে
১৯৯৯	৩২৫৪	২৭.৮	৯০৩৬০	

ট.২.১.৩. বিশ্বে টমেটোর জমি ও ফলন (১৯৯৯)

দেশ	জমির (হাজার হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)
ভারত	৩৫০	১৫.১
চীন	৫৩৯	৩০.৪
তুরস্ক	১৫৮	৪১.৮
মিশর	১৭০	৩৪.৭
যুক্তরাষ্ট্র	১৬৮	৫৯.৩
বাংলাদেশ	১৩	৭.২
বাহরাইন	২	২৮.৫

কানাডা	৯	৬২.০
চিলি	১৯	৬৩.০
সাইপ্রাস	-	১০০.০
ইসরায়েল	৫	১০৩.০
সংযুক্ত আমিরাত	১১	৭১.০
অস্ট্রিয়া	-	১০১.০
যুক্তরাজ্য	-	৩৮৩.৩
বেল-লক্স	১	৩৩৩.০
সুইডেন	-	৩২৭.০
ডেনমার্ক	-	২৭৩.০
ফিনল্যাণ্ড	-	২৬৪.০
আইসল্যান্ড	-	২০১.০
নেদারল্যান্ড	১	৪২৫.০
নরওয়ে	-	২৯২.০
অস্ট্রেলিয়া	৮	৪২৫.০
কুকদ্বীপ	-	৫০০.০

৮.২.১.৪. বিশ্বে টমেটোর বর্তমান উৎপাদন (১৯৯৯)

মহাদেশ	জমি (হাজার টন)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট ফলন (হাজারটন)
আফ্রিকা	৫৫৮	১৯.২	১০৭২৮
উত্তর আমেরিকা	৩০০	৪৪.৭	১৩৪১৯
দক্ষিণ আমেরিকা	১৫৬	৪০.১	৬২৪৯
এশিয়া	১৫৬৫	২৫.৬	৪০০১১
ইউরোপ	৬৬৪	২৯.৪	১৯৫৩৮
ওসেনিয়া	১০	৪১.২	৪১৪
মোট	৩২৫৪	১৭.৮	৯০৩৬০

৮.২.১.৫. বাংলাদেশে টমেটো উৎপাদন

সাল	জমি (হাজার হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)	ফলন (টন/হেক্টর)
১৯৯৩-৯৪	১১.৬	৭.৪	৮৬
১৯৯৪-৯৫	১১.৮	৭.৪	৮৭

১৯৯৫-৯৬	১২.০	৭.৪	৮৯
১৯৯৬-৯৭	১২.১	৭.৭	৯৩
১৯৯৭-৯৮	১২.৩	৭.৬	৯৪

৮.২.১.৬. বাংলাদেশে টমেটোর এলাকাভিত্তিক ফলন (১৯৯৬-৯৭)

এলাকা	জমি (হাজার হেক্টর)	মোট উৎপাদন হাজার টন	ফলন টন/হেক্টর
কুমিল্লা	১.৬	১২.৫	৭.৮
ঢাকা	১.২	৯.৬	৮.০
যশোর	১.০	৯.৪	৯.৪
চট্টগ্রাম	০.৯	৯.৬	১০.৭
সিলেট	০.৮	৬.৫	৮.১
ময়মনসিংহ	০.৪	৪.০	১০.৩

বর্তমানে সবজি চাষের জমি ও উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলেছে। ১৯৯৮-৯৯ সালের কৃষি পরিসংখ্যানের হিসাব মোতাবেক সবজির আওতায় মোট জমির পরিমাণ প্রায় ২০ হাজার হেক্টর এবং উৎপাদন প্রায় ১৫ হাজার টন শীত মৌসুমে সবজি চাষের অনুকূল হওয়ার মোট উৎপাদন প্রায় ৭০ শতাংশ সবজি এই মৌসুমে উৎপাদিত হয়. উৎপাদিত এই সবজি চাহিদার মাত্র ২০% পূরণ করে। বাংলাদেশে শীতকালীন সবজির মধ্যে টমেটো এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। সালাদ, তরকারি, চাটনি ও সরাসরি খাওয়া সুবিধাসহ এতে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান বেশি থাকায় বাংলাদেশের টমেটোর গুরুত্ব বেশি। প্রায় সারা দেশেই অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে টমেটো চাষ করা যায়।

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ট্যাটোটোন নামক হরমোন .২% হারে টমেটো ফুলে ছিটিয়ে বর্ষাকালেও টমেটো আবাদ করা যায়। লাইন তিনটি হচ্ছে টিএম ০০৫৪, টিএম ০৩৬৭ এবং টিএম ০১১১।

৮.২.২. টমেটোর উদ্ভিদতত্ত্ব

টমেটো সোলানেসি গোত্রের *Lycopersicum* গণের অন্তর্ভুক্ত। এ গণে ৯টি প্রজাতি আছে *L. esculentus. L. pimpinellifolorum, L. chmielewskii, L. pennellii, L. hirsutum, L. chilense FmA L. peruvianum, L. cheesmani, L. parvilorum L. chmielewsleil, L. peannellis, L. hirsutum, Lycopersicum* গণের সব উদ্ভিদ ডিপ্লয়েড এবং এগুলোর ক্রোমোজম সংখ্যা ১২ জোড়া. সবই বর্ষজীবী কিংবা স্বল্পস্থায়ী দীর্ঘজীবী উদ্ভিদ

শিকড় : টমেটোর চারা প্রথমে ভ্রূণমূল উৎপাদন করে। কিন্তু রোপণের সময় এটা নষ্ট হয়ে স্থূল গুচ্ছমূল উৎপন্ন হয়। টমেটোর শিকড় মাটির এক মিটার পর্যন্ত গভীরে প্রবেশ করতে পারে।

কাণ্ড : কাণ্ডের গঠন অনুযায়ী টমেটোর জাতসমূহকে অবিরত (Indeterminate) এবং সবিরত (determinate) এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে কাণ্ডে ৩ থেকে ৫টি পরপর ফুলগুচ্ছ উৎপন্ন হয় এবং আমৃত্যু বৃদ্ধি চলতে থাকে। সবিরত জাতে অনধিক ২টি পর্ব পরপর ফুলগুচ্ছ উৎপন্ন হয় এবং কয়েকটি গুচ্ছ উৎপাদিত হওয়ার পর কাণ্ডের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। সবিরত জাতসমূহ ঝোপালো হয়। টমেটোর কাণ্ড কোমল ও রোমশ। টমেটো গাছের রোমের আগায় তেলগ্রন্থি রয়েছে। ঘষা দিলে গ্রন্থি ফেটে বৈশিষ্ট্যময় গন্ধ বের হয়।

ফুল, ফল ও বীজ : টমেটোর ফুলগুচ্ছ সরল বেসিমস ডাইকটোমাস ও পলিকটোমাস হয়ে থাকে। বৃহৎ ফলধারী জাতে ফুলের সংখ্যা ৪ থেকে ৮টি এবং ক্ষুদ্রাকার ফলধারী জাতে ফুল ৫০টি পর্যন্ত হতে পারে। টমেটোর ফুল গর্ভাশয়বিশিষ্ট (hypogynous) এবং ফুলে ৫ থেকে ১০টি বর্শাফলাকার ও স্থায়ী বৃত্যংশ, ৬টি হলুদ পাঁপড়ি এবং ৬টি পুংকেশর থাকে। পুংকেশরসমূহ গোড়ার দিকে পাঁপড়ির সাথে সংযুক্ত এবং অগার দিকে গর্ভকেশরকে ঘিরে স্থাপিত। টমেটো একটি স্ব-পরাগায়িত উদ্ভিদ তবে কিছু পর-পরাগায়ন ঘটে থাকে। ফুল ফোটার সময় গর্ভমুণ্ড পরাগগ্রাহী হয়ে যায়, কিন্তু পরাগধানী ফাটিতে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগে। ফুলের পরাগায়ণ তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। ২২ থেকে ২৭ সে. তাপমাত্রা এই প্রক্রিয়ার জন্য উপযোগী। ফল বেরি ফলে তিনটি অংশ থাকে যথা– ফলত্বক (pericarp), অমরীয় টিস্যু ও বীজ। পাকার সময় অমরীয় টিস্যুর কোষসমূহ ফেটে গিয়ে একপ্রকার পিচ্ছিল বস্তু উৎপন্ন হয়। পাকা ফলের বর্ণ লাল, হলুদ এবং এ দু'য়ের মাঝামাঝি যেকোনো রঙের হতে পারে। হলুদ রঙের টমেটোতে ক্যারোটিন বেশি থাকে। পাকা ফলের রঙ আলো ও তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত। উচ্চ তাপমাত্রায় জন্মানো টমেটো হলুদ হয়ে থাকে। টমেটোর বীজ চ্যাপ্টা, গোলাকার, খড় বর্ণের এবং রোমশ। প্রতিটি ফলে ১৫০ থেকে ৩০০ বীজ থাকে।

টমেটোর ফল ধারণ সমস্যা : টমেটো উৎপাদনে জলবায়ুঘটিত নানা সমস্যা রয়েছে। গাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট হলেও ফুল ও ফল ধারণের ব্যাপারে জলবায়ু মাত্রা খুবই অল্প। টমেটোর ফল ধারণ গাছের দৈহিক বৃদ্ধি, ফুল উৎপাদন, পরাগায়ন, গর্ভদণ্ডের অভ্যন্তরে পরাগনালীর লম্বন, নিষেক এবং ডিম্বাধারের বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। যেমন–

ক. দিনের তাপমাত্রা ২৫ থেকে ৩০° সেন্টিগ্রেড এবং রাতের তাপমাত্রা ১৫ থেকে ২০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ফল ধরার জন্য উপযোগী তবে এর সাথে প্রচুর আলো থাকতে হয়।

খ. বৃষ্টিপাত ও আকাশের মেঘাচ্ছন্নতা ফলধারণে বাঁধার সৃষ্টি করে।

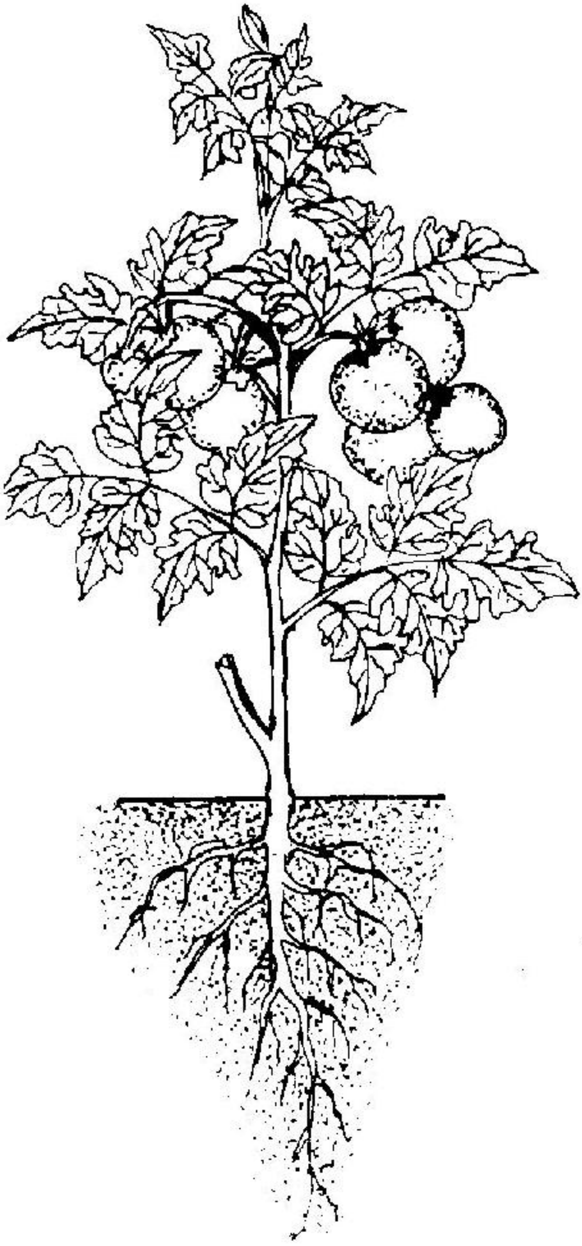

চিত্র ৮.২ : পূর্ণাঙ্গ টমেটো গাছ

গ. গড় তাপমাত্রা অনুকূল হলেও রাতে উচ্চ তাপমাত্রায় (২২° সে.-এর উপরে) ফল ধারণ ব্যাহত হয়। রাতের উচ্চ তাপমাত্রা দিনের উচ্চ তাপমাত্রা অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর।

ঘ. উচ্চ তাপমাত্রার সাথে প্রখর আলো ফল ধরার জন্য খুব ক্ষতিকর। এরকম পরিস্থিতিতে গাছে ছায়া প্রদান করে ফল ধরা বাড়ানো যায়।

ঙ. উচ্চ তাপমাত্রার কুপ্রভাব নানাভাবে কার্যকরি হয়ে থাকে। যেমন-

১) প্রতিকূল অবস্থায় ফুল নিষেকের পূর্বেই ঝরে পড়ে।

২) উচ্চ তাপমাত্রায় শ্বসন বেশি হয় যার ফলে গাছে শ্বেতসার জমা হতে পারে না।

৩) ফুলের পরাগ ও ডিম্বাণু কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে।

৪) গর্ভদণ্ড লম্বা হয়ে পুংকেশরের বাইরে চলে আসে।

৮.২.৩. বাংলাদেশের টমেটোর জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত টমেটো জাতের বিবরণ উপস্থাপিত হলো।

(১) বারিটমেটো-১-এর বৈশিষ্ট্য

উচ্চ ফলনশীল বারিটমেটো-১ জাত নির্বাচনের মাধ্যমে ১৯৮৫ সালে উদ্ভাবন করা হয়।

ক. গাছের উচ্চতা ১০০ থেকে ১১০ সেন্টিমিটার।

খ. ফল সামান্য লম্বাটে ওজন ৮৫ থেকে ১০০ গ্রাম।

গ. প্রতিটি গাছে ২৫ থেকে ৩৫টি ফল ধরে।

ঘ. গাছ প্রতি ফলন ২.৫ থেকে ৩.০ কেজি।

ঙ. চারা লাগানোর ৭৫ থেকে ৮০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে।

চ. মাসাধিককালে ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়।

ছ. ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলেপড়া রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে।

জ. জীবনকাল ১০৫ থেকে ১১০দিন।

ঝ. হেক্টর প্রতি ফলন ৮৫ থেকে ৯০ টন হয়।

(২) বারিটমেটো-২-এর বৈশিষ্ট্য

বারিটমেটো-২ নামের এ জাত উচ্চফলনশীল।

ক. গাছের উচ্চতা ৭৫ থেকে ৮৫ সেন্টিমিটার গোলাকার।

খ. ফলের ওজন ৮৫ থেকে ৯০ গ্রাম।

গ. প্রতিটি গাছে ৩০ থেকে ৩৫টি ফল ধরে।

ঘ. গাছ প্রতি ফলন ২.০ থেকে ২.৫ কেজি।

ঙ. ফল চারা লাগানোর ৭৫ থেকে ৮০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়

চ. ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলেপড়া রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে।

ছ. জীবনকাল ১০৫ থেকে ১১০ দিন।

জ. উন্নত চাষে হেক্টর প্রতি ৭০ থেকে ৮৫ টন হয়।

(৩) বারিটমেটো-৩-এর বৈশিষ্ট্য

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে অবমুক্ত করা হয়।

ক. গাছের উচ্চতা ১০০ থেকে ১১০ সেন্টিমিটার।

খ. ফল মাংসালো এবং কিছুটা চেপ্টা আকৃতির।

গ. ফলের রঙ গাঢ় লাল। গড় ওজন ১০ গ্রাম।

ঘ. প্রতিটি গাছে ৩০ থেকে ৩২টি ফল ধরে।

ঙ. গাছ প্রতি ফলন ২ থেকে ৩ কেজি।

চ. চারা লাগানোর ৮৫ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে।

ছ. জীবনকাল ১১০ থেকে ১১৫ দিন

জ. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ৮৫ থেকে ৯০ টন হয়।

ঝ. বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এই জাতটির চাষ করা হয়।

ঞ. পারিবারিক সবজি বাগানে এটি চাষের বেশ উপযোগী।

ট. গাছ ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলেপড়া রোগ প্রতিরোধী।

(৪) বারিটমেটো-৪-এর বৈশিষ্ট্য

এ জাত ১৯৯৬ সালে অবমুক্ত করা হয়।

ক. বারি টমেটো-৪-এর ফলের রঙ লাল।

খ. ফল গোলাকার।

গ. প্রতিটি ফলের ওজন ৩৫ থেকে ৪৫ গ্রাম।

ঘ. টমেটোটোন প্রয়োগ করে উৎপাদিত ফল বীজবিহীন হয়।

ঙ. প্রতিটি গাছে ২২ থেকে ২৫টি ফল ধরে।

চ. গাছ প্রতি ফলন প্রায় ১ কেজি।

ছ. চারা লাগানোর ৬০ থেকে ৬৫ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়

জ. উচ্চ তাপসহিষ্ণু জাত।

ঝ. ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলেপড়া রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে।

ঞ. আগাম শীত মৌসুমে চাষ করা যায়।

ট. জীবনকাল ৯০ থেকে ৯৫ দিন।

ঠ. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ২০ থেকে ২২ টন হয়।

ড. গ্রীষ্ম-বর্ষা মৌসুমে পলিথিনের ছাউনিতে চাষ করতে হয়।

ঢ. আগাম সবজি হিসেবে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে এই জাতটি চাষ করা যায়।

ণ. বর্ষা মৌসুমে টমেটো চাষ করে আর্থিক দিক থেকে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

(৫) বারিটমেটো-৫-এর বৈশিষ্ট্য

বারিটমেটো-৫ নামে এ জাতটি ১৯৯৬ সালে অবমুক্ত করা হয়।

ক. বারিটমেটো-৫-এর ফল হৃৎপিণ্ডাকৃতির।

খ. ফলের গড় ওজন ৪০ থেকে ৪৫ গ্রাম।

গ. প্রতিটি গাছে ২০ থেকে ২২টি ফল ধরে।

ঘ. চারা লাগানোর ৬০ থেকে ৬৫ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ শুরু হয়।
ঙ. কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগের ফলে গ্রীষ্ম মৌসুমে উৎপাদিত ফল বীজবিহীন হয়ে থাকে।
চ. ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলেপড়া রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা রয়েছে।
ছ. আগাম শীত মৌসুমে চাষ করা যায়।
জ. জীবনকাল ৯৫ থেকে ১০০ দিন।
ঝ. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ২০ থেকে ২২ টন ফলন হয়।
ঞ. বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এই জাতটি চাষ করা যায়।
ট. গ্রীষ্ম-বর্ষা মৌসুমে পলিথিনের ছাউনিতে চাষ করতে হয়।
ঠ. বর্ষা মৌসুমে টমেটো চাষ করে আর্থিক দিক থেকে অধিক লাভবান হওয়া যায়।
ড. এ জাত উষ্ণ তাপ সহনশীল।

(৬) বারিটমেটো-৬ (চৈতী)-এর বৈশিষ্ট্য

১৯৯৮ সালে চৈতী জাত অবমুক্ত হয়।

ক. এ জাত উচ্চ ফলনশীল।
খ. এটি তাপসহিষ্ণু।
গ. ফুল ও ফল ধারণকালে গাছের বৃদ্ধির অব্যাহত থাকে।
ঘ. ফল গোলাকার হালকা লাল।
ঙ. ফলের ত্বকে আংশিক শিরা বিদ্যমান।
চ. ফলের ওজন ৮০ থেকে ৯০ গ্রাম।
ছ. প্রতিটি গাছে ৩০-৩২টি ফল ধরে।
জ. চারা লাগানোর ৮০-৮৫ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে।
ঝ. মাসাধিক কাল ফল সংগ্রহ করা যায়।
ঞ. সারা বছর ধরে এ জাতটি চাষ করা যায়
ট. জাতটির জীবনকাল ১০০-১১০ দিন
ঠ. ফলন হেক্টর প্রতি ৮৫-৯০ টন এবং গ্রীষ্ম মৌসুমে ৪৫-৫০ টন হয়।
ড. বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এই জাতটির চাষ করা যায়।
ঢ. বর্ষা মৌসুমে পলিথিন ছাউনিতে চাষ করতে হয়।
ণ. গ্রীষ্ম-বর্ষা কালে আশানুরূপ ফল ধারণের জন্য টমেটোটোন নামক কৃত্রিম হরমোন (২০ মিলি/১লিটার) পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।
ত. গ্রীষ্ম মৌসুমে এ জাতের টমেটো চাষ বেশি লাভজনক।

(৭) বারিটমেটো-৭ (অপূর্ব)-এর বৈশিষ্ট্য

১৯৯৮ সালে অপূর্ব জাতটি অবমুক্ত করা হয়।

ক. ফুল ও ফল ধারণকালেও গাছ বাড়তে থাকে।
খ. ফলের মাথায় তারকার মতো চিহ্ন থাকে।
গ. ফলের রঙ কমলা লেবুর মতো।
ঘ. ফল চ্যাপ্টা।

ঙ. ফলের গড় ওজন ১৪৫ থেকে ১৫৫ গ্রাম।
চ. প্রতিটি গাছে ৩০-৩২টি ফল ধরে।
ছ. গাছ প্রতি ফলের ওজন ৩.০-৩.৫ কেজি।
জ. চারা লাগানোর ৮০-৯০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে।
ঝ. ৩-৫ বার ফল সংগ্রহ করা যায়।
ঞ. জীবনকাল ১০০-১১০ দিন।
ট. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ১০০-১০৫ টন হয়।
ঠ. বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এই জাতটি শীত মৌসুমে চাষ করা যায়।
ড. পারিবারিক বাগানে এটি চাষের বেশি উপযোগী।
ঢ. জাতটি ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলেপড়া রোগ প্রতিরোধী।

(৮) বারিটমেটো-৮ (শিলা)-এর বৈশিষ্ট্য

ক. জাতটি ১৯৯৮ সালে অবমুক্ত করা হয়।
খ. এটি একটি উচ্চ ফলনশীল জাত।
গ. গাছ খাটো।
ঘ. ফল অনেকটা বর্গাকৃতি।
ঙ. ফলের মাথায় উপরের দিক অনেকটা দাবানো।
চ. ফল মাংসালো।
ছ. ফলের ত্বক অত্যন্ত পুরু এবং শক্ত প্রকৃতির।
জ. প্রতিটি গাছে ২৮-৩০টি ফল ধরে।
ঝ. ফলে ওজন ১১৫-১৩৫ গ্রাম।
ঞ. গাছ প্রতি ফলন ১.৫০-৩.০ কেজি
ট. চারা লাগানোর ৮০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে।
ঠ. ফল ২-৩ বার সংগ্রহ কর যায়।
ড. ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলেপড়া রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাসম্পন্ন।
ঢ. সংগৃহীত পাকা ফল ঘরের তাপমাত্রায় ১৫-২০ দিন সংরক্ষণ করা যায়
ণ. জীবনকাল ১০০-১১০ দিন হয়।
ত. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ৯০-৯৫ টন হয়।
থ. বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এই জাতটি শীত মৌসুমে চাষ করা যায়।

(৯) বারিটমেটো-৯ (লালিমা)-এর বৈশিষ্ট্য

জাতটি ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে অবমুক্ত করা হয়।

ক. ফল ডিম্বাকৃতির।
খ. ফলের মাথার দিকের কেন্দ্রবিন্দু সামান্য চোখা।
গ. প্রতিটি গাছে ৩২-৩৫টি ফল ধরে।
ঘ. ফলের ওজন ৭০-৮০ গ্রাম।
ঙ. গাছ প্রতি ফলন ২.৫ কেজি।

চ. চারা লাগানোর ৭০-৮০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে।
ছ. ফল ২-৩ বার সংগ্রহ করা যায়।
জ. ফলের ত্বক পুরু ও মাংসাল।
ঝ. সংগৃহীত ফল ঘরের তাপমাত্রায় ৩ সপ্তাহের অধিক সংরক্ষণ করা যায়।
ঞ. এ জাতের জীবনকাল ৯৫-১০৫ দিন।
ট. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ৮৫-৯০ টন হয়।
ঠ. বাংলাদেশে সব অঞ্চলে এই জাতটির চাষ করা যায়।
ড. গ্রীষ্ম-বর্ষা মৌসুমে টমাটোটোন নাম হরমোন ফুটন্ত ফুলে প্রয়োগ করলে ফলন বেশি পাওয়া যায়।
ঢ. এ জাত উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে।
ণ. জাতটির ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলেপড়া রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে।

(১০) বারিটমেটো-১০ (অনুপমা)-এর বৈশিষ্ট্য

বারিটমেটো-১০ বা অনুপমা নামে একটি উচ্চ ফলনশীল সঙ্কর জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ জাতটি ১৯৯৮ সালে অবমুক্ত করা হয়।
ক. প্রতিটি গাছে ৭০-৮০টি ফল ধরে।
খ. ফল ডিম্বাকৃতি।
গ. ফলের ওজন ২৫-৩৫ গ্রাম।
ঘ. গাছপ্রতি ফলন ২.৩ কেজি।
ঙ. চারা লাগানোর ৬০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে।
চ. ফলের ত্বক পুরু।
ছ. অধিককাল সংরক্ষণ ও দূরে সরবরাহের উপযোগী।
জ. জীবনকাল ৯০-১০০ দিন।
ঝ. হেক্টর প্রতি ফলন ৪৮-৫২ টন হয়।
ঞ. বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এই জাতটির চাষ করা যায়।
ট. এ জাত উচ্চ তাপ সহিষ্ণু।
ঠ. ব্যাকটেরিয়ার ঢলেপড়া রোগ প্রতিরোধী।

সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টটিউট সঙ্করসহ আরও ৩টি জাত উদ্ভাবন করেছে। গুলোর রঙ আকর্ষণীয় এবং ফলন ক্ষমতা বেশি।

৮.২.৩.১. **টমেটোর অন্যান্য জাত :** টমেটোর অন্যান্য জাতের বর্ণনা উপস্থাপিত হলো।

(১) পশ্চিম জাত : অক্সহার্ট (oxheart), মার্গ্লোব (marglobe), রাটগার্স (Rutgers), আর্লিয়ানা (Erliana), বার্পি হাইব্রিড (Burpee hybrid), বনিবেস্ট (Bonny best), জনবেয়ার (John baer), ইত্যাদি। যুক্তরাষ্ট্র মার্গ্লোব ও রাটগার্স জাতের প্রচলন এদেশে সর্বাধিক। বাংলাদেশে অক্সহার্ট জাতও বেশ জনপ্রিয়

(২) **জাপানি জাত** : সিনকুরিহারা (Sinkurihara), মৌনোয়াচি (Monowachi), ও সিকাইচি (Sekaichi), ইতালীয় সান মার্জানো (San Marzano) জাত এবং পিয়ার্সন (Pearson) জাত।

(৩) **স্থানীয় জাত** : রাজশাহী, বিকোমা,রুমা লাঠিম টমেটো।

(৪) **বারি টমেটো উৎপাদন প্রযুক্তি** : এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো

মাটি : জৈব পদার্থপূর্ণ মাটিতে টমেটো ভালো জন্মে। টমেটো মাটি কিছুটা অম্লত্ব সহ্য করতে পারে। অধিক অম্লীয় মাটিতে চুন প্রয়োগ ফলন বৃদ্ধি পায়। টমেটোর জন্য দোঁআশ ও পলিদোঁআশ মাটি উত্তম।

জমি তৈরি : জমি ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হয়। গ্রীষ্মকালে টমেটো চাষের জন্য ২০-২৫ সেন্টিমিটার উঁচু এবং ১১০ চওড়া বীজতলা তৈরি করতে হয়। সেচ দেয়ার সুবিধার্থে দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেন্টিমিটার নালা রাখতে হয়।

চারা রোপণ ও দূরত্ব : ২৫-৩০ দিন বয়সের চারা প্রতিটি বীজতলায় ২ সারি করে ৭০×৩০ সেন্টিমিটার দূরত্বে লাগাতে হয়।

রোপণ সময় : নভেম্বর থেকে মধ্য জানুয়ারি।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি : টমেটো উৎপাদনের জন্য হেক্টর প্রতি নিম্নরূপ সার ব্যবহার করতে হয়।

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
সাধারণ গোবর	১০ টন
বা কম্পস্ট গুঁড়া	৫০০-৭০০ কেজি
ইউরিয়া	৫০০-৬০০ কেজি
টিএসপি	৩৫০-৪৫০ কেজি
এমপি	২০০-৩০০ কেজি
জিপসাম	১০০-২০০ কেজি
ডলোচুন (অম্লমাটি)	৩০০-৫০০ কেজি
দস্তা সার	২০-৩০ কেজি
বোরন সার	১০-১৫ কেজি

অর্ধেক গোবর ও টিএসপি শেষ চাষের সম জমিতে ছিটিয়ে দিতে হয়। অবশিষ্ট গোবর চারা লাগানোর পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া ও এমপি দুই কিস্তিতে পার্শ্বকুশি ছাঁটাই-এর পর চারা লাগানোর ৩য় ও ৫ম সপ্তাহে রিং পদ্ধতিতে দিতে হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা : প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তি সার প্রয়োগের পূর্বে পার্শ্বকুশিসহ মরা পাতা ছাঁটাই করে দিতে হয়। এতে কীটপতঙ্গ ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হয়। হরমোন প্রয়োগের সুবিধার্থে এবং প্রবল বাতাসে গাছ যাতে নুইয়ে না পড়ে– সেজন্য টমেটো গাছে ক্রইষ আকৃতির ঠেকনা দিতে হয়। ঠেকনা দেয়ার জন্য বাঁশের কঞ্চি বা ডাল ব্যবহার করা যেতে পারে। অতিরিক্ত ঘন হয়ে গেলে কিছু কিছু শাখা মুকুল ছাঁটাই

করতে হয়। তাছাড়া বেশ বড় আকারের ফল পাওয়ার উদ্দেশ্যে ফলের থোকা থেকে ক্ষুদ্রাকৃতির কিছু কিছু ফল ছিঁড়ে দেয়া যায়। টমেটোর জন্য ভেলি বেঁধে নালা পদ্ধতিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। অন্যান্য যত্নের মধ্যে মাঝে মাঝে আগাছা বাছাই ও মাটি আলগা করে দেয়া অন্যতম।

চাষের ধাপ : এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

(১) আবাদি টমেটোর চারা ২৫ থেকে ৩০ দিন ও বেগুনের চারা ৪০ থেকে ৪৫ দিন বয়সের হলে জোড়কলমের উপযুক্ত হয়।
(২) ৪ থেকে ৫ পাতাবিশিষ্ট বন বেগুনের চারা ৬০ থেকে ৭০ দিনের হলে জোড়কলম করার উপযুক্ত হয়।
(৩) টমেটো বা বেগুনের চারা শিকড়ের মাটি পরিষ্কার করে একটি পাত্রে গোড়া ডুবিয়ে রাখতে হয়।
(৪) শীত বনবেগুনের চারা ২ থেকে ৩ পাতাসহ মাথার উপরের অংশ কেটে ফেলতে হয়।
(৫) কাণ্ডের কাটা অংশে প্রায় ১ সেন্টিমিটার গভীর করে সমান দু'ভাগে লম্বালম্বি কাটতে হয়।
(৬) এরপর আবাদি টমেটো বা বেগুনের চারা মাথার উপরের অংশের প্রায় ৫ সেন্টিমিটার কেটে বড় পাতা ফেলে দিতে হয়।
(৭) কাটা অংশের নিচের দু'পাশ থেকে প্রায় ১ সেন্টিমিটার লম্বা করে আড়াআড়িভাবে কেটে ইংরেজি ভি অক্ষরের মতো তৈরি করতে হয়।
(৮) তারপর টমেটো বা বেগুনের এর ন্যায় মাথাটি (উপজোড়) বন বেগুন চারার কাটা স্থানে (আদিজোড়) সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দিতে হয়।
(৯) পরবর্তীতে পলিথিন ফিতা দিয়ে ভালোভাবে আটকে দিতে হয়।
(১০) পলিথিন ফিতা দিয়ে বাঁধার পর গাছের উপরের অংশে পানি ছিটিয়ে দিতে হয়।
(১১) কলম করার কাজ বিকালে করাই ভালো।
(১২) কলম করা গাছ ঘরে রেখে প্রথমে পলিথিন ও তার উপরে কাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।
(১৩) কলম করার পর ৭ দিন প্রতি দিনে ৩ থেকে ৪ বার পানি ছিটিয়ে দিয়ে আবার ঢেকে রাখতে হয়।
(১৪) বৃষ্টি না হলে রাতে আচ্ছাদান খুলে রাখা ভালো।
(১৫) দিনে গাছ ঢেকে রাখতে হয়, এতে গাছ সতেজ থাকে
(১৬) ৭ দিন অতিক্রম করার পর পলিথিন সরিয়ে কাপড় দিয়ে পরবর্তী ৭দিন গাছগুলো ঢেকে রাখতে হয়।
(১৭) প্রখর রোদে গাছ ঢেকে রাখা আবশ্যক।
(১৮) কলম করার ১৫ থেকে ২০ দিন পর গাছ মাঠে লাগানোর উপযুক্ত হয়।
(১৯) মাঠে কলমের চারা লাগানোর ৭ থেকে ১০ দিন পর বন বেগুনের গাছের গজানো ডালপালা কেটে দিতে হয়।

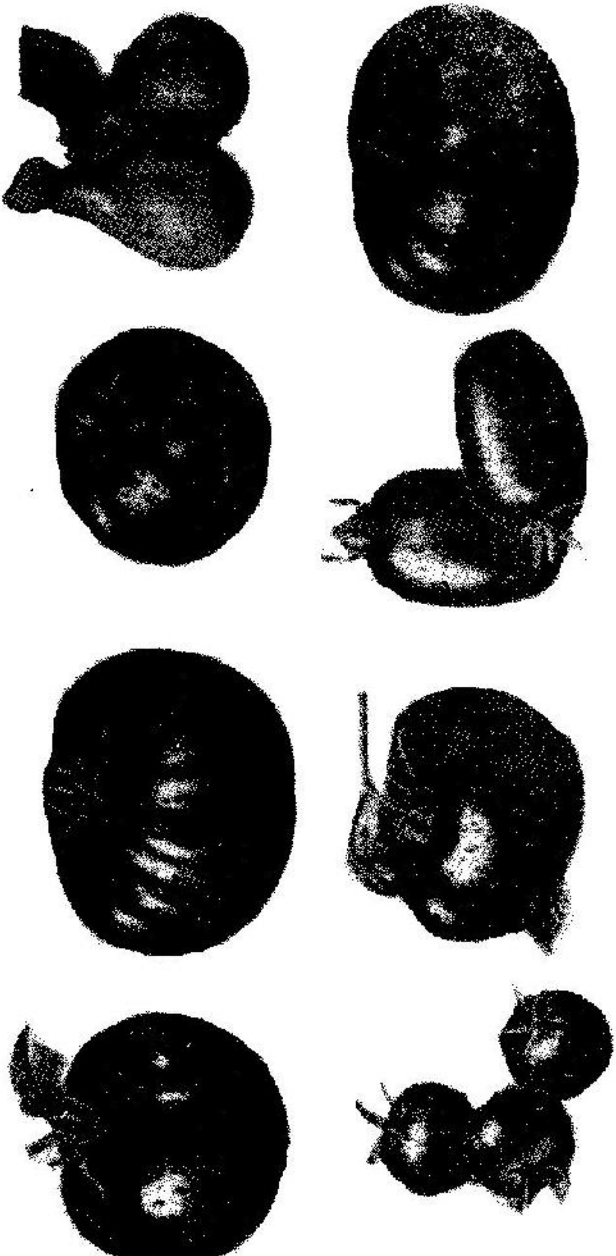

চিত্র ৮.৩ : বিভিন্ন প্রজাতির টমেটো

(২০) চারা মাঠে লাগানোর ১৫ থেকে ২০ দিন পরে পলিথিনের বাঁধন খুলে দেয়া আবশ্যক।

(২১) জোড়কলম করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি এক ধরনের ছোট ক্লিপ আদিজোড় ও উপজোড় আটকানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

পোকা দমন : শোষক পোকা এবং জাবপোকা গাছের রস শোষণ করে। শোষক পোকা দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন, সেভিন কিংবা নেক্সিয়ন এবং জাবপোকা দমনের জন্য এফিডান ডাস্টিং (৫%), কিংবা সেফস, নেক্সিয়ন ও ডাইব্রম ব্যবহার করতে হয়।

রোগ দমন : টমেটোর তিনটি রোগ গুরুত্বপূর্ণ। ঢলেপড়া রোগ, টমেটো মোজাইক ভাইরাস এবং ফিউজেরিয়াম উইল্ট। ঢলে-পড়া রোগে গাছে ফুল আসার আগেই ঢলে পড়ে। এ রোগে আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করা, আক্রান্ত জমিতে পরবর্তী ৪-৫ বছর টমেটো, আলু, মরিচ ও বেগুন চাষ না করা এবং প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা। মোজাইক রোগে পাতা কুঁকড়ে যায়, গাছ ও ফলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এ জন্য আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করতে হয়। সুস্থ গাছে কীটনাশক ওষুধ ছিটানোর ব্যবস্থা দ্বারা ভাইরাস বহনকারী পোকার আগমন প্রতিরোধ করতে হয়। ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগে গাছ ঢলে পড়ে। পাতা হলুদাভ হয় এবং পাতা ভিতরের দিকে বেঁকে আসে। এ রোগ মাটির মাধ্যমে ছড়ায়। এ রোগে আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করতে হয়।

শস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : রোপণের ২ থেকে ৩ মাস পর থেকে ফল সংগ্রহ করা শুরু করা যায়। রঙিন নয় এরূপ টমেটো ১০ থেকে ১৫.৫° সেঃ তাপে ৩০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। পাকা টমেটো ৫০° সেঃ তাপে ১০ দিন পর্যন্ত রাখা যায়। বাংলাদেশে টমেটো উৎপাদন অগ্রবর্তী জেলা চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, ঢাকা, যশোর, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর।

৮.২.৪. **গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন টমেটো উৎপাদন প্রযুক্তি :** গ্রীষ্ম ও বর্ষকালে টমেটো চাষ করার জন্যে প্রধান প্রধান জাত হচ্ছে বিনাটমেটো ৩, বিনাটমেটো ৪, বারিটমেটো ৪, বারিটমেটো ৫ এবং বারিটমেটো ৬ (চৈতী)।

(১) পলিথিনের ছাউনিতে এসব জাত চাষ করতে হয়।

(২) একটি ছাউনি ২০ মি. × ২.৩ মি. আকৃতি হয়।

(৩) ৯০ সেন্টিমিটার চওড়া দুটি বীজতলায় লম্বালম্বিভাবে একটি করে ছাউনির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৪) ছাউনির খুঁটির উভয় পাশের উচ্চতা ১৫০ সেন্টিমিটার এবং মাঝখানের খুঁটির উচ্চতা ২১০ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে।

(৫) জমিকে নৌকার ছইয়ের আকৃতি করে পলিথিন দিয়ে ছাউনি দিতে হয়।

(৬) দুটি ছাউনির মধ্যে ৭৫ সেন্টিমিটার চওড়া নিকাশ নালা রাখতে হয়।

(৭) প্রতিটি ছাউনিতে দুটি বীজতলা রাখতে হয়।

(৮) জমি থেকে বীজতলার উচ্চতা ২০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার হতে হয়।

(৯) দুটি বীজতলার মাঝে ৩০ সেন্টিমিটার চওড়া নালা রাখতে হয়।

(১০) প্রতিটি ছাউনিতে ৪টি সারি রাখতে হয়।

(১১) ২৫-৩০ দিন বয়সের চারা প্রতি বেডে ২ সারিতে রোপণ করতে হয়।

(১২) সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪০ সেন্টিমিটার রাখতে হয়।

(১৩) গ্রীষ্মকালীন টমেটোর জন্য টমাটোটোন নামক হরমোন প্রয়োগের প্রয়োজন হয়

(১৪) হ্যান্ড স্প্রেয়ারের সাহায্যে ৫ চা চামচ (প্রতি লিটার পানিতে) টমাটোটোন শুধু ফুটন্ত ফুলে ৮ থেকে ১০ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হয়।

(১৫) এ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে সারা বছর টমাটো চাষ করা সম্ভব।

(১৬) গ্রীষ্ম মৌসুমে টমাটোটোন দ্বারা উৎপাদিত ফলে বীজ হয় না।

৮.২.৫. টমেটো ও বেগুনের জোড়কলম উৎপাদন : ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলেপড়া রোগ ও শিকড়ের গিঁট রোগ আগাম টমেটো চাষ ব্যাহত করে। মাটিবাহিত এ রোগ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য বন বেগুনের উপর জোড়কলমের মাধ্যমে টমেটো চাষ করা যায়। উচ্চতর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। আদি জোড়গাছ হিসেবে ব্যবহার করা ভালো।

নবম অধ্যায়

কুমড়াজাতীয় সবজি

৯.০. চাল কুমড়া

চাল কুমড়া সম্ভবত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কোনো স্থানে উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে এ অঞ্চলেই চাল কুমড়ার চাষ হয়ে আসছে প্রাচীন ভারতীয় ও চীনা সাহিত্যে এর উল্লেখ আছে ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের জঙ্গলে চাল কুমড়া জন্মে থাকে।

৯.১. চাল কুমড়ার উদ্ভিদতত্ত্ব

চাল কুমড়ার বৈজ্ঞানিক নাম *Benincasa hispida*. এর ক্রোমোজম সংখ্যা ১২ জোড়া. ইংরেজি ভাষায় এটি বিভিন্ন নামে পরিচিত যথা– Ash gourd, white gourd ইত্যাদি। বাংলায় এর একাধিক নাম রয়েছে যেমন– চাল কুমড়া, জালি কুমড়া, সাদা কুমড়া, চুনা কুমড়া ইত্যাদি। বাংলাদেশে কুমড়া অবশ্য চাল কুমড়া নামেই সমধিক পরিচিত।

উদ্ভিদ : কুমড়া এক ধরনের কোমল কাণ্ডবিশিষ্ট বর্ষজীবী লতানো উদ্ভিদ।

শিকড় : শিকড় অগভীর।

কাণ্ড : কাণ্ড দৃঢ় হালকা, সবুজ, অগভীর খাঁজবিশিষ্ট এবং লোমে আবৃত। গাছের গোড়ার দিকের পর্ব থেকে কয়েকটি প্রধান প্রধান শাখা বের হয় এবং এগুলো ক্রমে প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বিস্তার লাভ করে।

পাতা : পাতা সরল, বোঁটা ১০-২০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ কম-বেশি গোলাকার, সাতকোণী, দৈর্ঘ্যে ১০-২০ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ১০-২৫ সেন্টিমিটার; ফলকের কিনারা দন্তুর ; পাতা লোমাবৃত।

ফুল : চাল কুমড়ার সব জাতই একবাসী অর্থাৎ একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদাভাবে উৎপন্ন হয়। স্ত্রী ও পুরুষ ফুল সবসময় একাকী এবং এগুলো ভিন্ন পত্রকক্ষে উৎপন্ন হয়।

গাছের গোড়া থেকে বিশ ও ত্রিশ নম্বর পর্বের মধ্যে প্রথম ফুল উৎপন্ন হয় এবং প্রথম দিকে উৎপাদিত কয়েকটি ফুল পুরুষ জাতের হয়ে থাকে চাল কুমড়ার ফুল সাধারণত ভোরে প্রস্ফুটিত হয়। গাছে স্ত্রী ফুল অপেক্ষা পুরুষ ফুলের সংখ্যা অনেক বেশি। চাল কুমড়ার ফুল হলুদ রঙের এবং আকারে বৃহৎ। ফুলে পাঁচটি করে বৃতাংশ ও পাঁপড়ি থাকে। পুরুষ ফুলে ৩টি পুংকেশর থাকে। স্ত্রী ফুলের ডিম্বাধার লোমশ, এর উপরে একটি পুরু গর্ভদণ্ড এবং গর্ভদণ্ডের অগ্রভাগে তিনটি গর্ভমুণ্ড থাকে। পুরুষ ফুলের বৃন্ত স্ত্রী ফুলের বৃন্ত অপেক্ষা দীর্ঘ হয়।

ফল : চাল কুমড়ার ফল আয়ত গোলাকার. কচি অবস্থায় ফল তীক্ষ্ণ সাদা লোমে আবৃত থাকে কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে এসব লোম ঝরে পড়ে এবং ফলের

উপরিভাগে সাদা মোমের একটি স্তর সৃষ্টি হয়। ঘর্ষণ দিলে এ মোম সহজে উঠে আসে। একটি পরিণত বয়স্ক ফল ওজনে ১৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

৯.১.১. চাল কুমড়ার জাত

বাংলাদেশে চাল কুমড়ার বিভিন্ন জাত রয়েছে, তবে জাতসমূহের বৈশিষ্ট্য সুনির্দিষ্ট নয়। উদ্ভিদের লতানোর মাত্রা, ফলের আকৃতি ও আকার ইত্যাদি ব্যাপারে জাতসমূহের মধ্যে কিছু বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশে কুমড়ার কোনো অনুমোদিত জাত নেই। চাল কুমড়ার সাধারণ জাতের মধ্যে রয়েছে–

ক. ডিম্বাকার জাত ও
খ. লম্বাটে জাত

৯.১.২. পরিবেশগত চাহিদা

চাল কুমড়ার জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু প্রয়োজন। তাপমাত্রা ১৫° সে. এর নিচে চলে গেলে গাছের দৈহিক বৃদ্ধির হার কমে আসে। আলোর অভাবে ফল উৎপাদন বিঘ্নিত হয়। সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটিতে চাল কুমড়ার চাষ করা যায়।

বর্ষার সময় চাষ হয় বলে ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য এঁটেল মাটি নিষ্কাশিত হওয়া দরকার।

৯.১.৩. চাল কুমড়ার উৎপাদন প্রযুক্তি

বীজ বপন সময় : কুমড়া খরিফ মৌসুমের সবজি। ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। মে মাসের পরও এর চাষ সম্ভব তবে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

চিত্র ৯.১ : মাদায় সবজি বীজ বপন পদ্ধতি

মাদা বা জমি তৈরি ও বীজ বপন : পারিবারিক বাগানে চাল কুমড়ার চাষ করতে হলে মাদায় বীজ বুনে গাছ মাচা, ঘরের চাল কিংবা কোনো বৃক্ষের উপর তুলে দেওয়া যায়।

বাণিজ্যিকভাবে চাষের ক্ষেত্রে প্রথমে ভালোভাবে জমি তৈরি করে মাদায় অথবা সারিতে বীজ বুনতে হয়। মাদা ৪-৫ মিটার ব্যবধানে বসানো যায়। প্রতি মাদায় ২-৩টি গাছ রাখতে হয়।

বীজ বপনের হার : প্রতি আইল ৫ গ্রাম।

বীজ বপনের সময় : মার্চ-মে মাস।

বীজ বপন : মাদায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ মৌল সার দিয়ে ভালোভাবে মাদা তৈরি করার পর প্রতি মাদায় ৩-৪টি করে বীজ বপন করতে হয়।

বীজ বপনের গভীরতা : ১.৫-২ সেন্টিমিটার।

অঙ্কুরোদ্গমের সময়কাল : ৫-৭ দিন।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ : মাদা প্রতি নিম্নবর্ণিত সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন

সার প্রয়োগ সময়	সারের নাম ও পরিমাণ			
	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)
মাদা তৈরির সময় : বীজ বপনের ৭-১০ দিন পূর্বে	২	-	৫০	-
১ম উপরি প্রয়োগ : চারা গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর	-	১৫	-	১৫
২য় উপরি প্রয়োগ : চারা গজানোর ৪৫-৫০ দিন পর	-	১৫	-	১৫

সারের উপরিপ্রয়োগ : সময়মতো সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

সেচ : ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে আইলের মাটির অবস্থা বুঝে মাদা বা উঁচু জায়গায় সেচ প্রদান করতে হয়।

গাছ পাতলাকরণ : চারা ১০-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা হলে প্রত্যেক মাদা বা উঁচু জায়গায় ১টি করে সুস্থ-সবল চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হয়।

শূন্যস্থান পূরণ : কোনো কারণে চারা মারা গেলে সেখানে নতুন করে সেই একই বয়সের চারা রোপণ অথবা বীজ বপন করতে হয়।

বাউনি বা মাচা দেয়া : গাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে বাউনি এবং ছোট করে মাচা দিতে হয়।

৯.১.৪. কুমড়ার যৌন অভিব্যক্তি ও যৌনরূপ : ফুল ধরার ব্যাপারে কুমড়া গোত্রের উদ্ভিদ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এরা ভিন্ন প্রকার ফুল উৎপাদন করে, যথা- স্ত্রী ফুল ও দ্বি-লিঙ্গিক ফুল। একই গাছে সুনির্দিষ্ট প্রকারের ফুল থাকার কারণে বিভিন্ন

যৌনরূপের সৃষ্টি হয়। যৌনরূপ অনুযায়ী কুমড়া গোত্রের উদ্ভিদসমূহকে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

উভয় লিঙ্গ (Hermaphrodite) : গাছের সব ফুল দ্বি-লিঙ্গিক, এ যৌনরূপ বিরল, কেলব, লাফা, কুকুমিস ও বেনিনকাসা গণের কয়েকটি জাতে দেখা যায়।

এক লিঙ্গ (Monoecious) : একই উদ্ভিদের পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা উৎপন্ন হয় এটাই প্রধান যৌনরূপ এবং সর্বাধিক সংখ্যক প্রজাতিতে বিদ্যমান।

পুরুষ দ্বি-লিঙ্গিক (Andromonceous) : একই গাছে পুরুষ ও দ্বি-লিঙ্গিক ফুল থাকে।

স্ত্রী দ্বি-লিঙ্গিক (Gynomoecious) : একই গাছে স্ত্রী ও দ্বি-লিঙ্গিক ফুল থাকে

সকল লিঙ্গিক (Androgynomonoecious) : একই গাছে পুরুষ স্ত্রী এবং দ্বি-লিঙ্গিক ফুল পাওয়া যায়।

ভিন্নবাসী (Dioecoius) : পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে উৎপন্ন হয়। পুরুষ ফুলধারী গাছকে এন্ড্রোসিয়াস এবং স্ত্রী ফুলধারী গাছকে গাইনোসিয়াম উদ্ভিদ বলা হয় গাইনো ডায়োসিয়াস প্রজাতিসমূহে কিছু কিছু জাত আছে যাতে কয়েকটি উদ্ভিদ কেবল স্ত্রী ফুল এবং কয়েকটি কেবল দ্বি-লিঙ্গিক ফুল উৎপাদন করে। সাবগাইনোসিয়াম ডায়োসিয়াস প্রজাতির স্ত্রী গাছ কিছু সংখ্যক পুরুষ অথবা দ্বি-লিঙ্গিক ফুল উৎপাদন করে। কুমড়া গোত্রে মনোসিয়াস প্রজাতির সংখ্যা সর্বাধিক। এ পর্যন্ত ২০টি গণে ২০টি ডায়োসিয়াস প্রজাতি লিপিবদ্ধ হয়েছে। উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি ও ফুল আসার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট ধরন লক্ষ্য করা যায়। লতানো জাতসমূহের (কুমড়া) প্রধান কাণ্ড প্রথমে কয়েকটি প্রাথমিক শাখায় বিভক্ত হয়, শাখাসমূহ ক্রমে শাখা ও উপশাখায় বিস্তার লাভ করে। এক-লিঙ্গী জাতসমূহে উদ্ভিদ প্রথমে কয়েকটি পুরুষ ফুলে উৎপাদন করে তারপর পুরুষ ও স্ত্রী ফুল একই সময়ে উৎপন্ন হয় এবং শেষে দিকে অধিক সংখ্যায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে কেবল স্ত্রী ফুল উৎপাদনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রতিটি গাছ জীবনকালে যতগুলো ফুল উৎপাদন করে তা বেশিরভাগই পুরুষ জাতে। পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের অনুপাতকে যৌন অনুপাত বলা হয়। প্রজাতির জাত ও পরিবেশ অনুযায়ী পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের অনুপাত ৪ ঃ ১ থেকে শুরু করে ৬০ ঃ ১ পর্যন্ত হতে পারে।

৯.১.৫. যৌন অভিব্যক্তির পরিবহণ : স্বাভাবিক অবস্থায় কুমড়া গোত্রের উদ্ভিদের যৌন অভিব্যক্তি তথা, ফুল ধরার আগামত্ব, ফুলের প্রকার ও সংখ্যা যৌন অনুপাত ইত্যাদিও এ পরিবেশের নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে উদ্ভিদে বিভিন্ন দ্রব্য প্রয়োগ করে এবং পরিবেশিক অবস্থার পরিবর্তন নিয়ে যৌন অভিব্যক্তির পরিবর্তন সম্ভব। উদ্ভিদের ফুল ধরার বিষয়ে ভিন্ন হরমোনের ভূমিকা আজকাল প্রমাণিত। উদ্ভিদ দেহে স্বাভাবিকভাবে যেসব হরমোন ভূমিকা রাখে সেগুলো হলো– অক্সিন (Auxin), জিবেরেলিন (Gibberellin) সাইটোকাইনিন (Cytokinin), ইথিলিন (Ethylene), অ্যাবসিসিক এসিড (Abscisic acid) উল্লেখযোগ্য ফুল ধরার বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভিদ দেহে বিভিন্ন হরমোনের পরিমাণ পরিমাপ করে এবং উদ্ভিদের অঙ্গে প্রয়োগ করে ফুল উৎপাদনে সফলতা আনা যায়

৯.১.৫.১. পরাগায়ন ও ফল ধারণ : ভিন্নবাসী জাতসমূহে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে থাকার কারণে ফল ধারণের জন্য পর-পরাগায়ন অপরিহার্য। একবাসী জাতে

একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতি সবসময়ই পর-পরাগায়নের সহায়ক হয় না। কুমড়া গোত্রের সব উদ্ভিদেরই পরাগ ভারী ও চটচটে, যে কারণে দ্বি-লিঙ্গিক ফুলও পরাগায়নের জন্যে পোকার সহায়তা প্রয়োজন হয়। পোকা আকৃষ্ট করার জন্য সব প্রজাতির ফুলই বৃহৎ ও বর্ণে উজ্জ্বল। মৌমাছিজাতীয় পোকা পরাগায়ন ঘটিয়ে থাকে প্রচুর স্ত্রী-ফুল থাকা সত্ত্বেও আশানুরূপ ফল উৎপাদিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকরভাবে পরাগায়ন না হওয়া এজন্য দায়ী। এসব ক্ষেত্রে কৃত্রিম পরাগায়নের মাধ্যমে ফল ধারণ বৃদ্ধি করা যায়। পরাগায়ন অসম্পূর্ণ হলে ফলের আকৃতি অনিয়মিত হতে পারে।

৯.১.৬. পোকা দমন

ফলের মাছি পোকা : এ পোকার কীড়া ফল ছিদ্র করে ঢুকে ফলের ভিতরের অংশ খেয়ে নষ্ট করে দেয়।

লাল কুমড়া বিটল : চারা গাছের জন্য এ পোকা ক্ষতিকর।

ইপিল্যাকনা বিটল : পূর্ণবয়স্ক পোকা ও গ্রাব পাতার সবুজ অংশ খেয়ে শুধু পাতার শিরা বাদ রেখে দেয়। আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে মরে যায়।

লাল মাকড় : এক ধরনের খুব ছোট মাকড় পাতার নিচে থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। যার ফলে পাতা কুঁকড়িয়ে যায় এবং পরে পাতাটি হলুদ হয়ে মরে যায়।

৯.১.৭. রোগ দমন

পাউডারি মিলডিউ : পাতার উপরে সাদা সাদা পাউডার দেখা যায় যা পাতা নষ্ট করে দেয়।

ডাউনি মিলডিউ : পাতার নিচে ধূসর বেগুনি রঙ ধারণ করে। আক্রান্ত পাতা ও গাছ দুর্বল হয়ে মারা যায়।

ফসল সংগ্রহ : বীজ বপনের ২-৩ মাস পর থেকে ফসল সংগ্রহ শুরু করা যায়।

ফলন : প্রতি আইলে ৪০-৫০ কেজি।

ফসল সংগ্রহ ও বীজ উৎপাদন : বীজ বোনার দু'মাসের মধ্যে চাল কুমড়ার গাছে ফল আসা শুরু করে এবং ৬০–৭৫ দিন পর্যন্ত ফল দিতে থাকে। পরাগায়নের ১০-১৫ দিনের মধ্যে ফল সবজি হিসেবে খাওয়ার উপযোগী হয়।

সবজি হিসেবে ব্যবহার করতে হলে ওজন আধা কেজি হতে না হতেই ফল সংগ্রহ করা দরকার। কিছু সংখ্যক ফল পাকাতে চাইলে শেষের দিকে উৎপাদিত ফল গাছে রেখে দিতে হয় কচি ফল সংগ্রহ করা হলে চাল কুমড়ার প্রতি ফলন ১৫টন পর্যন্ত হওয়া সম্ভব

বীজ উৎপাদন : চাল কুমড়ার বীজ উৎপাদন সহজ। পরপরাগায়নের আশঙ্কা থাকলে বীজের জন্য কৃত্রিম পরাগায়ন করে ফল উৎপাদন করা যায়। বীজ উৎপাদন করতে হলে ফুলের পরাগায়নের প্রায় ৫০ দিন পর ফল সংগ্রহ করতে হয়।

৯.২. মিষ্টি কুমড়া

আমেরিকার নিরক্ষীয় এবং উপ-নিরক্ষীয় এলাকা মিষ্টিকুমড়া উৎপত্তি হিসেবে বিবেচিত বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় মিষ্টিকুমড়া, মিষ্টি লাউ, মিষ্টি কদু, আউসি কদু, মাটি কদু,

কুমোড় ইত্যাদি নামে পরিচিত। *Cucurbita* গণে ২৭টি প্রজাতি রয়েছে, এর মধ্যে পাঁচটি চাষাধীন ফসল যথা– *C. moschata, C. pepo, C. mixitapang* এবং *C. ficifolia.* বাকিগুলো বন্য। বন্য প্রজাতির মধ্যে কিছুসংখ্যক মরু উদ্ভিদ এবং কিছু সংখ্যক দীর্ঘজীবী রয়েছে

৯.২.১. মিষ্টি কুমড়ার উদ্ভিদতত্ত্ব

মিষ্টি কুমড়ার বৈজ্ঞানিক নাম *Cucurbita pepo* অথবা *C. moschata.* এটি *Cucurbitaceae* গোত্রের উদ্ভিদ। পাকা অবস্থায় বহু দিন পর্যন্ত ঘরে রাখা যায় অসময়ে তরকারিরূপে ব্যবহৃত হতে পারে বলে এর চাষ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এলাকা : বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ৯ হাজার হেক্টর জমিতে প্রায় ২৯ হাজার টন মিষ্টি কুমড়া উৎপন্ন হয়। বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বগুড়া ও রংপুর প্রধান মিষ্টি কুমড়া উৎপাদনশীল জেলা গ্রীষ্মকালে রংপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও খুলনাতে যথেষ্ট কুমড়া উৎপাদিত হয়।

দৈহিক গঠন : উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মিষ্টি কুমড়ার জাতসমূহের মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য রয়েছে। জাতসমূহ মূলত দু'রকমের। যথা– ঝোপালো ও লতানো ঝোপালো জাতগুলো কেবল পেপো এবং ম্যাক্সিমো প্রজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

শিকড় : লাউয়ের শিকড় যথেষ্ট বিস্তৃত, বাঁধা না পেলে মাটির গভীরে দেড় মিটার পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে, তবে অধিকাংশ শাখা-শিকড় অগভীর এবং উপরের ৮ সেন্টিমিটারের মধ্যে অবস্থান করে। ঝোপালো জাতের শিকড় অপেক্ষাকৃত বেশি তেজী ও দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কাণ্ড : জাত অনুযায়ী মিষ্টি কুমড়ার কাণ্ড কোমল অথবা শক্ত শুঁড়ধারী অথবা শুঁড়হীন শলাকার অথবা লম্বালম্বি খাদ অথবা কোণবিশিষ্ট হতে পারে। অনুকূল পরিবেশে লতানো জাতের কাণ্ডের মোট দৈর্ঘ্য ১৫ মিটারের বেশি হয়ে থাকে।

পাতা : পাতা সরল, ফাঁপা বোঁটাধারী এবং লোমাবৃত। প্রজাতির পাতা কিছুটা ত্রিভুজাকার, ফলকের কিনারা ৩-৭ খণ্ডে বিভক্ত। ফলক ও বোঁটা কাটাবৎ লোমে আবৃত। লতানো জাতের পাতার কক্ষ থেকে দীর্ঘ শাখাবিশিষ্ট আকর্ষী বের হয় ঝোপালো জাতে আকর্ষী অনুপস্থিত।

ফুল : ফুল উজ্জ্বল হলদে কমলা রঙের। ফুলে ৫টি করে বৃত্যাংশ ও পাপড়ি থাকে। প্রস্ফুটিত ফুলের দলমণ্ডল ঘণ্টাকৃতির পুংকেশরের সংখ্যা ৩, এগুলোর পরাগধানী পরস্পরের সাথে যুক্ত। গর্ভকেশরে দুটি দ্বি-খণ্ডিত মুণ্ড থাকে। পুরুষ ও স্ত্রী উভয় প্রকার ফুল পুষ্পমধু উৎপাদন করে। ফুল ভোরবেলায় ফোটে।

ফল : মিষ্টি কুমড়ার ফল খুবই বৈচিত্র্যময়। জাত অনুযায়ী ফলের ওজন ১০০ গ্রাম থেকে ১৫০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফলের ত্বকের বর্ণ সাদা, হলুদ, কমলা, সোনালি, ধূসর হতে পারে, অনেক জাতে এটি একাধিক বর্ণেরও হতে পারে। ফলের উপরিভাগ সমতল, খাদালো, আঁচিলযুক্ত অথবা ভাঁজকৃত। আকৃতির দিক দিয়ে ফল মূলত গোলাকার, চ্যাপ্টা গোলাকার, লম্বাটে এবং নাশপাতি আকারের।

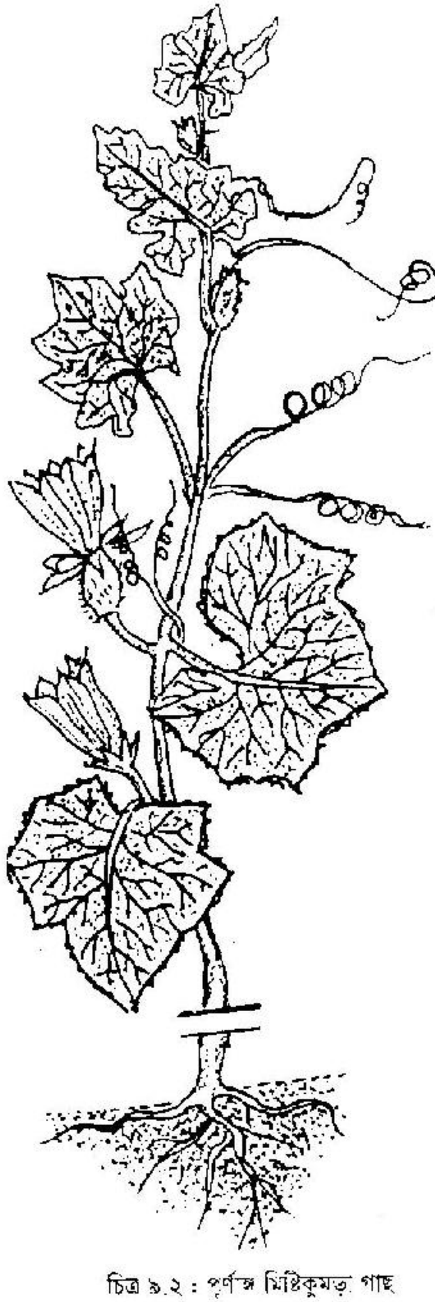

চিত্র ৯.২ : পূর্ণাঙ্গ মিষ্টিকুমড়া গাছ

৯.২.২. মিষ্টি কুমড়ার জাত

বাংলাদেশে মিষ্টিকুমড়া *C. moschata* প্রজাতিভুক্ত। এদেশে জাতের সংখ্যা খুব বেশি নয় এবং বিভিন্ন জাতের মধ্যে কৌলিক বিভিন্নতাও কম। এসব জাতের মধ্যে এলোমেলো পর-পরাগায়ন এবং ক্ষেত্রবিশেষে জিন পরিব্যক্তির মাধ্যমে ফলের আকার আকৃতি ও শাঁসের গুণাগুণে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানে কোনো কোনো খামারে সীমিতভাবে জুসিনি জাতের চাষ করা হয়। এর ফল দণ্ডাকার ও সবুজ এবং কচি অবস্থায় খাওয়া হয়। অধিকাংশ জাতের ত্বকে সবুজের মধ্যে হালকা বর্ণের দাগ থাকে

বহু আকার, আকৃতি ও বর্ণবিশিষ্ট কুমড়া রয়েছে। তবে উৎপাদনের সময় অনুসারে মিষ্টি কুমড়াকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। যথা–

ক. বৈশাখী (গ্রীষ্ম মৌসুম)

খ. হেমন্ত

গ. মাঘী (শীত মৌসুম)

বৈশাখী কুমড়ার বীজ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বপন করে মার্চ-মে মাসে, হেমন্ত বা বর্ষাতি কুমড়ার বীজ এপ্রিল-মে মাসে বপন করে জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে এবং মাঘী কুমড়ার বীজ জুলাই-আগস্ট মাসে বপন করে নভেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফসল সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৯.২.৩. জলবায়ু

মিষ্টি কুমড়ার জন্য শুষ্ক ও উষ্ণ জলবায়ু প্রয়োজন। উচ্চ ফলনের জন্য অন্তত ৮ মাসব্যাপী ১৫° থেকে ৩০° সেঃ তাপমাত্রা ও প্রচুর সূর্যের আলো প্রয়োজন। *C. moschata* ব্যতীত অন্যান্য প্রজাতির জাত আর্দ্র পরিবেশে সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। এ সব জাতের প্রায় সবই রবি মৌসুমে এবং অধিকাংশ রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমে জন্মানো যায়। অন্যান্য প্রজাতির বিদেশী জাত চাষ করতে হলে কেবল শুষ্ক মৌসুমেই ফসল লাগাতে হয়।

৯.২.৪. উৎপাদন পদ্ধতি

চাষের মৌসুম : বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বছরের যে কোনো সময় মিষ্টি কুমড়া বোনা যায়, তবে কৃষকরা সাধারণত রবি মৌসুমে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে জানুয়ারি এবং খরিফ মৌসুমে ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত সময়ে মিষ্টি কুমড়া চাষ করে থাকে।

জমি তৈরি ও বীজ বপন : অল্প পরিমাণে মিষ্টি কুমড়া উৎপাদন করতে হলে বাসগৃহের আশেপাশে ছায়াহীন স্থানে মাচা করে বীজ বোনা যেতে পারে। বাণিজ্য-ভিত্তিক চাষের ক্ষেত্রে প্রথমে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করে নির্দিষ্ট দূরত্বে মাচা তৈরি করে সারিতে বীজ বুনতে হয়। ঝোপালো জাতের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দুটি মাচার মধ্যে দু'মিটার দূরত্ব রাখা যেতে পারে, লতানো জাতে এটি ৩ থেকে ৪ মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বীজ রোপণ : বৈশাখী কুমড়ার জন্য ২.৪-২.৭ মিটার পর পর এবং অন্যান্য কুমড়ার জন্য ৩-৩.৬ মিটার পর পর মাচা তৈরি করা যেতে পারে। মাচা তৈরি করতে (৮০×৮০×৮০ ঘন সেন্টিমিটার) গর্ত করলে ভালো হয়। এক একটি মাচায় প্রথমে ৮-

৭টি বীজ বুনতে হয়, পরে চারা অবস্থায় ২টি করে ভালো চারা রাখলেই চলে। হেক্টরপ্রতি ১.২-১.৯ কেজি বীজের প্রয়োজন। বৈশাখী কুমড়ার লতা ভূমিতে বাইতে দেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য কুমড়ার জন্য মাচার আবশ্যক হয়।

সার প্রয়োগ : কুমড়ার জন্য হেক্টর প্রতি ৫ টন গোবর সার, ৩৫০-৪০০ কেজি খৈল, ১২০-১৩০ কেজি ইউরিয়া, ১৫০-১৭৫ কেজি টি.এস.পি. এবং ১২০-১৩০ কেজি এমপি দরকার। গোবর সার, ছাই, খৈল ও ট্রিপল সুপার ফসফেট গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভর্তি করে ১০-১২ দিন পরে মাচায় বীজ বপন করতে হয়। চারা ২৫-৩০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ হওয়ার পরে মাচার চতুর্দিক দিয়ে একটি অগভীর নালা কেটে নালার মাটির সাথে ইউরিয়া সার মিশিয়ে নালা ভর্তি করে দিতে হয়। মিউরিয়েট অব পটাশ সার ইউরিয়ার সাথে প্রয়োগ করতে হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা : শুষ্ক মৌসুমে মিষ্টি কুমড়ার চাষ করা হলে অধিকাংশ স্থানে সেচের প্রয়োজন হয়। বর্ষাকালে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাউনির উপর কাণ্ড তুলে দিলে ফলন বেশি ও ফুলের গুণ ভালো হয়, কিন্তু বাউনির খরচ বেড়ে যাওয়াতে এর অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করতে হয়। জমির ফসল হিসেবে লতানো জাতের চাষ করা হলে ফল ধরার সময় ফলের নিচে কিছু খড়কুঁটো বিছিয়ে দেয়া ভালো যাতে মাটির সংস্পর্শে এসে ফল রোগাক্রান্ত না হয়।

কৃত্রিম পরাগায়নের জন্য ভোরে পুরুষ ফুলের পরাগধানী হাতে নিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে আস্তে করে ঘষে দিতে হয়। কোনো কোনো সময় ফ্রুট ফ্লাই নামক পোকা ফল ধরণে সমস্যা সৃষ্টি করে। ওষুধ দিয়ে এ পোকা দমন করতে না পারলে ফোটার পূর্ব থেকে ফল অনেকটা বড় না হওয়া পর্যন্ত কাপড় অথবা পলিথিনের পোঁটলা দিয়ে ঢেকে রাখলে উপকার পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কৃত্রিম পরাগায়নের প্রয়োজন হয়।

গাছ ছাঁটাই : অনেক সময় গাছের অতিরিক্ত বৃদ্ধির জন্য কুমড়ার ফলন কম হয়। এরূপ অবস্থায় গাছের কিছু লতা পাতা কেটে দেয়া যেতে পারে।

পরাগায়ন সমস্যা : কখনও কখনও ফুল হতে কুমড়া বের হওয়ার পর শুকিয়ে যায়, কিংবা ঝরে যায়। মাটিতে টি.এস.পি. সার প্রয়োগ করা এবং প্রত্যুষে ফুল ফোটার পর পুংজাতীয় ফুলের মুণ্ড ফল প্রদানকারী পুষ্পের গর্ভকেশরের গায়ে বুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

পোকা দমন : কুমড়াজাতীয় গাছের বিভিন্ন পোকার মধ্যে লালপোকা কাঁটালে পোকা এবং ফলের মাছি উল্লেখযোগ্য। এ পোকা দমনের জন্য সেভিন (১০%), ডাস্টিং কিংবা নেক্সিয়ান (০.৫%) এবং ডায়াজিনন (০.৭%)-এর স্প্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ফলের মাছির কীড়া কচি ফলে ছিদ্র করে প্রবেশ করে। এতে আক্রান্ত স্থান পচে যায় কিংবা সে অংশের বৃদ্ধি থেমে যায়। এ পোকা দমনের জন্য মাঝে মাঝে ডিপ্টারেক্স, নেক্সিয়ন বা ডাইব্রোম ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোগ দমন : কুমড়াজাতীয় গাছের রোগের মধ্যে পাউডারি মিলডিউ, ডাউনি মিলডিউ ও এনথ্রোকনোজ প্রধান। দুই সপ্তাহ পর পর ডায়াথেন বা পার্জেট স্প্রে করা যেতে পারে। প্রতিষেধক রূপে ১০০ গ্যালন গরম পানিতে এক কেজি জাইনের মিশ্রিত করে বীজ শোধন করা উত্তম।

ফসল সংগ্রহ : কোনো অসুবিধা না থাকলে খাওয়ার উপযোগী হওয়া মাত্রই ফল সংগ্রহ করা। সংরক্ষণ করতে হলে সম্পূর্ণ পাকার পর ফল সংগ্রহ করতে হয়। পরিপক্ব হওয়ার সাথে সাথে ফল হলুদ বা কমলা রঙ ধারণ করে।

ফলন : হেক্টর প্রতি ৮-১০ টন ফলন পাওয়া যায়।

৯.২.৫. জাত উন্নয়ন ও বীজ উৎপাদন

জাত উন্নয়ন : জাত উন্নয়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে দেশের ভিতরে ও বাইরে থেকে *C. moschata* প্রজাতির বিভিন্ন জাত এনে মূল্যায়নের মাধ্যমে উন্নত জাত খুঁজে বের করা যেতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে নির্বাচিত প্যারেন্ট জাতের মধ্যে সঙ্করায়ন করে উন্নততর জাত উদ্ভাবনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়।

বীজ উৎপাদন : কুমড়া গোত্রের সবজির উৎকৃষ্ট মানের বীজ উৎপাদন বেশ কষ্টসাধ্য ফলের বিশেষ গঠন এবং পরাগায়নের বিশেষ ধরনই এর কারণ। প্রজাতিসমূহের মধ্যে অধিকাংশই একবাসী, মাত্র কয়েকটি পুং-একবাসী। কোনো কোনো প্রজাতিতে দ্বি-লিঙ্গিক ফুলধারী জাত থাকলেও এগুলোর সংখ্যা নগণ্য। একবাসী উদ্ভিদে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা উৎপন্ন হয় এবং স্ত্রী ফুলের পরাগায়নের জন্য পরাগ একই গাছ থেকে অথবা ভিন্ন গাছ থেকে আসতে পারে। পুং-একবাসী উদ্ভিদে দ্বি-লিঙ্গিক ফুল থাকলেও পোকার সাহায্য ছাড়া পরাগায়ন ঘটে না; এ ক্ষেত্রেও পর-পরাগায়নের সম্ভাবনা বেশি এজন্য জাতের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে হলে বীজ ফসলের স্বতন্ত্রীকরণ আবশ্যক।

বাংলাদেশে এখনও বৃহৎ আকারে কুমড়া গোত্রের সবজির বীজ উৎপাদন করা হয় না। অধিকাংশ কৃষক নিজ নিজ ফসলের ক্ষেত থেকে কয়েকটি পাকা ফল সংগ্রহ করে বীজ রেখে পরবর্তীতে ব্যবহার করেন। এরকম পরিস্থিতিতে যদি একই গাছের পরাগ দিয়ে স্ত্রী ফুল পরাগায়িত করে তদুৎপাদিত ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করা যায়, তাহলে জাতের বৈশিষ্ট্য সহজেই রক্ষিত হতে পারে। গ্রামাঞ্চলে প্রায়শই একই ফসলের বিভিন্ন জাত পরস্পরের খুবই কাছাকাছি লাগানো হয়। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের মধ্যে পরপরাগায়নের সম্ভাবনা খুব বেশি। কৃত্রিম পরাগায়ন করতে হলে ফোটার আগে নির্বাচিত স্ত্রী ও পুরুষ ফুল পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। ফোটার পরপরই পলিথিন সরিয়ে পুরুষ ফুলের পরাগ থলে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডের সাথে মৃদুভাবে ঘষে দিয়ে স্ত্রী ফুল আবার ঢেকে রাখতে হয়। আটচল্লিশ ঘণ্টা পর পলিথিন সরিয়ে ফেলা যেতে পারে। কুমড়া গোত্রের সবজিতে কৃত্রিম পরাগায়নের একটি বড় সুবিধা এই যে, এক একটি ফল থেকে বহুসংখ্যক বীজ পাওয়া যায়।

৯.৩. লাউ

লাউয়ের বৈজ্ঞানিক নাম *Lagenaria siceraria.* পরবর্তীকালে এর আরও ৫টি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্রোমোজম সংখ্যা ১১ জোড়া। ইংরেজিতে Bottle gourd নামে পরিচিত।

৯.৩.১. লাউয়ের উদ্ভিদতত্ত্ব

পাতা : পাতা সরল ও একান্তর। বোঁটা লম্বা ও ভিতরে ফাঁপা। ফলক তাম্বুলাকার। কচি অবস্থায় ফলকের নিচতল সাদা লোমে আবৃত থাকে।

কাণ্ড : কুমড়া গোত্রের সবজিসমূহের মধ্যে লাউয়ের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য সর্বাপেক্ষা বেশি, অনুকূল পরিবেশে শাখা-প্রশাখাসহ কাণ্ডের মোট দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার ছাড়িয়ে যেতে পারে। লাউয়ের কাণ্ড নরম ও কচি অবস্থায় সাদা চটচটে লোমে আবৃত থাকে। লোমের অগ্রভাগে গ্রন্থি বিদ্যমান। ঘসা দিলে এসব গ্রন্থি ফেটে লাউয়ের বৈশিষ্ট্যসূচক গন্ধ বের হয়। কাণ্ডের প্রায় প্রতিটি পর্বে আকর্ষী থাকে।

শিকড় : লাউয়ের শিকড় খুব বিস্তৃত এবং পাশের দিকেই এর বিস্তার বেশি। শিকড় মাটির নিচে ২৫ সেন্টিমিটারের মধ্যে অবস্থান করে। মাটির অবস্থাভেদে শিকড় নিচের দিকে ২ মিটারের অধিক গমন করতে পারে।

ফুল : লাউ একটি বর্ষজীবী একবাসী উদ্ভিদ। এর যৌন বিকাশের স্বরূপ *Cucurbitaceae* গোত্রের অন্যান্য একবাসী প্রজাতির অনুরূপ।

গাছে উৎপাদিত প্রথম কয়েকটি ফুল সবসময়ই পুরুষ জাতের। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল কখনো একই পর্বে থাকে না। পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের অনুপাত পরিবর্তিত হয়ে থাকে। লাউয়ের ফুল বৃহদাকার ও সাদা। ফুলে ৫টি করে বৃত্যংশ ও পাঁপড়ি থাকে। ফুলে ৩টি পুংকেশর থাকে। স্ত্রী ফুলের ডিম্বাধার রোমশ গর্ভমুণ্ড ৩ ভাগে বিভক্ত প্রতিটি ভাগ আবার দ্বিখণ্ডবিশিষ্ট।

ফল ও বীজ : আকার ও আকৃতির দিক দিয়ে লাউয়ের ফলের মধ্যে বৈচিত্র্য প্রচুর। জাত অনুযায়ী ফলের ওজন আধা কেজি থেকে শুরু করে ২০ কেজি হতে পারে। ফলের আকৃতি ডিম্বাকার, গোলাকার, চ্যাপ্টা, লম্বা ইত্যাদি রকমের হয়ে থাকে। ফলের ত্বক মসৃণ, ত্বক প্রধানত সাদা, সবুজাভ সাদা অথবা সবুজ। লাউয়ের বীজ ১০-২৫ সেন্টিমিটার লম্বা, চ্যাপ্টা এবং আয়তাকার। বীজের কিনারা ও উভয় তলে রেখা আছে। বীজ খড় বর্ণের।

পরাগায়ন ও ফল ধারণ : লাউয়ের ফুল বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে ফোটে। এজন্য ফুলের পরাগায়নের ক্ষেত্রে নিশাচর পতঙ্গের ভূমিকা বেশি।

৯.৩.২. লাউয়ের জাত

বাংলাদেশে লাউয়ের অনেক জাত চোখে পড়ে। প্রধানত ফলের আকার, আকৃতি ও বর্ণের দ্বারা বিভিন্ন জাতের ব্যবধান সহজেই বোঝা যায়। পাতার আকৃতি ও আকার এবং গাছের লতানোর পরিমাণ থেকেও জাতের বিভিন্নতা বোঝা যায়।

৯.৩.২.১. লাউয়ের অন্যান্য জাত : বাংলাদেশে দেশীয় উন্নত এবং গবেষণা উদ্ভাবিত বেশ কিছু জাত রয়েছে। যেমন–

- ক. দেশীয় গোল : গাঢ় সবুজ থেকে হাল্কা সবুজ
- খ. দেশীয় লম্বা : গাঢ় সবুজ থেকে হাল্কা সবুজ
- গ. বর্তুলাকার : গাঢ় সবুজ থেকে হাল্কা সবুজ
- ঘ. বারি লাউ : লম্বা হাল্কা সবুজ
- ঙ. হাজারী লাউ : লম্বাটে, ছোট
- চ. চিকন লাউ : চিকন লম্বা, হাল্কা সবুজ

৯.৩.২.২. বাংলাদেশে উদ্ভাবিত উন্নত লাউ জাতের বিবরণ

বারিলাউ-১ : লাউ যাতে সারা বছর জন্মানো যায় সেজন্য নির্বাচনের মাধ্যমে বারি লাউ-১ জাতটি উদ্ভাবন করে ১৯৯৬ সালে এবং দেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। এজাতের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ–

ক. পাতা সবুজ ও নরম
খ. পুরুষ ও স্ত্রী ফুল একই কক্ষে জন্মে না।
গ. পুরুষ ও স্ত্রী ফুল যথাক্রমে চারা রোপণের ৪২-৪৫ দিন এবং ৫৭-৬০ দিনের মধ্যে ফুটে।
ঘ. ফলের আকৃতি লম্বা (৪০-৫০ সেন্টিমিটার), হালকা সবুজ রঙের এবং এর বেড় প্রায় ৩০-৩৫ সেন্টিমিটার।
ঙ. প্রতি ফলের গড় ওজন ১.৫-২.০ কেজি।
চ. প্রতি ৭–৮ দিন পর পর ফল সংগ্রহ করতে হয়।
ছ. গ্রীষ্ম মৌসুমেও এটি উচ্চতাপ ও অতিবৃষ্টি -সহিষ্ণু। ফলে এ জাতটি সারা বছরই জন্মানো যায়।
জ. উন্নত পদ্ধতিতে বারিলাউ-১ চাষ করলে হেক্টর প্রতি শীতকালে ৪০-৪৫ টন এবং গ্রীষ্মকালে ২০-২৫ টন হয়।
ঝ. পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করে চাষ করাই উত্তম।

৯.৩.৩. জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু : নাতিশীতোষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ুতে লাউ সবচেয়ে ভালো জন্মে। এর পারিবেশিক চাহিদা অধিক প্রসারিত। ১০-৪০ সেন্টিমিটার তাপমাত্রায় লাউ গাছ জন্মানো যায়। কিন্তু ফল ধরার উপযোগী পরিবেশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নতাপমাত্রায় সীমিত সংখ্যক ফল ধরে। আলোর অভাব না হলে উচ্চ তাপমাত্রায়ও ফল উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের শীতকালীন জলবায়ু লাউয়ের জন্য উপযোগী।

মাটি : প্রায় অনেক ধরনের মাটিতেই লাউ জন্মানো যায়। দোআঁশ মাটিতে লাউয়ের ফলন ভালো হয়। বেলে মাটিতে লাউ চাষ করে ভালো ফলন পেতে জৈবসারসহ প্রচুর সার এবং নিয়মিত সেচ দিতে হয়

৯.৩.৪. লাউয়ের উৎপাদন প্রযুক্তি

আমাদের দেশী জাতসমূহ রবি মৌসুমে উৎপাদনের উপযোগী। এজন্য এখানে কেবল রবি মৌসুমেই লাউয়ের চাষ হয়।

আগাম ফল পাওয়ার উদ্দেশ্যে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বীজ বপন করতে হয় যাতে নভেম্বরে ফসল সংগ্রহ করা যায়। নাবি ফসলের জন্য নভেম্বর এমনকি ডিসেম্বর পর্যন্ত বীজ বোনা হয়। নাবি ফসল থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। রবি ফসল হলেও লাউ চাষের সময়কাল বেশ বিস্তৃত।

জমি তৈরি ও বীজ বপন : বাংলাদেশের লাউয়ের বেশিরভাগই পারিবারিক বাগানে উৎপন্ন হয়। কৃষকের বাসগৃহের আশে-পাশে দু'একটি মাদায় বীজ বপন করে গাছ মাচায় কিংবা ঘরের চালে বাইয়ে দেয়া হয়। গাছ ও বাউনি হিসেবে ব্যবহার করা হয়

সাম্প্রতিককালে বড় বড় শহরের আশে-পাশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাউয়ের চাষ শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমে জমি তৈরি করে ৫-৬ মিটার দূরত্বে মাদা বসিয়ে তাতে বীজ বোনা হয়। প্রতি মাদায় ২-৩টি করে গাছ রাখা হয়। লাউ বীজ অঙ্কুরিত হতে সপ্তাহখানেক সময় লাগে। বপনের পূর্বে ২৪ ঘণ্টা পানিতে ডুবিয়ে নিলে বীজ দ্রুত গজায়।

সার প্রয়োগ : লাউয়ের মাদা প্রতি নিম্নলিখিত পরিমাণে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সার প্রয়োগ সময়	সারের নাম ও পরিমাণ			
	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)
মাদা তৈরির সময় : বীজ বপনের ৭-১০ দিন পূর্বে	২	-	৫০	-
১ম উপরি প্রয়োগ : চারা গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর	-	২৫	-	২৫
২য় উপরি প্রয়োগ : চারা গজানোর ৪৫-৫০ দিন পর	-	২৫	-	২৫

বীজ বপনের হার : প্রতি আইলে ১০ গ্রাম বা ১৫টি গাছ।

বপনের সময় : আগস্ট-নভেম্বর মাস

বীজ বপন : ভালোভাবে মাদা বা উঁচু জায়গা তৈরি করে প্রয়োজনীয় সার দেয়ার ৭-১০ দিন পর প্রতি মাদায় ৩-৪টি বীজ বপন করতে হয়। চারা রোপণ করেও আইলে লাউ চাষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রতি মাদায় ১টি করে চারা রোপণ করতে হয়।

বীজ বপনের গভীরতা : ২.০-২.৫ সেন্টিমিটার।

অঙ্কুরোদ্গমের সময় : ৪-৫ দিন

মালচিং : বীজ বপনের পর মালচিং করা হলে সহজে বীজের অঙ্কুরোদগম হয়।

শূন্যস্থান পূরণ : কোনো স্থানে বীজ না গজালে অথবা চারা মরে গেলে সেখানে পুনরায় বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হয়।

সারের উপরিপ্রয়োগ : সময়মতো সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হয়

গাছ পাতলাকরণ : চারা গজানোর পর প্রতি মাদায় ১টি করে সুস্থ-সবল চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হয়।

মাটি আলগাকরণ : আগাছা নিড়ানির সময় নিড়ানি দিয়ে ভালোভাবে মাটি আলগা করে নরম ও ঝুরঝুরে করে দিতে হয়।

বাউনি এবং মাচা দেয়া : গাছ যখন ১৫-২০ সেন্টিমিটার বড় হয় তখন গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা কঞ্চিসহ মাটিতে পুতে দিতে হয়।

পরাগায়ন : সকাল বা বিকালে স্ত্রী ফুলের গর্ভকেশরের মুণ্ডে পুরুষ ফুলের পরাগ রেণু খুব আস্তে আস্তে ২-৩ বার ছুঁয়ে দিলে পরাগায়ণ সহজ হয়। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে সাধারণত ৫-৬টি স্ত্রী ফুলের পরাগায়ণ করা সম্ভব।

পোকা দমন : জাবপোকা : এ পোকা কচি পাতায় ও ডগার রস শুষে খেয়ে গাছকে দুর্বল করে দেয়। পোকার আক্রমণে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়।

লাউয়ের মাছি পোকা : স্ত্রী পোকা লাউয়ের উপরে খোসার নিচে ডিম পাড়ার কিছুদিনের মধ্যেই ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে আসে এবং লাউয়ের কচি অংশ খেয়ে নষ্ট করে দেয়।

রোগ দমন : পাউডারি মিলডিউ : আক্রান্ত গাছের পাতার উপরে সাদাটে বা ধূসর বর্ণের পাউডারের মতো আবরণ পাতার উপরে দেখা যায় যা নষ্ট করে দেয়। মাটিতে রস কম থাকলে এবং গাছ বেশি ঘন হলে এ রোগের প্রকোপ বেশি হয়।

ডাউনি মিলডিউ : আক্রান্ত গাছের পাতায় বাদামি রঙের ছত্রাক জন্মে। পাতা কুঁচকে যায়। আক্রমণ বেশি হলে গাছ মরণাপন্ন হয়।

পরিচর্যা : পানি সেচ ও বাউনি দেয়া লাউয়ের প্রধান পরিচর্যা। শুষ্ক মৌসুমে চাষ হয় বলে লাউয়ে সেচের প্রয়োজন হয়। লাউ ফসলে পানির চাহিদা বেশি– এজন্য নিয়মিত প্লাবন সেচ দেয়া উচিত। বাধাহীনভাবে বাইতে না পারলে লাউ গাছের ফলনশীলতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। তাই ভালো ফলন পেতে হলে লাউ গাছে বাউনি দেয়া আবশ্যক। কৃত্রিম পরাগায়নের সাহায্যে লাউয়ের ফলন বৃদ্ধি করা যায়। এ ক্ষেত্রে গাছে ফুল ধরার প্রাথমিক পর্যায়ে কৃত্রিম পরাগায়ন অধিক কার্যকরী।

ফসল সংগ্রহ : জাত ও আবহাওয়াভেদে বীজ বপনের ৮-১০ সপ্তাহ পর গাছে ফল ধরা শুরু হয় এবং গাছ ২-৩ মাসব্যাপী ফল দিয়ে থাকে। ফুলের পরাগায়নের ১০-১২ দিন পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ফল বেশি কচি বা বেশি পরিণত অবস্থায় সংগ্রহ করা ঠিক নয়। ফল সংগ্রহের ব্যাপারে ফলন ও গুণের সমন্বয় রক্ষা করতে হয়। লাউয়ের হেক্টর প্রতি ফলন ১৫-২০ টন।

৯.৪. তরমুজ

তরমুজ স্বল্পমেয়াদি ফল। ফলের ব্যবহার বাড়াতে হলে স্বল্পমেয়াদি ফলের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখতে হয়। কোনো কোনো স্থানে তরমুজের কিছু অংশ সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকা মহাদেশ তরমুজের উৎপত্তি স্থান। প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এলাকা এবং ভারত উপমহাদেশে তরমুজের চাষ হতো। বর্তমানে গ্রীষ্ম ও শীতপ্রধান অঞ্চলের অনেক দেশেই এর চাষ বিস্তার লাভ করেছে। পশ্চিম এশিয়া, জাপান, তাইওয়ান প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপকভাবে তরমুজ চাষ হয়।

৯.৪.১. তরমুজের উদ্ভিদতত্ত্ব

তরমুজের ইংরেজি নাম Water melon এবং বৈজ্ঞানিক নাম *Citrullus lanatus*. ক্রোমোজম সংখ্যা ১১ জোড়া। আফ্রিকার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থায় জন্মে থাকে।

শিকড় : মাটি সুনিষ্কাশিত উর্বর ও উষ্ণ হলে তরমুজের শিকড় এক মিটার গভীরে প্রবেশ করতে পারে, তবে অধিকাংশ শাখা শিকড় ৩০ সেন্টিমিটারের মধ্যে অবস্থান করে।

কাণ্ড : তরমুজের গাছ এক ধরনের লতা। এর প্রধান কাণ্ড কিছু বৃদ্ধি পাওয়ার পর শাখা ছাড়তে শুরু করে। অধিক লতানো জাতের বিস্তৃতি অনুকূল পরিবেশে ১০ মিটার পর্যন্ত ছড়াতে পারে। সাম্প্রতিককালে জাপানে উদ্ভাবিত জাতসমূহে প্রধান কাণ্ড গোড়া থেকে শাখা ছাড়তে শুরু করে, এতে কাণ্ড চতুর্দিকে সমানভাবে বিস্তার লাভ করে।

পাতা : পাতা সরল, ফলক গোড়ার দিকে তাম্বুলাকার এবং পক্ষলভাবে তিন অথবা চার খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ড আবার দ্বিখণ্ডিত। ফলক আকারে ৫-২০×৩-১২ বর্গ সেন্টিমিটার।

ফুল : তরমুজের অধিকাংশ জাত একবাসী। তরমুজের স্ত্রী ও দ্বি-লিঙ্গিক ফুল উৎপন্ন হয়। তরমুজের ফুল আকারে ছোট, বর্ণে সবুজাভ-হলুদ। ফুলে পাঁচটি করে বৃত্যাংশ ও পাঁপড়ি থাকে, পাঁপড়ি সংযুক্ত। স্ত্রী ফুলে ৩টি করে অপরিণত পুংকেশর থাকে। তরমুজ পরপরাগায়িত উদ্ভিদ হলেও এতে যথেষ্ট মাত্রায় স্বপরাগায়ন ঘটে থাকে। প্রধানত মৌমাছির মাধ্যমে পরাগায়ন হয়। পরাগ চটচটে হওয়ার কারণে মৌমাছির আগমন না ঘটলে দ্বি-লিঙ্গিক ফুলেও পরাগায়ন হয় না। তরমুজের ফুল সূর্যোদয়ের পরপরই ফোটে। পাঁপড়ি মেলার সাথে সাথে পরাগধানী ফেটে যায় এবং গর্ভমুণ্ড সারাদিন পরাগগ্রাহী থাকে।

ফল : তরমুজের ফলে বিভিন্নতা প্রচুর। জাত ও পরিবেশ অনুযায়ী ফলের ওজন ১ থেকে ৫০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফল গোলাকার থেকে দণ্ডাকারের মধ্যে যেকোনো আকৃতির হতে পারে। চ্যাপ্টা ও গোল বা এর মাঝামাঝি আকৃতির জাত সবচেয়ে ভালো। লম্বা ফলধারী জাত সবচেয়ে ভালো। লম্বা ফলধারী জাতের বীজপত্র সরু ও লম্বা এবং গোলাকার জাতের বীজপত্র গোল। ফলের ত্বক সাদা থেকে শুরু করে বিভিন্ন গাঢ়ত্বের সবুজ ও নীলাভ হয়ে থাকে। অধিকাংশ জাতে ত্বক একাধিক বর্ণে ডোরাদার অথবা বিচিত্রিত। খোসা ভঙ্গুর, দৃঢ় অথবা নমনীয়; পাকা ফলের শাঁস লাল, কমলা, পার্পেল, হলুদ, এমনকি সাদা হয়। উৎকৃষ্ট জাতের শাঁস মোলায়েম এবং মুখে দিলে গলে যায়।

বীজ : তরমুজের বীজের মধ্যেও বৈচিত্র্য প্রচুর। কোনো কোনো জাতের বীজ টমেটোর বীজের মতো ছোট, অন্যান্য ক্ষেত্রে বীজ দৈর্ঘ্যে ১.৫ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ০.৭ সেন্টিমিটার হতে পারে। পাকা ফলের বীজ সাদা, কালো এবং দু'য়ের মাঝামাঝি যে কোনো বর্ণের হতে পারে; সবুজ, লাল এবং একাধিক বর্ণের বীজও দেখা যায়।

৯.৪.২. তরমুজের জাত

বাংলাদেশের পতেঙ্গা ও গোয়ালন্দ এলাকায় তরমুজের দুটি জাত রয়েছে। এগুলোর ফলের গুণ ও স্বাদ সন্তোষজনক নয়। আধুনিক জাপানি জাত প্রবর্তনের ফলে স্থানীয় জাত দুটির চাষ খুব কম হতে দেখা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত তরমুজের অধিকাংশই দুটি জাপানি সঙ্কর জাতের, যথা– টপ ইল্ড ও গ্লোরি। সম্প্রতি তাইওয়ান থেকে আমদানিকৃত চ্যাম্পিয়ন ২, ওয়ার্ল্ড কুইন ও চ্যাম্পিয়ান নামের তিনটি সঙ্কর জাতের চাষ শুরু হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে তরমুজের জাত উন্নয়নে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জাপানের প্রায় সব আধুনিক জাতই সঙ্কর। সে দেশের প্রধান প্রধান জাতের মধ্যে সুইট মার্বেল, সুগার বেবি, জুপিটার মাসগোল্ড ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

৯.৪.২.১. তরমুজের জাত উন্নয়নের লক্ষ্য

ক. তরমুজ ফলন অপেক্ষা গুণের গুরুত্ব অনেক বেশি। তরমুজের গুণ বলতে ফলের মিষ্টতা, আকার, পরিবহণ গুণ, ত্বকের বর্ণ, গন্ধ, বীজের সংখ্যা ইত্যাদি।

খ. বর্তমানে ছোট আকারের (৫ কেজির কম ওজনের) ফলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে ছোট ফলধারী তরমুজের জাত পাওয়া যায়, এসব জাত বড় ফলধারী জাত অপেক্ষা আগে পরিপক্ব হয়।

গ. ফলের স্বাদ নির্ভর করে প্রধানত শাঁসে জমাকৃত শর্করার পরিমাণের উপর শর্করার পরিমাণ বেশি হলে ফল মিষ্টি স্বাদযুক্ত হয়।

ঘ. আঁটোসাটো গাছের জাত উদ্ভাবন করতে পারলে ফসল উৎপাদনে সুবিধা পাওয়া যায়। সঙ্কর জাত ও বীজবিহীন জাত উদ্ভাবন তরমুজের জাত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান।

৯.৪.৩. জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু : শুষ্ক, উষ্ণ এবং প্রচুর আলোযুক্ত স্থানে তরমুজ সবচেয়ে ভালো জন্মে। উষ্ণ এলাকায় সর্বোৎকৃষ্ট তরমুজ উৎপন্ন হয়। বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতার আধিক্য এ ফসলের জন্য ক্ষতিকর। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে প্রায় সারা বছরই উচ্চ তাপমাত্রা বিরাজ করে, কিন্তু এসব এলাকায় কেবল শুষ্ক মৌসুমেই উৎকৃষ্ট মানের তরমুজ উৎপাদন সম্ভব। শীতপ্রধান অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে তরমুজের চাষ করতে হয়। তরমুজের খরা ও উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা আছে। ২৫° সেঃ এর চেয়ে কম তাপমাত্রায় গাছের বৃদ্ধি ও ফল ধারণ ব্যাহত হয়। বাংলাদেশে কেবল রবি মৌসুমের শেষভাগ এবং খরিফের প্রথম ভাগে তরমুজ জন্মানো যায়।

মাটি : তরমুজ চাষের জন্য দোআঁশ ও বেলে মাটি উপযোগী, তবে মাটি সুনিষ্কাশিত হওয়া আবশ্যক। নদী তীরের বেলে দোআঁশ মাটিতে তরমুজ ভালো জন্মে।

৯.৪.৪. উৎপাদন পদ্ধতি

বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল এই তিন মাসের আবহাওয়া তরমুজ চাষের জন্য উপযোগী। শৈত্যের কারণে রবি মৌসুমের প্রথমভাগেও এর চাষ ফলপ্রসূ হয় না। বাংলাদেশে তরমুজ চাষে সব সময়ই ঝড় ও শিলাবৃষ্টির ঝুঁকি থাকে এবং এজন্য কোনো কোনো সময় ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়। বীজ বোনার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম পক্ষ সর্বোত্তম, এর পূর্বে বোনা বীজ দেরিতে গজায়। তাপমাত্রা ২০° সেঃ এর নিচে গেলেই বীজের অঙ্কুরোদ্গম মন্থর হয়ে যায়। আগাম ফসল পেতে হলে জানুয়ারি মাসে বীজ বপন করতে হয়।

জমি তৈরি ও বীজ রোপণ : তরমুজের বীজ মাদায় রোপণ করা হয়। প্রথমে জমি ভালোভাবে তৈরি করে জাত অনুযায়ী ৩-৪ মিটার দূরত্বে মাদা বসাতে হয়। প্রতি মাদায়

৪-৫টি বীজ রোপণ করা উচিত, গজানোর পর মাদাপ্রতি ২-৩টি চারা রাখতে হয়। গজানো চারাকে শীতের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য কাগজের ঠোঙা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়।

মৃত্তিকাজনিত রোগ এড়ানোর জন্য জাপানে লাউয়ের উপর তরমুজ জোড় কলম করে রোপণ করা যায়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা : শুষ্ক মৌসুমে চাষ করতে হয় বলেই ফসলে সেচ প্রয়োজন হতে পারে। কোনো কোনো স্থানে সেচ ছাড়াই তরমুজের চাষ হয়, আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে খড়কুটো দিয়ে মাটি ঢেকে রাখা হয়। বৃষ্টি হলে ক্ষেতে যাতে পানি না জমে তার জন্য নিকাশ নালার ব্যবস্থা করতে হয়।

তরমুজের প্রতিটি গাছে অনেক ফল হয়। উৎকৃষ্ট ফল পেতে হলে বৃহদাকার ফলধারী জাতের ক্ষেত্রে প্রতি গাছে ৪-৫টি ফল রেখে বাকিগুলো ছাঁটাই করে ফেলতে হয় তাছাড়া পোকায় কামড়ানো এবং অনিয়মিত আকৃতির সব ফল বড় হওয়ার পূর্বেই সরিয়ে ফেলতে হয়। মাটির সংস্পর্শে এসে ফল যাতে রোগক্রান্ত না হয়, সেজন্য ফলের নিচে খড়-বিচালি বিছিয়ে দেয়া যেতে পারে। ফলের যে অংশ মাটির সাথে লেগে থাকে সে অংশে স্বাভাবিক বর্ণ উৎপন্ন না হয়ে সাদা হয়ে যায়। এ অবস্থা পরিহার করার জন্য ফল মাঝে মাঝে এপাশ-ওপাশ করে ঘুরিয়ে দেয়া উচিত।

ফসল সংগ্রহ : জাত ও আবহাওয়াভেদে তরমুজের ফল পরিপক্ব হতে বীজ বোনার পর থেকে ৮০-১২০ দিন এবং ফুলের পরাগায়নের পর থেকে ৩০-৪৫ দিন সময় লাগে। তরমুজের ফল পাকার সঠিক সময় নির্ণয় করা একটু কঠিন, কারণ অধিকাংশ জাতে পাকার কোনো বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আঙুল দিয়ে টোকা দিলে অপক্ব ফলে ধাতব শব্দ হয় কিন্তু পাকা ফলের শব্দ হয় ড্যাবড্যাবে। ভালো ফসলে হেক্টর প্রতি ফলন ৩০-৪০টন।

৯.৪.৫. লাউ ও তরমুজের জোড় কলম প্রযুক্তি

ফিউজেরিয়াম উইল্ট ও অতিরিক্ত ঠাণ্ডা তরমুজ চাষের অন্তরায়। এ অবস্থা থেকে গাছ রক্ষার জন্য লাউ গাছ আদিজোড় ও তরমুজ উপজোড় হিসেবে ব্যবহার করে চারা তৈরি করে এবং পরবর্তীকালে মাঠে চারা রোপণ করলে গাছ মরে না ও ফলন ভালো হয়। নিচে কলম পদ্ধতিতে এপ্রোচ গ্রাফটিং (approach grafting) চারা উৎপাদনের প্রযুক্তি বর্ণনা করা হলো।

- ক. তরমুজের চারা ১৫ দিন এবং লাউয়ের চারার বয়স ১২ দিন হলে জোড় কলমের উপযুক্ত হয়।
- খ. তরমুজের উপজোড় চারা এবং লাউয়ের আদিজোড় চারা উঠিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখতে হয়।
- গ. এরপর আদিজোড় গাছের মাথার কুঁড়ি ভেঙে দিতে হয়।
- ঘ. তারপর সায়ন বীজ পত্রের কাছাকাছি একপাশে উপরের দিকে বাঁকাভাবে ধারালো ব্লেডের সাহায্যে কাটতে হয়। এরপর অনুরূপভাবে আদিজোড় গাছের কাণ্ডের নিচের দিকে বাঁকাভাবে কাটতে হয়।

ঙ. পরবর্তীতে তরমুজ উপজোড় গাছের কাঁটা অংশ লাউ আদিজোড় গাছের কাঁটা অংশের সাথে জোড়া লাগাতে হয়।

চ. তারপর জোড়ার উভয় অংশ পাট বা পলিথিন ফিতা দিয়ে বাঁধতে হয়।

ছ. কলম করা গাছগুলো পলিথিন ব্যাগে লাগাতে হয় এবং প্রয়োজনীয় পানি গাছের উপর ছিটাতে হয়। পানি যেন কোনোভাবেই জোড়া দেয়া স্থানে না লাগে।

জ. জোড় না লাগা পর্যন্ত প্রতিদিন ২-৩ বার গাছের উপর পানি ছিটাতে হয়। জোড় কলমের গাছগুলোর উপরে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হয়।

ঝ. জোড় কলম করার ১০ দিন পর তরমুজের নিচের অংশ কেটে ফেলতে হয়

ঞ. জোড় কলম করার ২০ দিন পর কলমের গাছ মাঠে রোপণ করতে হয়।

ট. কলমের গাছ লাগানো আরো ৭দিন পর যখন তরমুজের লতার বৃদ্ধি স্বাভাবিক পর্যায়ে আসবে তখন বাঁধন খুলে দিতে হয়।

৯.৫. পটল

পটল Cucurbitaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। বৈজ্ঞানিক নাম *Trichosanthes dioeca.*

ভাজি ও তরকারিতে এটি ব্যবহৃত হয়। পটলের লতা বা পাতা দ্বারা বড়া তৈরি করা যেতে পারে।

এলাকা : পটল উৎপাদনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জেলা রংপুর। রাজশাহী ও কুষ্টিয়াতেও প্রচুর পটল উৎপন্ন হয়, এ ছাড়া ফরিদপুর, বগুড়া, পাবনা, যশোর, খুলনাতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পটল আবাদ করা হয়ে থাকে।

৯.৫.১. উদ্ভিদতত্ত্ব

পটলের ইংরেজি নাম Pointed gourd এবং বৈজ্ঞানিক নাম *Trichosanthes dioeca.* এটি একটি ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ, ক্রোমোজোম সংখ্যা ১১ জোড়া। পটল একটি ভিন্নবাসী উদ্ভিদ, অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী ফুল পৃথক গাছে উৎপন্ন হয়। পটল দীর্ঘজীবী উদ্ভিদ। গাছের কাণ্ড শীতকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু এর কন্দাল শিকড় সুপ্ত অবস্থায় বেঁচে থাকে

শিকড় : পটলের শিকড় কন্দাল ও যথেষ্ট বিস্তৃত কাণ্ড সরু খসখসে এবং তীক্ষ্ণ লোমে আবৃত।

পাতা : পাতা তাম্বুলাকার, দৈর্ঘ্য ৭-১০ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ৫-৮ সেন্টিমিটার লোমশ ও নীলাভ সবুজ প্রত্যেক পাতার কক্ষে আকর্ষী থাকে।

ফুল : ফুল সাদা, ব্যাসে ৩-৫ সেন্টিমিটার প্রতিটি ফুলে পাঁচটি করে বৃত্যংশ ও পাঁপড়ি থাকে। পুরুষ ফুলে পুংকেশরের সংখ্যা তিন।

ফল : ফল উপবৃত্তাকার দৈর্ঘ্যে ৮-১০ সেন্টিমিটার। ফলের উপরিভাগ মসৃণ সবুজ অথবা ধুসর এবং ডোরাদার।

বীজ : বীজ গোলাকার কালো ও ব্যাসে ০.৩-০.৫ সেন্টিমিটার।

৯.৫.২. পটলের জাত

সাধারণত দুই জাতীয় পটল দেখা যায়। যথা–

ক. মুর্শিদাবাদী (ধূসর বর্ণের এবং এর ত্বক পুরু) এবং

খ. বালি পটল ডোরাদার (স্বাদের দিক থেকে বালি পটল উৎকৃষ্ট)।

৯.৫.৩. জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু : সাধারণভাবে পটল উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর উপযোগী ফসল। পটলের জন্য উচ্চতর তাপমাত্রা এবং অধিক সূর্যালোক উপযোগী। বৃষ্টিপাতের আধিক্য এর ফুলের পরাগায়নের বিঘ্ন ঘটায়।

মাটি : পটলের জন্য মাটি বিশেষভাবে সুনিষ্কাশিত হওয়া দরকার। পটল চাষের জন্য উঁচু জমি প্রয়োজন। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলেও পটলের চাষ সম্ভব হয়েছে। এর জন্য দোআঁশ ধরনের মাটি প্রয়োজন।

৯.৫.৪. উৎপাদন পদ্ধতি

চাষের সময় : অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত যে কোনো সময় পটল লাগানো যায়। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে লাগানো গাছ থেকে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ফসল সংগ্রহ শুরু করা হয়। মার্চে লাগানো গাছে জুনের পূর্বে ফল আসে না। কয়েক দফায় গাছ লাগালে সারা বছরই পটল পাওয়া যায়।

রোপণ : অক্টোবর হতে নভেম্বর মাসে এবং লতা ফেব্রুয়ারি মাসে শিকড় ও বীজতলায় কাটিং রোপণ করা যেতে পারে– যা ফেব্রুয়ারি হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত পটল উৎপন্ন হয়। সাধারণত ১২ সেন্টিমিটার পর পর ১৫-২৩ সেন্টিমিটার গভীর করে ভেলি খনন করে তাতে প্রায় ৭.৫ সেন্টিমিটার দূরে গাছ রোপণ করা হয়। রোপণের জন্য ব্যবহৃত গাছ তিন প্রকারের যথা–

ক. শিকড় ;

খ. লতা;

গ. লতার গোছা।

শিকড়ের অগ্রভাগ মাটির বাইরে রেখে গোড়ার অংশ মাটিতে চাপা দিতে হয়। এরপর অগ্রভাগ খড় বা বিচালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। প্রায় দুই সপ্তাহ পর সাকার বের হয়। লতাগুলোকে একত্রে জড়িয়ে গুচ্ছি বাঁধা হয়। কোনো কোনো লতা অফলন্ত থেকে যায়। লক্ষ্য রাখতে হয় যেন ফলন্ত চারা হতে চারা সংগ্রহ করা হয়

সার প্রয়োগ : মাটি যাতে সর্বদা কিছু নরম থাকে সেজন্য বেশি পরিমাণ জৈব সার ব্যবহার করা দরকার। এর জন্য হেক্টর প্রতি প্রায় ৯ টন গোবর, কম্পোস্ট সার, ১৭০-১৮৫ কেজি খৈল, ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া, ১২০-১৫০ কেজি সুপার ফসফেট এবং ৪০-৫০ কেজি এমপি দেওয়া যেতে পারে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা : বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই আগাম ফসলে সেচের প্রয়োজন। ফসলের চাহিদা বুঝে সেচ দিতে হয়। পটল একটি লতানো উদ্ভিদ। বাউনি দিলে গাছের ফলনশীলতা বেশি হয়। কিন্তু পটল মাটির উপরে বেয়েও খুব ভালো ফলন দিতে পারে। এজন্য বাউনির পরিবর্তে মাটির উপরে খড় অথবা কচুরিপানা বিছিয়ে দেয়া হয়। এতে উৎপাদন খরচ অনেক কম হয়।

৯.৫.৫. পটল বীজ গাছের অসুবিধা

পটলের বীজ গাছ উৎপাদনে নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা দেয়।

ক. বীজের অঙ্কুরণ অনিয়মিত;

খ. বীজের গাছের মধ্যে শতকরা ৫০ভাগ পুরুষ জাতের;

গ. আসল বীজের গাছ থেকে ফল পেতে অনেক বেশি সময় লাগে

পটলের বংশবিস্তারের জন্য কাণ্ডাংশসহ কন্দাল মূল ব্যবহৃত হয়। কাণ্ডের শাখা কলম থেকেও নতুন গাছ পাওয়া যায় একশত কুঁড়ি থেকে ১৫০ সেন্টিমিটার দূরত্বে সারি করে সারিতে ১ মিটার পর পর চারা রোপণ করা হয়। সুষ্ঠু পরাগায়নের জন্য ক্ষেতে ১০% পুরুষ জাতের গাছ লাগানো উচিত।

রেটুন ফসল : একবার ফল দেয়ার পর দীর্ঘজীবী উদ্ভিদ বা এগুলোর গুঁড়িকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে দ্বিতীয়বার যে ফসল নেওয়া হয় তাকে রেটুন ফসল বলা হয় পটলের গাছও ফল দেয়ার পর মারা যায় বা কাণ্ড রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে প্রথমবারের ফসল সংগ্রহের পর কাণ্ড কেটে ফেলে দিলে কিছুদিন পর কন্দমূল থেকে নতুন কাণ্ড বের হয়। সঠিকভাবে যত্ন নিলে রেটুন ফসল থেকেও ভালো ফলন পাওয়া যায়

ফসল সংগ্রহ : ফুলের পরাগায়নের সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই পটলের ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। কাঁচা ফল সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে আন্তঃজেলা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পটল একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য। এজন্য দূরে চালান দিতে হলে মধ্যম পরিপক্ব ফল পাঠানোই উত্তম

ফলন : হেক্টর প্রতি ৮-১৫ টন পটল জন্মে থাকে। একই পটলের গাছ দুই তিন বৎসর পর্যন্ত ফল প্রদান করে।

৯.৬. করলা

৯.৬.১. করলার জাত

ক. করলা

খ. স্থানীয় জাত : উচ্ছে

গ. সঙ্কর জাত

৯.৬.২. করলা চাষের মাটি

দোআঁশ মাটিতে করলা সবচেয়ে ভালো হয়। প্রচুর জৈব পদার্থসমৃদ্ধ যে কোনো মাটিতে এর চাষ করা যায়

৯.৬.৩. উৎপাদন পদ্ধতি

আইল তৈরি : আইলের ধরন অনুযায়ী আইলে মাদা তৈরি করে করলা চাষ করা যায় ১ মিটার দূরত্বে মাদা তৈরি করে মাদায় প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করতে হয় নিচু আইলে উঁচু জায়গা তৈরি করে এবং জমির চারকোণায় চারটি উঁচু জায়গা তৈরি করে করলা চাষ করা যায়।

মাদার আকার : ৩০×৩০×৩০ সেন্টিমিটার।

উঁচু জায়গার আকার : ৪৫×৪৫×৪৫ সেন্টিমিটার

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ : মাদা প্রতি নিচে উল্লেখিত হারে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

সার প্রয়োগ সময়	সারের নাম ও পরিমাণ			
	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)
মাদা তৈরির সময় : বীজ বপনের ৭-১০ দিন পূর্বে	১	-	২৫	১০
১ম উপরিপ্রয়োগ : চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর	-	১০	-	১০
২য় উপরিপ্রয়োগ : চারা গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর	-	১০	-	১০

বীজ বপনের হার : প্রতি আইলে ১৫ গ্রাম।

দূরত্ব : আইলে এক সারি পদ্ধতিতে করলা চাষ করা হয়। এক্ষেত্রে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হচ্ছে ১ মিটার।

বীজ বপনের সময় : জানুয়ারি-মার্চ মাস এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর মাস।

বীজ বপন পদ্ধতি : সার প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর প্রতি মাদায় বা উঁচু জায়গায় ৩-৪টি করে বীজ বপন করতে হয়। করলা বীজের বীজত্বক খুব পুরু বিধায় বপনের পূর্বে ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিতে হয়। এতে বীজের অঙ্কুরোদগম সহজ হয়।

বীজ বপনের গভীরতা : ২ সেন্টিমিটার।

অঙ্কুরোদ্গমের সময়কাল : ৮-১০ দিন।

গাছ পাতলাকরণ : বীজ গজানোর পর চারা ৮-১০ সেন্টিমিটার লম্বা হলে প্রতি মাদায় উঁচু জায়গায় ১টি করে সুস্থ-সবল চারা রেখে বাকি চারা উঠিয়ে ফেলতে হয়।

মাটি আলগাকরণ : আইলের মাটি শক্ত হয়ে গেলে তা নিড়ানির সাহায্যে নরম ও ঝুরঝুরে করে দিতে হয়।

সারের উপরিপ্রয়োগ : গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধির সাথে সাথে তার খাদ্য চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। খাদ্যের অভাবে ফুল-ফল উৎপাদন কম হয়। সাধারণত ইউরিয়া এবং এমপি সার গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি শুরু হলে পার্শ্ব-প্রয়োগের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়।

সার উপরিপ্রয়োগের উপকারিতা

ক. গাছের খাদ্য ঘাটতি পূরণ হয় ;

খ. জৈব পদার্থকে পচনে সহায়তা করে ;

গ. গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ভালো হয় ;

ঘ. মাটির পুষ্টি ভারসাম্য বজায় থাকে ;

ঙ. ফলন বেশি হয়

শূন্যস্থান পূরণ : আইলে চারা রোপণের পর কখনো কখনো বিভিন্ন সবজির চারা মারা যায়। বপনকৃত বীজ গজায় না। সেসব শূন্যস্থানে নতুন করে সেই একই জাতের, একই বয়সের চারা লাগানো বা বীজ বপন করতে হয়। এজন্য চারা রোপণের সময়ই আইলের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত চারা রোপণ করে, যাতে সেসব চারা দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা যায়। সাধারণত চারা রোপণের ৭-৮ দিনের মধ্যে এ কাজ করা উচিত।

শূন্যস্থান পূরণের উপকারিতা

ক. আইলের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয় ;

খ. আগাছা কম হয় ;

গ. উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

গাছের গোড়ায় মাটি দেয়া : ফলন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কিছু ফসলের ক্ষেত্রে গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধির সময় ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হয়। এর ফলে কন্দের বৃদ্ধি ভালো হয়। যেমন- আলু, হলুদ, আদা ইত্যাদি।

গাছের গোড়ায় মাটি দেয়ার উপকারিতা

ক. শিকড় বিস্তার লাভ করতে পারে ;

খ. ফলন বৃদ্ধি পায় ;

গ. গাছের গোড়ায় পানি জমে না ;

ঘ. গাছ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ;

ঙ. আগাছা কম হয়।

খুঁটি বা বাউনি দেয়া (Staking/climbing) : লতানো ফসল চাষাবাদের ক্ষেত্রে গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধির সময় খুঁটি বা বাউনি দেয়া প্রয়োজন। খুঁটি বা বাউনি না দিলে গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। গাছ মাটিতে নুয়ে পড়ে। বাঁশ, কঞ্চি, পাট-কাঠি, ধৈঞ্চা ইত্যাদি দিয়ে এ কাজ করা হয়। এ ছাড়া আইলে পাতলা করে ধৈঞ্চা গাছ জন্মিয়ে সেগুলোকেও খুঁটি বা বাউনি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

খুঁটি বা বাউনির উপকারিতা : নিচে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

ক. গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি ভালো হয় ;

খ. গাছ পচনের হাত থেকে রক্ষা পায় ;

গ. অন্যান্য পরিচর্যা এবং ফসল সংগ্রহ সুবিধা হয় ;

ঘ. গাছ পরিমিত আলো বাতাস পায় ;

ঙ. গাছকে দাঁড়িয়ে থাকতে সহায়তা করে ;

চ. ফলন বেশি হয় ;

ছ. গাছ খুঁটি বা বাউনি বেয়ে উপরের দিকে উঠতে পারে।

মাচা দেয়া : লতানো ফসল মাটির উপরে মুক্তভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। এ সব ফসল মাটিতে থাকলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়, গাছ পচে যেতে পারে। এ সব গাছ মাটির উপরে কোনো অবলম্বন পেলে তাতে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে। এজন্য লতানো প্রকৃতির ফসল চাষাবাদ করতে হলে বাঁশ, কঞ্চি, পাট-কাঠি, ধৈঞ্চা দিয়ে মাচা তৈরি করে দিতে হয়।

মাচা দেয়ার উপকারিতা

ক. গাছ সহজে বৃদ্ধি পায় ;
খ. ফলন বেশি হয় ;
গ. গবাদি পশু সহজে গাছ নষ্ট করতে পারে না ;
ঘ. গাছের ফল নষ্ট হয় না ;
ঙ. ফসলের অন্যান্য পরিচর্যার সুবিধা হয় ;
চ. আইলের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

ছাঁটাইকরণ : ফসলের অঙ্গজ বৃদ্ধি বেশি হয়ে গেলে ফল উৎপাদন কম হয় এজন্য গাছের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও ফলায়নকে উৎসাহিত করার জন্য অতিরিক্ত শাখা-প্রশাখা কেটে দিতে হয়। এ ছাড়া রোগ ও পোকা আক্রান্ত ডাল-পালা, লতা-পাতা কেটে গাছ ছাঁটাই করে দিতে হয়।

উল্লেখ্য, ঝিঙা ও ধুন্দুল চারার অগ্রভাগ ছাঁটাই করলে তা আগাম শাখা বিস্তার ও নিচের পর্বে ফল ধারণে উদ্দীপিত করে। টমেটো গাছের শাখা ছাঁটাইকরণে বড় আকারের টমেটো উৎপন্ন হয়। ঢেঁড়স এবং বেগুনের পুরাতন গাছ ছাঁটাই করলে তা নতুন ফসল থেকে আগে ফল উৎপাদন করে থাকে।

ছাঁটাইকরণের উপকারিতা

ক. গাছের অনাকাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি বন্ধ হয় ;
খ. ফুল-ফল বেশি হয় ;
গ. ছায়া কম হয় ;
ঘ. রোগবালাই কম হয় এবং
ঙ. ফলন বৃদ্ধি পায়।

পরাগায়নকরণ : কুমড়া গোত্রের অধিকাংশ সবজির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গাছে স্ত্রী ফুল ফোটার কিছুদিন পর ফল পচে যায় বা ঝরে যায়। পোকা ও মৌমাছির অনুপস্থিতিতে পরাগায়ন না হওয়ার ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই কৃত্রিম উপায়ে এসব ফসলের পরাগায়ন করা দরকার। ফল ধারণের জন্য হাত দিয়ে ফুলের পরাগায়ন করতে হয়। সকালের অথবা বিকেলের দিকে একটি সদ্য ফোটা পুরুষ ফুল নিয়ে পুংকেশর ঠিক রেখে পাঁপড়িগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হয়। তারপর সেই পুংকেশর দিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভকেশরের উপর কোমল হাতে ২-৩ বার ছুঁয়ে দিলেই পরাগায়নের কাজ হয়। এভাবে একটি পুরুষ ফুল নিয়ে ৮-১০টি স্ত্রী ফুলের পরাগায়ন করা যায়।

পরাগায়নের উপকারিতা

ক. ফল নষ্ট হয় না ;
খ. বেশি ফল পাওয়া যায়।

ফলের পাতলাকরণের উপকারিতা

ক. পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো-বাতাস পায় ;
খ. গাছের খাদ্যোৎপাদনের ঘাটতি হয় না ;
গ. ফলের বৃদ্ধি ভালো হয় ;

ঘ. ফলের আকার-আকৃতি সঠিক থাকে ;
ঙ. ফলন ভালো হয় এবং
চ. রোগবালাই কম হয়।

পোকা দমন

ফলের মাজরা পোকা : পোকার কীড়া ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে ফল খেয়ে নষ্ট করে দেয়। বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত ফলগুলো পচিয়ে ফেলে।

ফলের মাছি পোকা : পূর্ণবয়স্ক পোকা হুল ফুটিয়ে খোসার ভিতর ডিম পাড়ে মাছির কীড়াগুলো ডিম ফুটে বের হয়ে ফলের নরম অংশ খেয়ে ফল নষ্ট করে দেয়

বিছাপোকা : এ পোকার কীড়া গাছের পাতার সবুজ অংশ খেয়ে কেবল শিরা রেখে দেয়। গাছ দুর্বল হয়, ফলন কমে যায়।

ইপিলাকনা বিটল : পূর্ণবয়স্ক পোকা এবং গ্রাব পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে ঝাঁঝরা করে ফেলে।

জাবপোকা : এ পোকা গাছের কচি ডগা ও পাতার রস শুষে ক্ষতি করে।

পাউডারি মিলডিউ : এ রোগের আক্রমণে পাতায় সাদা বা ধূসর বর্ণের পাউডার দ্বারা ঢেকে যায় এবং পাতা নষ্ট হয়ে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে, ফুল ও ফল কমে যায়

ডাউনি মিলডিউ : এ রোগের আক্রমণের ফলে পাতার নিচে ধূসর বেগুনি রঙের দাগ দেখা যায়। উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় এ রোগ ছড়ায়। রোগের বেশি আক্রমণে গাছ মরে যায়।

ফসল সংগ্রহ : বীজ বপনের ৫০-৬০ দিন পর থেকে ফসল সংগ্রহ শুরু করা যায় এবং তা মাস দু'য়েক অব্যাহত থাকে। কচি অবস্থায় বীজ শক্ত হওয়ার পূর্বেই একদিন পর পর ফসল সংগ্রহ করা উচিত।

ফলন : প্রতি আইলে ১০-১৫ কেজি।

ক. চারা পাতলাকরণের উপকারিতা ;
খ. সুস্থ সবল গাছ পাওয়া যায় ;
গ. গাছ পরিমিত খাদ্য পায় ;
ঘ. রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হয় ;
ঙ. গাছ আলো-বাতাস ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে ;
চ. ফলন ও ফলনের মান বাড়ে।

৯.৭. ঝিঙা

৯.৭.১. ঝিঙার জাত

ক. ফিল্ড চ্যাম্পিয়ন
খ. লম্বা ঝিঙা
গ. বার পাতা

৯.৭.২. ঝিঙা চাষের মাটি

সব ধরনের মাটিতে ঝিঙা চাষ করা যায়। তবে দোঁআশ মাটি বেশি উপযোগী।

৯.৭.৩. উৎপাদন পদ্ধতি

আইল তৈরি : আইল ভালোভাবে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে আইলের মাটি নরম ও ঝুরঝুরে করতে হয়। আইল সরু হলে ১.০ মিটার দূরত্বে মাদা তৈরি করে মাদায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার দিতে হয়। আইলে উঁচু জায়গা তৈরি করেও ঝিঙা চাষ করা যায়। এ ছাড়া জমির চারকোণায় উঁচু জায়গা তৈরি করে ঝিঙা চাষের উপযোগী করা যায়।

মাদার আকার : ২০×২০×২০ ঘন সেন্টিমিটার।

উঁচু জায়গার আকার : ৩০×৩০×৩০ ঘন সেন্টিমিটার।

সারের নাম	প্রয়োগের পরিমাণ (গ্রাম)
গোবর	১০০০
ইউরিয়া	৫০
টিএসপি	৩০
এমপি	৩০

সার ব্যবহারের নিয়ম : আইল তৈরির সময় সব গোবর, টিএসপি এবং ১০ গ্রাম এমপি আইলের মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। ইউরিয়া সার এবং অবশিষ্ট এমপি দু'ভাগে ভাগ করে ১ম ভাগ বীজ গজানোর ১৫ দিন পর এবং ২য় ভাগ বীজ গজানোর ৩০ দিন পর উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

বীজ বপনের হার : প্রতি আইলে ১০ গ্রাম বা ২২টি গাছ।

বীজ বপন : ঝিঙার বীজ গজাতে বেশ সময় লাগে। তাই বীজ বপনের পূর্বে বীজ পানিতে ৮-১০ মিনিট ভিজিয়ে নিতে হয়। এতে বীজ সহজে গজায়। প্রতি মাদায় ৩-৪টি করে বীজ বপন করতে হয়।

বীজ বপনের সময় : ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস।

অঙ্কুরোদগমের সময় : ৫-৭ দিন।

দূরত্ব : গাছ থেকে গাছ ১ মিটার।

আগাছা দমন : আইলে আগাছা জন্ম নেয়ার সাথে সাথে দমন করতে হয়।

শূন্যস্থান পূরণ : কোনো স্থানে বীজ না গজালে সেখানে পুনরায় নতুন করে বীজ বপন করতে হয়।

সারের উপরিপ্রয়োগ : বীজ গজানোর পর সময়মতো ইউরিয়া এবং এমপি সার উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

মাটি আলগাকরণ : সার প্রয়োগের পর আইলের মাটি ভালোভাবে আলগা করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

বাউনি/মাচা দেয়া : গাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে বাউনি এবং ছোট মাচা দিতে হয়

পোকা দমন

বিটল গাছের পাতা খেয়ে ক্ষতি করে, গান্ধী পোকা পাতার রস চুষে খায়, মাছি ফল নষ্ট করে দেয়।

রোগ দমন

পাউডারি মিলডিউ : পাতার উপরে কাণ্ডে এবং ফলে সাদা সাদা পাউডার দেখা যায় যা পাতা নষ্ট করে দেয়, রোগের আক্রমণে ফল ছোট হয়। ফলন কমে যায়।

ডাউনি মিলডিউ : পাতার নিচের দিকে ধূসর বেগুনি রঙ ধারণ করে। আক্রান্ত পাতা ও গাছ দুর্বল হয়ে মরে যায়।

ফসল সংগ্রহের সময় : বীজ বপনের ৪৫-৫৫ দিন পর থেকে ফসল সংগ্রহ শুরু করা যায়

ফলন : প্রতি আইলে ২৫-৩০ কেজি।

৯.৮. চিচিঙ্গা

৯.৮.১. চিচিঙ্গার জাত

ক. খাটো জাত ও লম্বাজাত
খ. বুমলং
গ. সাভারি সাদা
ঘ. সাদা ডোরাকাটা
ঙ. সবুজ ডোরাকাটা

৯.৮.২. চিচিঙ্গা চাষের মাটি

উর্বর দোআঁশ মাটিতে চিচিঙ্গা সবচেয়ে ভালো হয়। প্রচুর জৈব সার প্রয়োগ করে আইল তৈরি করতে হয়।

৯.৮.৩. উৎপাদন পদ্ধতি

আইল নির্বাচন : চিচিঙ্গা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই স্যাঁতসেঁতে মুক্ত উঁচু এবং চওড়া আইল নির্বাচন করতে হবে।

আইল তৈরি : সম্পূর্ণ আইল কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাটি নরম ও ঝুরঝুরে করে নির্দিষ্ট দূরত্বে আইলে মাদা তৈরি করে চিচিঙ্গা চাষ করা যায়। আইল তৈরির সময় প্রয়োজনীয় সার মাদায় বা ছিপে প্রয়োগ করতে হয়। এ ছাড়াও আইলের চার কোণায় চারটি উঁচু জায়গা তৈরি করেও চিচিঙ্গা চাষ করা যায়।

দূরত্ব : গাছ থেকে গাছ ১ মিটার।

মাদার আকার : ২০×২০×২০ ঘন সেন্টিমিটার।

উঁচু স্থানের আকার : ৩০×৩০×৩০ ঘন সেন্টিমিটার

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ : মাদা প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নরূপ

সার প্রয়োগ সময়	সারের নাম ও পরিমাণ			
	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)
মাইল তৈরির সময় বীজ বপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	২	-	১৫	৫
১ম উপরিপ্রয়োগ চারা গজানের ১৫-২০ দিন পর	-	৫	-	-
২য় উপরিপ্রয়োগ চারা গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর	-	১০	-	১০

বীজ বপনের হার : প্রতি আইলে ১৫-২০ গ্রাম।

বীজ বপনের সময় : মার্চ-এপ্রিল মাস।

বীজ বপন : প্রতি মাদায় উঁচু জায়গায় ৩-৪টি করে বীজ বপন করতে হয়। বীজ বপনের পূর্বে বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়।

বীজ বপনের গভীরতা : ১.৫-২ সেন্টিমিটার।

অঙ্কুরোদগমের সময় : ৫-৭ দিন।

সারের উপরিপ্রয়োগ : মাদাতে সময়মতো প্রয়োজনীয় সার উপরিপ্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের পর পানি সেচ দিতে হয়।

চারা পাতলাকরণ : বীজ গজানোর পর চারা ১২-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা হলে প্রতি মাদায় ১টি করে সুস্থ সবল চারা রেখে বাকি চারা উঠিয়ে ফেলতে হয়।

বাউনি দেয়া : চারা ১৫-২০ সেন্টিমিটার লম্বা হলে বাঁশের কঞ্চি, ধৈঞ্চা গাছ বা অন্য কোনো ডাল দিয়ে গাছ মাচায় উঠার জন্য বাউনি দিতে হয়।

মাচা দেওয়া : বাউনি দেয়ার পরপরই আইলে খুব ছোট করে মাচা তৈরি করে দিতে হয়। আইলে লম্বালম্বিভাবে মাচা দিতে হয় যাতে করে মাচার ছায়া ধান ক্ষেতের ক্ষতি না করে। মাচার প্রস্থ ১.৫ মিটার এবং লম্বা প্রয়োজনমতো হলে ভালো হয়।

পোকা দমন

রেড পাম্পকিন বিটল : পূর্ণবয়স্ক পোকা পাতা খেয়ে গোলাকার ছিদ্র করে দেয়। এতে চারা গাছ মারা যেতে পারে। শূককীট মাটিতে থাকে এবং বড় গাছের শিকড় খেয়ে ক্ষতি করে।

ইপিলাকনা বিটল : পূর্ণবয়স্ক পোকা এবং গ্রাব পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। ফলে পাতা বিবর্ণ জালের মতো দেখা যায়। এ পোকা দেখা মাত্রই হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলতে হয়।

ফলের মাছি : এ পোকার আক্রমণে ফল পচে এবং অকালে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত ফল বিকৃত হয়।

রোগ দমন

পাউডারি মিলডিউ : এ রোগের আক্রমণে পাতার উপরিভাগে সাদা পাউডারের মতো আবরণ পড়ে। অনেক সময় গাছ মারা যায়।

ফসল সংগ্রহ : বীজ বপনের ৫০-৬০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ শুরু করা যায়। কচি অবস্থায় চিচিঙ্গা সংগ্রহ করতে হয়। প্রায় দেড় মাসব্যাপী ফল সংগ্রহ করা যায়।

৯.৯. শসা

শসা একটি অতি প্রাচীন সবজি। বর্তমান কালে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে শসার চাষ হচ্ছে শসার বৈজ্ঞানিক নাম *Cucumis sativus* যা Cucurbitaceae গোত্রভুক্ত।

কচি শসা সালাদরূপে ও সরাসরি খাওয়া। পরিপক্ব ভালো রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। পাশ্চাত্যে খুব কচি শসার আচার তৈরি করে। গাছে ভালোভাবে পাকানো শসা কিছুদিন সংরক্ষণ করা চলে।

বাংলাদেশে শসা উৎপাদনকারী জেলা হিসেবে রংপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, খুলনা ও ঢাকা উল্লেখযোগ্য।

৯.৯.১. শসার জাত

ছোট, বড়, দীর্ঘ, বেঁটে, গাঢ় সবুজ ও হালকা সবুজ, প্রভৃতি নানা বৈশিষ্ট্যের শসা আছে। উৎপাদনের সময় অনুসারে শসা দুটি প্রধান জাতে বিভক্ত। যথা– ভূঁয়ে শসা ও বর্ষাতি শসা। ভূঁয়ে শসা ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে বপন করে এপ্রিল-জুন মাসে সংগৃহীত হয় এবং ভূমির উপরেই গাছ থাকে। গাছ ও ফল ক্ষুদ্রাকার। বর্ষাতি শসা এপ্রিল-জুন মাসে বপন করে জুন হতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পাওয়া যায়। এ শসা মাচায় তুলে দেওয়া হয়। খিরা এক প্রকারের শসা। আকারে ছোট এবং কাঁচা অবস্থায় সরাসরি কিংবা সালাদরূপে খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ শসা ভূঁয়ে শসার মতো ভূমির উপর থাকে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস বপনের সময়।

আমেরিকার কয়েকটি শসার জাত : মার্কেটার, নায়াগ্রা, কলোরেডো, বার্পী হাইব্রিড, পামটে, ন্যাশনাল পিকলিং, সিকাগো পিকলিং, মডেল ও ইয়ার্ক টেস্ট পিকলিং ইত্যাদি।

৯.৯.২. উৎপাদন পদ্ধতি

হেক্টর প্রতি ৬০০-৭০০ গ্রাম বীজ দরকার পড়ে। ভূঁয়ে শসার জন্য ১.৫-১.৮ মিটার অন্তর এবং মাচা শসার জন্য ২.১-২.৪ মিটার অন্তর মাচা তৈরি করতে হয়।

সার প্রয়োগ : হেক্টর প্রতি ৪-৫ টন গোবর, ১৭০-১৮৫ কেজি ইউরিয়া এবং ১২০-১৫০ কেজি টিএসপি ও ১০০-১৫০ কেজি এমপি সার ব্যবহার করা চলে।

পানি সেচ ও নিকাশ : বসন্ত ও শীতকালীন শসা, যথা– ভূঁয়ে শসা ও খিরা ইত্যাদিতে প্রচুর পানি সেচের প্রয়োজন। পানি নিকাশের জন্য নালা রাখতে হয়। আগাছা বাছাই ও পরিচর্যা কাজের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

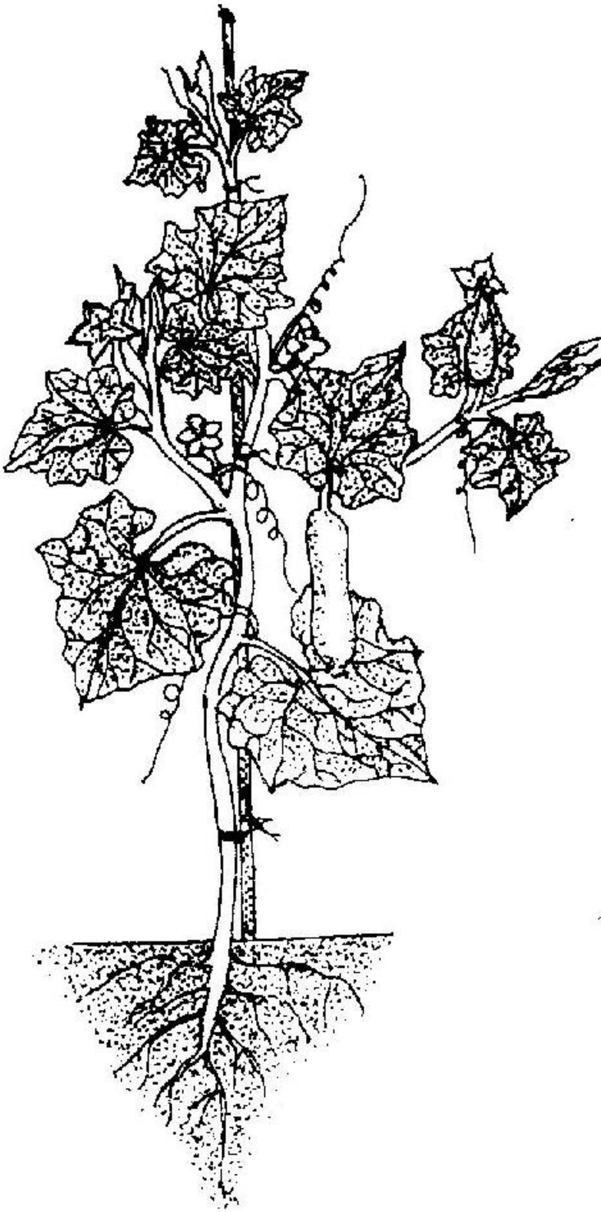

চিত্র ৯.৩ : পূর্ণাঙ্গ শসা গাছ

পোকা দমন : লাল পোকা, কাঁটালে পোকা, মাছি পোকা ও মাজরা পোকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাজরা পোকার কীড়া কাণ্ড ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে। এসব পোকা দমনের জন্য ডাইব্রাম কিংবা ডিপটেরেক্স ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোগ দমন : ডাউনি মিলডিউ, পাউডারি মিলিডিউ, এনথ্রাকনোজ বা ফল পচা রোগ এবং মোজাইক প্রভৃতি প্রধান রোগ। এদের দমনের জন্য আগাছা ও আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করা ভাইরাস বহনকারী পোকা বিনষ্ট করা এবং প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা দরকার নায়াগ্রা, বাপী হাইব্রিড, ইয়র্ক স্টেট পিকলিং, ওহাইও এম আর ১৭ প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধী জাত।

ফসল সংগ্রহ : চাকু দ্বারা বোঁটা কেটে শসা সংগ্রহ করতে হয়। সালাদ, আচার ইত্যাদির জন্য ব্যবহার্য শসা বেশ কচি অবস্থায় তোলা উচিত। প্রতিদিনই বা দু' একদিন পর পরই সংগ্রহ করা যায়।

ফলন : কচি অবস্থায় শসা সংগ্রহ করা হলে গাছে অধিক সংখ্যায় ফলে। শসা হেক্টর প্রতি শসার ফলন ৭-১৫ টন।

৯.১০. ক্ষীরা

৯.১০.১. ক্ষীরা চাষে মাটি

উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জৈব উপাদান (গোবর, কম্পোস্ট ইত্যাদি) মিশ্রিত মাটি।

৯.১০.২. উৎপাদন পদ্ধতি

বপনের সময় : এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বর

দূরত্ব : প্রতি ঢিবিতে ২-৩ ফুট।

বীজ বপনের গভীরতা : $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি থেকে ১ ইঞ্চি।

গজানোর সময় : ৪-৮ দিন

বপনের নিয়ম : প্রতি ঢিবিতে পাঁচ-ছয়টি বীজ বপন করতে হয়। চারা উঠার পর সবচেয়ে ভালো দু-তিনটি চারা রেখে বীজগুলো তুলে ফেলতে হয়

যত্ন : শীতকালে শসা ও ক্ষীরা মালচ দেয়া ঢিবি কিংবা বেড়ে ফলানো যায়। বর্ষাকালে কোনো ডাল বা মাচার সাথে বেঁধে দিন যাতে মাটিতে পড়ে না থাকে।

ফসল সংগ্রহ : বপনের ৩ মাস পর ফল ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা হলেই পেড়ে নিন। দীর্ঘ সময় ধরে ফলন পাওয়ার জন্য পুনঃপুনঃ ফল সংগ্রহ করতে হয়। বীজ সংগ্রহ করা সহজ।

৯. ১১. স্কোয়াশ

৯.১১.১. স্কোয়াশ চাষে মাটি

উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জৈব উপাদান (গোবর, কম্পোস্ট, পচা পাতা) মিশ্রিত যে কোনো ধরনের মাটি।

৯.১১.২. উৎপাদন পদ্ধতি

বপনের সময় : আগস্ট-নভেম্বর

দূরত্ব : প্রতি ঢিবিতে ২ চারা , ৩ ফুট ঢিবি থেকে ঢিবি

বীজ বপনের গভীরতা : ১ ইঞ্চি

গজাতে সময় লাগে : ৪-১০ দিন

বপনের নিয়ম : প্রতি ঢিবিতে পাঁচ-ছয়টি বীজ বপন করতে হয়। চারা গজানোর পর সবচেয়ে ভালো দুটি চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হয়।

যত্ন : মিষ্টি কুমড়া মালচ দেয়া ঢিবি কিংবা বেড়ে করা যায় অথবা জায়গা বাঁচানোর জন্য মাচাতেও করা যায়। বেশি পানি দিলে অতিরিক্ত পাতা হয় কিন্তু ফল কম হয়। পাতা খুব বেশি হলে ডগা ভেঙে দিতে হয়।

ফসল সংগ্রহ : বপনের ২ মাস পর পাতা ও ডগা সংগ্রহ করা যায়। চার মাস পরে ফল সংগ্রহ করা যায়।

দশম অধ্যায়

কপি গোত্রের সবজি

১০.০. কপি গোত্রের সংজ্ঞা

Brassica oleracea প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ফসলসমূহকে সমষ্টিগতভাবে কপি গোত্রের সবজি বা কোল সবজি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। Cole এর বাংলা প্রতিশব্দ 'কপি' এজন্য এ প্রজাতির সব সবজিকে কপি গোত্রের সবজি বলে অভিহিত করা যেতে পারে

১০.১. কপির শ্রেণিবিভাগ

একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও কপি গোত্রে বিভিন্ন সবজির দৈহিক গঠনে প্রচুর ভিন্নতা রয়েছে। *Brassica oleracea* প্রজাতিকে বিভিন্ন উদ্ভিদতাত্ত্বিক জাতে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার উপজাতে ভাগ করা হয়েছে।

কপি প্রজাতি ও উপজাত

বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	প্রজাতি	উপজাত
সবুজ বাঁধা কপি	White cabbage	*capitata*	*alba*
লালকপি	Red cabbage		*rubra*
কুঁকড়ানো পাতার বাঁধা কপি	Savoy cabbage	*sabauda*	
ফুলকপি	Cauliflower	*botrvis*	*cauliflora*
ব্রোকোলি	Sprouting broccoli		*cymosa*
ব্রোকোলি	Brusseis sprout	*gemmifera*	
ওলকপি	Kholrahi, Knolkhol	*gongylodes*	
পাতাকপি	Curly kale	*acephala*	*laciniata*
পাতাকপি	Smooth leaved kale		*plana*
পাতাকপি	Thousand head kale		*millecapitata*
পাতাকপি	Tee kale		*palmifolia*
পাতাকপি	Narrow stem kale		*medullosa*

১০.২. কপি ফসল চাষের পটভূমি

ইউরোপের ভূমধ্যসাগর সংলগ্ন এলাকা গ্রীস এবং এশিয়ার মাইনর অঞ্চলে *Brassica oleracea* var. *oleracae* নামক একটি বন্য ধরনের কপি থেকে উৎপত্তি হয়েছে। বন্য

কপি এখনও ইউরোপের উপকূল অঞ্চলে জন্মাতে দেখা যায়। এর পাতা দেখতে বাঁধাকপির মতো কিন্তু পাতা বাঁধে না।

রোমানদের মাধ্যমে কপির চাষ দক্ষিণ-ইউরোপ থেকে মহাদেশের অন্যান্য এলাকায় বিস্তার লাভ করে। মধ্যযুগে উত্তর আফ্রিকার মুরগন বিভিন্ন জাতের কপির বিস্তারে সহায়তা করেছে। উপমহাদেশে পর্তুগীজরাই কপি সবজি নিয়ে এসেছিলো। পর্তুগীজরা তখন ভারতবর্ষ হয়ে দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ায় বাণিজ্যিক সফরের সময় এসব সবজির বিস্তার ঘটায়।

১০.৩. ফুলকপি

ফুলকপি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় সবজি। এর সাদা মোলায়েম ও দৃঢ়ভাবে সন্নিবিষ্ট পুষ্পমঞ্জরী (curd) সবজিরূপে ব্যবহৃত হয়। এটি ইংরেজিতে Cauliflower এবং উদ্ভিদতত্ত্বে *Brassica oleracea var botrytis* নামে পরিচিত Crucifereae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

১০.৩.১. ফুলকপির উদ্ভিদতত্ত্ব

শিকড় : শিকড়ে মাত্র কয়েকটি প্রধান শাখা এবং বহু সংখ্যক উপশাখা থাকে। উপশাখাগুলো অত্যন্ত সরু।

কাণ্ড : মোটা, খাটো এবং রসালো টিস্যু দিয়ে তৈরি। পূর্ণবয়স্ক গাছের কাণ্ড সাধারণত ২০-২৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ হয়।

পাতা : চারা অবস্থায় পাতায় বোঁটা থাকে। কিন্তু বয়স্ক গাছের পাতা প্রায় বোঁটাবিহীন। পাতার ফলক লম্বাটে এবং কোনো কোনো জাতে পাতা ঢেউবিশিষ্ট।

ফুল, ফল ও বীজ : ফুলকপি গাছের ফুলকে কার্ড (curd) বলে। উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবেচনায় এটি পুষ্পমঞ্জরি নয়, বরং পুষ্পমঞ্জরির পূর্বাবস্থা। এজন্য একে প্রাকমঞ্জরি বলা যেতে পারে।

প্রাকমঞ্জরি ফুলকপি গাছের বৃদ্ধি কেন্দ্রের শাখারিত ও টিস্যুতে পরিবর্তিত রূপ কাণ্ডের অগ্রভাগ বা মঞ্জরির বৃন্ত বিভিন্ন টিস্যুর বৃদ্ধির ফলে স্ফীত হয়ে উঠে। বৃন্তের মূল অক্ষ খুব বেশি লম্বা হয় না। মোটামুটি একই স্থান থেকে শাখাসমূহ বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে প্রাকমঞ্জরি ছাতার আকৃতি ধারণ করে। গাছ দৈহিক বৃদ্ধি শেষ হবার পর পুষ্পমঞ্জরি তৈরি হয়। কিন্তু ফুলকপিতে দৈহিক বৃদ্ধি ও ফুলধারণের মাঝখানে প্রাকমঞ্জরি একটি অতিরিক্ত ধাপ।

১০.৩.২. ফুলকপি চাষে জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু : ফুলকপির সাথে জলবায়ুর তথা তাপমাত্রার সম্পর্ক নিবিড়। ফুলকপি উৎপাদনের সফলতা তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাপমাত্রার প্রভাব বোঝার সুবিধার্থে ফুলকপি গাছের জীবনচক্রকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে, যথা–

১. দৈহিক বৃদ্ধি।
২. প্রাকমঞ্জরি উৎপাদন।
৩. ফল ও বীজ ধারণ।

প্রথম পর্যায়ে গাছ কেবল পাতা উৎপাদন করে এবং আকারে বড় হয়। এ পর্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ১৭-২৪° সেঃ সবচেয়ে উপযোগী। বয়স্ক গাছ অপেক্ষা

চারার উত্তাপ সহিষ্ণুতা কিছুটা বেশি। গাছ দৈহিক বৃদ্ধির পর্যায় থেকে প্রাকমঞ্জুরি উৎপাদন পর্যায়ে তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে কপি গোত্রের উদ্ভিদ দ্বি-বর্ষজীবী হলেও ফুলকপির মধ্যে এমন জাত রয়েছে যেগুলো সম্পূর্ণভাবে বর্ষজীবী এগুলো শীতের আবেশ ছাড়াই ফুল উৎপাদন করতে পারে। বর্ষজীবী জাত উচ্চ তাপমাত্রায় দৈহিক পর্যায় থেকে প্রাকমঞ্জুরি উৎপাদন পর্যায়ে উপনীত হয়। ফুলকপিতে প্রকৃত দ্বিবর্ষজীবী ও বর্ষজীবীর মাঝামাঝি সব ধরনের জাত দেখা যায়।

প্রাকমঞ্জুরি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা : এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

জাত/শ্রেণী	প্রাকমঞ্জুরি উৎপাদনের পাতা সংখ্যা	প্রাকমঞ্জুরি উৎপাদনের জন্য তাপমাত্রা
অতি আগাম	১২-১৫	২০-১৩° সেঃ
আগাম	১৭-২২	১৭-২০° সেঃ
মাঝারি	২০-২৫	১৫-১৭° সেঃ
নাবী	> ২৫	১৫° সেঃ

উল্লেখিত তাপমাত্রায় গাছকে ২০-৩০ দিন উন্মোচিত রাখতে হয়। প্রাকমঞ্জুরি উৎপাদন ও এর বৃদ্ধির জন্য ১৫-২০° সেঃ তাপমাত্রা সবচেয়ে উপযোগী। সাধারণভাবে এ তাপমাত্রা ফুল ধরার জন্যও উপযোগী। হিমাঙ্কে প্রাকমঞ্জুরি সহজেই নষ্ট হয়ে যায় এজন্য শীতপ্রধান অঞ্চলে শীতকালে ফুলকপির চাষ খুব গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ তাপমাত্রায় প্রাকমঞ্জুরির গুণ খারাপ হয় এবং দ্রুত ফুল ধরার পর্যায়ে উন্নীত হয়।

মৃত্তিকা : মাটিতে জৈব পদার্থের আধিক্য ও পানি নিকাশ সুবিধা থাকা দরকার কিছু পরিমাণ অম্লীয় মাটির, PH ৬.৫ থেকে ৭.৫ বিশিষ্ট মাটি এর উপযোগী। প্রশম বিক্রিয়া মাটির ফুলকপির জন্য ভালো। অধিক অম্লীয় অবস্থায় ম্যাগনেসিয়ামের অভাব এবং ক্ষার মাটিতে বোরনের অভাব দেখা দিতে পারে। ফুলকপির জন্য দোঁআশ মাটি সর্বোত্তম। তবে মাটিতে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করে বেলে দোঁআশ ও পলিদোঁআশ মাটিতে ফুলকপির চাষ করা যায়।

১০.৩.৩. ফুলকপির জাত

উৎপাদনের সময় অনুসারে ফুলকপিকে ৩ ভাগ করা যেতে পারে যথা– আগাম, মধ্য ও নাবী। আগাম ফুলকপির জন্য সেপ্টেম্বর মাসেই চারা তৈরি করতে হয়। দেশী জাতের মধ্যে অগ্রহায়ণী এবং বিদেশীজাতের মধ্যে সুপার স্নোবল, স্নোক্যাপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আগাম জাতের গাছ আকারে ছোট হয়। দেশী জাতের মধ্যে পৌষালি চিনকা মোতি, কানোয়ারি প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। বিদেশী জাতের মধ্যে স্নো-ড্রিফট, হোয়াইট মাউন্টেন, স্নোবল-এক্স উল্লেখযোগ্য। ক্রিস্টমাস নাবী জাত।

১০.৩.৩.১ ফুলকপির অন্যান্য জাত : এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

জাতের নাম	উৎস
কার্তিকা	দেশী, ভারত
অগ্রহায়ণী	দেশী, ভারত
পোষালি	দেশী ভারত
পাটনাই	দেশী
রাক্ষুসি লেট	ভারত
ট্রপিক্যাল ইউনিক স্নোবল	জাপান
সুপ্রিম উইন	তাইওয়ান
হোয়াইট এক্সপ্রেস	তাইওয়ান

১০.৩.৩.২. **বাংলাদেশের ফুলকপির উন্নত জাত** : এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

বারি ফুল কপি-১ (রূপা) : দেশী-বিদেশী জাতের ফুলকপির মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ জাত নির্বাচন করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে অবমুক্ত করা হয়।

(১) ফুলকপির ওজন ৮৫০-১০০০ গ্রাম।
(২) ফুলকপির চারদিকে ছোট পাতা দ্বারা আংশিক ঢাকা থাকে।
(৩) উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ২৫-২৮ টন
(৪) কেজি/হেক্টর বীজ পাওয়া যায়।
(৫) ফুলের রঙ ক্রিম বা ঘিয়ে
(৬) ক্ষতিকর পোকা ও রোগের আক্রমণ কম।
(৭) জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।

১০.৩.৪. ফুলকপি উৎপাদন পদ্ধতি

বীজ তলায় বীজ বপন : আগস্টের শেষ হতে নভেম্বরে শেষ পর্যন্ত বীজ বপনের সময়। আগাম ফুলকপির জন্য বর্ষা শেষ হওয়ার আগেই চারা উৎপাদন করতে হয়। ঐ সময়ে ঘরের বারান্দায়, টবে বা গামলায় বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে। পরবর্তী ফুলকপির জন্য বীজ বাইরে বীজ তলায় ফেলা হয়। সাধারণত এক হেক্টরে রোপণের প্রয়োজনীয় সংখ্যক চারা উৎপন্ন করতে ৩৭৫-৭৫০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। প্রমাণ আকারের ৩×১ মিটার বীজতলার জন্য ১২-১৮ গ্রাম বীজ দরকার। বীজ বপন করার তিন চার দিনের মধ্যে চারা অঙ্কুরিত হয়। এর প্রায় এক সপ্তাহ পরে চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরিত করে ৪-৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করা হয়। এক মাসের বয়সের চারা নির্দিষ্ট স্থানে রোপণের উপযুক্ত হয়। ফুলকপি চাষের জন্য ৩০-৩৫ দিন বয়সের চারা লাগাতে হয়। রোপণ দূরত্ব ৬০×৪৪ সেন্টিমিটার দিতে হয়।

জমি তৈরি : মূল জমি পুনঃ পুনঃ চাষ দিয়ে বেশ ঝুরঝুরে করে নিতে হয়। গোবর সার, কম্পোস্ট, খৈল, ছাই ইত্যাদি সারের অর্ধেক পরিমাণ ভূমি কর্ষণ কালে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

সার প্রয়োগ : গোবর সার চারা রোপণের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট গর্তে (২৫×১৫) সেন্টিমিটার প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশালে ভালো হয়। ইউরিয়া ও মিউরেট অব পটাশ সারের মিশ্রণ চারা রোপণের পরে 'টপ-ড্রেসিং' অর্থাৎ উপরি প্রয়োগ পদ্ধতিতে দিতে হয়।

ফুলকপিতে সার প্রয়োগ : এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
সুষম কম পোস্ট গুড় (শক্তি)	৪০০-৬০০ কেজি
অথবা গোবর	৪-৬ টন
ইউরিয়া	৩০০-৩৫০ কেজি
টিএসপি	১৫০-২০০ কেজি
এমপি	১৫০-২৫০ কেজি
জিপসাম	৬০-৮০ কেজি
ডলোচুন	৩০০-৬০০ কেজি
বোরিক এসিড	৮-১০ কেজি
এমোনিয়াম মলিবডেট	৫০০-৮০০ কেজি
দস্তা সার (৩৬%)	৪-৭ কেজি

চারা রোপণ : ৬-৭টি পাতাবিশিষ্ট চারা রোপণ করতে হয়। আগাম ফসলের জন্য ৬০ সেন্টিমিটার পর পর সারিতে ৪০-৫০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে মধ্য ফসলের জন্য ৬০ সেন্টিমিটার পর পর সারিতে ৫০-৬০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে চারা রোপণ করা যেতে পারে চারা রোপণের উপযুক্ত সময় বিকাল।

রোপণের পর চারার গোড়ায় ঝাঁঝরি দিয়ে পানি সেচ দেয়া দরকার। পরদিন সকালে কলার খোল; কচুরিপানা প্রভৃতি দ্বারা ছায়ায় ব্যবস্থা করতে হয়। এ ছায়া বিকালে সরিয়ে চারায় রাতে শিশির পড়ার সুযোগ দিতে হয়। তিন-চার দিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা এবং সকাল-বিকাল পানি সেচ দিতে হয়। তারপর ছায়া সরিয়ে ফেলা হয় এবং পানিসেচ কেবল বিকালে দিলেই চলে। মাটিতে 'জো' আসলে গাছের সারির মধ্যবর্তী স্থানে গাছের গোড়ায় মাটি উঠিয়ে, ভেঙ্গি করে দেয়া দরকার। রোপণের প্রায় দু'মাসের মধ্যে গাছে ফুল দেখা দেয়। ফুল দেখা দেয়ার ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে ফুলকপি খাওয়ার উপযুক্ত হয়।

১০.৩.৪.১. বারি ফুলকপি (রূপা) চাষ পদ্ধতি : এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো

মাটি : আগাম ফসলের জন্য দোঁআশ এবং নাবি ফসলের জন্য ভারী মাটি উত্তম এটেল দোঁআশ মাটিতে প্রচুর জৈব সার প্রয়োগ করে ভালো ফসল জন্মানো যায়।

সারের মাত্রা ও সার প্রয়োগ : ফুলকপি চাষের জন্য মাঝারি উর্বর মাটিতে হেক্টর প্রতি ৩০০-৩৫০ কেজি ইউরিয়া, ১৩০-১৫০ কেজি টিএসপি, ১৫০-২০০ কেজি এমপি এবং

২৫ টন গোবর সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এছাড়া অম্ল মাটি ৪০০-৭০০ কেজি ডলোচুন এবং যথারীতি অনুসার ঘাটতি মাটিতে প্রয়োগ করতে হয়। জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর, সমুদয় টিএসপি ও অর্ধেক এমপি সার প্রয়োগ করতে হয়। বাকি অর্ধেক গোবর চারা রোপণের এক সপ্তাহ পূর্বে মাদায় দিয়ে মিশিয়ে রাখতে হয়।

ইউরিয়া এবং বাকি অর্ধেক এমপি সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। চারা লাগানোর ৮-১০ দিন পর প্রথম কিস্তি এবং চারা লাগানোর ৩০ ও ৫০ দিন পর অবশিষ্ট সার উপরি-প্রয়োগ করতে হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা : ফসলের নিবিড় যত্ন যেমন আগাছা দমন, সার প্রয়োগ, পানি সেচ নিষ্কাশন এবং চটা ভেঙে দেয়া মাটি ঝুরঝুরে ও বায়ুর চলাচলের উপযোগী রাখা আবশ্যক। ফুলকপির রঙ সাদা রাখার জন্য কচি অবস্থা থেকে চারদিকের পাতা বেঁধে ঢেকে দিতে হয়। ফুল ঢেকে দেয়ার এ পদ্ধতিকে ব্লানচিং (blanching) বলে।

পোকা দমন : ফুলকপির বিভিন্ন পোকার মধ্যে জাবপোকা। পাতা ও ফুলের রস শোষণ করে। এফিডান সেভিন ৫% পোকা দমন করে। সেফস বা নেক্সিয়ন ও (০.৫%) ওষুধও ছিটানো হয়। অন্যান্য পোকার মধ্যে মাছি পোকা ও মথ উল্লেখযোগ্য। এদের দমনের জন্য ফলিথায়ন কিংবা সুমিথিয়ন প্রযোজ্য

রোগ দমন : ফুলকপির রোগের মধ্যে ঢলে পড়া এবং মূলের গিঁট রোগ উল্লেখযোগ্য। এর আক্রমণে রোদের সময় গাছ পাতা ঢলে পড়ে। শিকড় ফুলে স্থানে স্থানে মোটা হয়। প্রতি ৫০ গ্যালন পানির সহিত ২৩০ গ্রাম পরিমাণে ক্যালোমেল মিশিয়ে গাছে ছিটানো ফলপ্রদ। মূল গিঁট রোগ এক প্রকারের নেমাটোড দ্বারা সৃষ্ট। এতে মূলে গিঁট দেখা দেয়। এর আক্রমণে ইথিলিন ডাই-ব্রোমাইড দ্বারা মাঠে ফিউমিগেশন করার প্রয়োজন হয়। মাটিতে চুন প্রয়োগেও উপকার পাওয়া যায়।

অপুষ্টি রোগ : মলিবডেনামের অভাবে **হুইপটেইল** (whiptail) রোগ দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত অম্লীয় মাটিতে এরূপ ঘটতে পারে। হেক্টরপ্রতি ১.২ কেজি পরিমাণে সোডিয়াম কিংবা এমোনিয়াম মলিবডেট প্রয়োগে উপকার এ সমস্যা দূর করা যায়। বোরনের অভাবে বাদামি বর্ণের দাগ হয়। কখনও কখনও বিক্ষিপ্ত ফাঁপা কাণ্ডের সৃষ্টি হয়। অম্লীয় মাটিতে হেক্টর প্রতি ১২-১৫ কেজি পরিমাণে সাধারণ বোরাক্স সোডিয়াম টেট্রাবোরেট প্রয়োগে এ রোগ দমন করা যায়।

বোতামায়ন : বোতামায়ন (Buttoning) রোগে ছোট আকারের গাছে অতি ছোট আকারে ফুল ধরে। নাইট্রোজেনের অভাবে কিংবা খাদ্য উপাদানের ঘাটতিতে এরূপ ঘটতে পারে। অনেক সময় ফুলকপি ক্ষুদ্র আকারের প্রাকমঞ্জরি উৎপাদন করে। এগুলো বিক্রির উপযুক্ত নয়

বোতামায়নের কারণ ও প্রতিকার : এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

১। অকালে ফুলকপি গাছে প্রাকমঞ্জরি উৎপাদিত হওয়াই বোতামায়নের কারণ।

২। আগাম জাতেই বোতামায়ন বেশি হয়।

৩। ফুলকপির প্রাকমঞ্জরি উৎপাদন তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

৪। আগাম জাতের গাছ নিম্ন তাপমাত্রায় উন্মোচিত হলে বোতামায়ন হয়

(৫) বীজতলায় অনধিক ১০ সেন্টিমিটার উঁচু ও মাত্র কয়েকটি পাতাধারী গাছেও বোতাম উৎপাদিত হতে দেখা যায়।
(৬) চারা রোপণ করতে দেরি হলে কিংবা রোপণের পর কোনো কারণে চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হলে বোতামায়নের আশংকা বৃদ্ধি পায়।

প্রতিকার : বোতামায়নের সমস্যা দূর করতে হলে বর্ষজীবী বা আগাম জাত আগাম মৌসুমে লাগাতে হয়। গাছ যাতে দ্রুত বাড়ে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হয়। বর্ষজীবী জাতের চারা এমনভাবে লাগাতে হয় যাতে তাপমাত্রা কমার পূর্বেই আকারে বড় হয়ে যায়।

মখমলায়ন : ফুলকপির প্রাকমঞ্জরি ঢিলে-ঢালা হয়ে মখমলের মতো রূপ ধারণের নাম মখমলায়ন এ অবস্থার প্রাকমঞ্জরি কিছুটা ফেটে যায়, উপরিভাগ ঠাসা, দৃঢ় ও মসৃণ না হয়ে কিঞ্চিত নমনীয় ও উঁচু-নিচু হয়ে যায়। প্রাকমঞ্জরি থেকে সাদা ফুলকুঁড়ি হয়ে উপরের দিকে কিছুটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রাকমঞ্জরি উৎপাদনের সময় তাপমাত্রার উঠানামা বেশি হলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : ফুল ফোটা শুরু হবার পূর্বেই ফুলকপি বেশ দৃঢ় থাকা অবস্থায় তা সংগ্রহ করা উচিত। অন্যথায় কপি ফেটে যেতে পারে কিংবা রং খারাপ হয়ে যেতে পারে। ঠাণ্ডা গুদামে ৩২ ফাঃ তাপে একমাস রাখা যায়। জমি থেকে তোলার প্রায় সপ্তাহ খানেক পূর্বে নেপথলিন এসেটিক এসিড ছিটিয়ে পরে ঠাণ্ডা পরিবেশে দেড় মাস পর্যন্ত ফুলকপি অবিকৃত রাখা যায়।

বীজ উৎপাদন : ফুলকপি খাওয়ার উপযোগী অবস্থায় গাছ মাটিসহ তুলে অন্যত্র রোপণ করলে বীজ উৎপন্ন হতে পারে।

ফুলকপির উন্নয়ন : বাংলাদেশে ফুলকপির জাত উন্নয়নের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা আছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকরা কিছু কিছু স্থানীয় জাতের চাষ করে। বর্তমান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট 'রূপা' নামে একটি জতের উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ জমিতে ফুলকপির বর্ষজীবী আগাম জাতের চাষ হয়। এগুলো চাষে বোতায়মায়ন একটি বড় সমস্যা। প্রতি বছরে এর দরুন কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আগাম জাতসমূহের গাছ প্রাকমঞ্জরি উৎপাদন করার পূর্বে মাত্র কয়েকটি পাতা উৎপাদন করে, ফলে এগুলোর ফলন কম হয়. কোনো কোনো সময় আমদানিকৃত নাবী জাত দেরীতে লাগালে গাছ প্রাকমঞ্জরি উৎপাদন করতে পারে না, অথবা প্রাকমঞ্জরি বের হতে বা হতে তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায় যার ফলে ফসল নষ্ট হয়। উপরোক্ত পরিস্থিতির আলোকে বাংলাদেশের ফুলকপির জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ হওয়া উচিত :

ক. উৎকৃষ্ট গুনসম্পন্ন এবং উচ্চ ফলনশীল মাঝ মৌসুমী জাত উদ্ভাবন করা দরকার।
খ. এমন বর্ষজীবী জাত বিমুক্ত করা যায় গাছ দ্রুত বাড়ে।
গ. জাত এমন হয় যেন উচ্চ (৩০-৩৫° সেঃ) তাপমাত্রায় গাছের বৃদ্ধি তেমন ব্যাহত না হয়।
ঘ. সঙ্কর জাত উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

১০.৪. বাঁধাকপি

বাঁধাকপি একটি পুষ্টিকর সবজি বাংলাদেশের পাতা সবজির মধ্যে বাঁধাকপি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজিতে Cabbage এবং উদ্ভিদতত্ত্বে *Brassica oleracea* var-*capitata* নামে পরিচিত। বাঁধাকপি Cruciferae গোত্রভুক্ত।

১০.৪.১. বিশ্বে বাঁধাকপি উৎপাদন

১০.৪.১.১. বিশ্বে বাঁধাকপি উৎপাদন

সাল	জমি (হাজার হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
১৯৮৯-৯১	১৬৬৯	২৩.৬	৩৯৪৭২
১৯৯৭	২০০৩	২৩.৮	৪৭৭০৮
১৯৯৮	১৯৮৪	২৪.০	৪৭৬৩২
১৯৯৯	১৯৮৩	২৪.০	৪৭৫৭৪

১০.৪.১.২. বিভিন্ন দেশে বাঁধাকপির উৎপাদন (১৯৯৯ সাল)

দেশের নাম	জমি (হাজার হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
চীন	৬৭১	২৫.২	১৬৯০৫
ভারত	২৩০	১৮.৩	৪১১০
রাশিয়া	১৬১	১৭.৬	২৮২৬
ইউক্রেন	৬৭	১৪.৪	৯৬৭
জাপান	৬৬	৪১.০	২৭০০
কোরিয়া	৫৭	৫৩.০	২৯৯২
পোল্যান্ড	৫০	৩৯.৫	১৯৭৪
ইন্দোনেশিয়া	৪৮	২৩.৯	১১৫৬
তুরস্ক	৩২	২২.৯	৭৩২
রুমানিয়া	৩৫	২২.৯	৮০৩
বাংলাদেশ	১১	১০.৩	১১৩
উজবেকিস্তান	১২	৭২.০	৮৬৫
মিশর	-	৫৭.০	৬৩
জার্মানি	১৪	৫১.৭	৭২৭
সুইডেন	-	৪৩.০	২২
নিকারাগুয়া	৪	৩৯.৮	১৭৫
আমিরাত	-	৩৯.০	৩১
নিউজিল্যান্ড	-	৩৫.০	৩৯
কুয়েত	-	৩২.৮	২
মালয়েশিয়া	-	৩৪.৬	৪৫

১০.৪.১.৩. বাঁধাকপির মহাদেশী উৎপাদন (১৯৯৯ সাল)

মহাদেশ	জমি হাজার হেক্টর	ফলন টন/হেক্টর	মোট উৎপাদন হাজার টন
আফ্রিকা	৩৮	২৩.৫	৯০২
উঃ আমেরিকা	১১৮	২২.২	২৬১১
দঃ আমেরিকা	২৫	২২.৬	৫৫৭
এশিয়া	১২৫৪	২৫.২	৩১৬৫৯
ইউরোপ	৫৪৫	২১.৫	১১৭৪৬
ওসেনিয়া	৩	৩২.২	৯৮
মোট	১৯৮৩	২৪.০	৪৭৫৭৪

১০.৪.২. বাংলাদেশে বাঁধাকপি উৎপাদন

১০.৪.২.১. বাংলাদেশে বাঁধাকপির এলাকাভিত্তিক উৎপাদন (১৯৯৭-৯৮)

এলাকা	জমি (হাজার হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
যশোর	১১.৫০	-	১৪১৪৫
রংপুর	১০০০	-	১০৭১৫
খুলনা	৯৭০	-	১৫১১৫
ঢাকা	৯৭০	-	৯৮২৫
রাজশাহী	৭০০	-	৫৬৫০
দিনাজপুর	৭৫০	-	৫৭৩৫
কুষ্টিয়া	৬০০	-	৬৫৭০
চট্টগ্রাম	৬০০	-	৭৭৩৫
কুমিল্লা	৫৫০	-	৪০৭০
সিলেট	৫০০	-	৬৮৮৫
ময়মনসিংহ	৩৯৫	-	৩৬৯৫
বগুড়া	৩৯০	-	২৬৮০
রাঙ্গামাটি	৮০		৫৬৫

Accession No. ২০৮৯৩

১০.৪.২.২. বাংলাদেশে বাঁধাকপি উৎপাদন

সাল	জমি (হাজার হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
১৯৯৩-৯৪	৯.০	-	৮১৩৯০
১৯৯৪-৯৫	৯.২	-	৯০৭৯৫
১৯৯৫-৯৬	১০.১	-	৯৭৪৪০
১৯৯৬-৯৭	১১.০	-	১০৬৬৫৫
১৯৯৭-৯৭	১১.৩		১১২৮৬০৫

১০.৪.৩. বাঁধাকপির উদ্ভিদতত্ত্ব

পাতা : বাঁধাকপির পাতা বৃহদাকার, পুরু এবং প্রায় গোলাকৃতি থেকে কিছুটা লম্বাটে। পাতার উপরিভাগ মসৃণ এবং মোমের একটি পাতলা স্তর দ্বারা আবৃত। স্যাভয় (savoy) জাতীয় বাঁধাকপির পাতা কোঁকড়ানো। গাছে প্রথম দিকে উৎপাদিত পাতা সম্পূর্ণ হওয়ার এবং কাণ্ডের অগ্রভাগে রোজেট-এর আকারে সাজানো থাকে। গাছের বৃদ্ধি এক পর্যায়ে পৌঁছলে পাতা প্রসারিত না হয়ে অগ্রভাগ ভিতর দিকে বেঁকে থাকে। ক্রমে পরপর সংযোজিত হয়ে এসব পাতা বাঁধাকপির মাথা উৎপন্ন করে। উদ্ভিদতাত্ত্বিক দিক দিয়ে মাথা একটি বৃহদাকার অগ্রমুকুল। জাতভেদে ১০ থেকে ৩০টি পাতা উৎপাদিত হওয়ার পর মাথার গঠন শুরু হয়।

কাণ্ড : বাঁধাকপির কাণ্ড খাটো ও মোটা। চারা অবস্থায় কাণ্ড সরু থাকে, তখন এর পর্ব দেখা যায়। বৃদ্ধির সাথে সাথে কাণ্ড ক্রমশ মোটা হতে থাকে কিন্তু দৈর্ঘ্যে বাড়ে না, ফলে পাতা কাণ্ডের উপর এমনভাবে সংযোজিত হতে থাকে যাতে পর্ব আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ফুল উৎপাদনের সময় হলে কাণ্ড দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অগ্রভাগে ফুল ধারণ করে।

শিকড় : বাঁধাকপির শিকড় এক ধরনের ভ্রূণমূল। তবে চারা রোপণের সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভ্রূণমূল নষ্ট হয়ে প্রধান শিকড় বের হয় এবং শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে। অনুকূল পরিবেশে শিকড় মাটির নিচের দিকে ১.৪ মিটার ও পাশের দিকে ৭৫ সেন্টিমিটার বিস্তার লাভ করতে পারে।

ফুল : অনুকূল পরিবেশে উদ্ভিদের অগ্রমুকুল পুষ্পমুকুলে রূপান্তরিত হয়। এতে মাথা ফেটে যায় এবং ডাল শাখায় বিকশিত হয়ে পুষ্পমঞ্জরি বেরিয়ে আসে। মঞ্জরি বের হওয়া সহজ করে দেয়ার জন্য মাথার উপরিভাগ কেটে দেয়া ভালো। বাঁধাকপির পুষ্পমঞ্জরি রেসিমজাতীয়। প্রতিটি মঞ্জরিতে কয়েক হাজার ফুল থাকে। ফুল মঞ্জরির নিচের দিক থেকে ক্রমান্বয়ে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। ফুল ফোটা একমাস পর্যন্ত চলতে থাকে। ফুলে ৪টি বৃতাংশ, ৪টি হলুদ রঙের পাঁপড়ি এবং ৬টি পুংকেশর থাকে।

ফল ও বীজ : বাঁধাকপির ফল সিলিকুয়া। দৈর্ঘ্যে ১০ সেন্টিমিটার। প্রত্যেক ফলে ১০-২০টি বীজ থাকে। ফল পাকলে ফেটে যায়। ফুল ফোটার সময় থেকে বীজ পাকতে ৭-৮ সপ্তাহ সময় লাগে। বাঁধাকপির বীজ গোলাকৃতি এবং বর্ণ নীলাভ বাদামি বর্ণের।

ফুল ও বীজ ধারণ : শীতপ্রধান অঞ্চলে নিম্ন তাপমাত্রায় উন্মোচিত না হলে ফুল উৎপাদন করতে পারে না। এগুলোকে দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ বলে। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর জীবনচক্র পূর্ণ হতে দু'বছর লাগে। বীজ উৎপাদনের জন্য এসব ফসল পূর্বে লাগানো হয়, এতে শীতকালীন উদ্ভিদের শৈত্যের চাহিদা পূরণ হয় এবং শীতের শেষে গাছে ফুল আসে। দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদে ফুল ধরার উপর নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাবকে হিম্যাবেশন বলা হয়। ফল ধরার জন্য কপি গোত্রের সব সবজিতেই হিমাবেশন প্রয়োজন হয়। আজকাল গ্রীষ্মকালীন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এদের শৈত্যের চাহিদা কম। বাঁধাকপির হিমাবেশনের জন্য শৈত্যের চাহিদা জাতের উপর নির্ভর করে। তাপমাত্রা ১৫° সেঃ-এর যত কম হয় হিমাবেশন তত দ্রুত সম্পন্ন হয়। আগাম জাতে নাবী জাতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রায় হিমাবেশন হয়ে থাকে। বাঁধাকপিতে হিমাবেশনের দ্রুততা গাছের আকারের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে বাঁধাকপির যেসব জাতের চাষ হয় সেগুলো শীতপ্রধান অঞ্চলে উদ্ভাবিত। এগুলোর মধ্যে নাবী জাত আমাদের দেশে ফুল উৎপাদন করতে পারে না। শীতের মাত্রা ও স্থায়িত্বকাল অধিক হওয়ায় দেশের উত্তরাঞ্চলে ফুল উৎপাদনের সম্ভাবনা অধিক। বাংলাদেশে প্রবর্তিত প্রভাতী জাতে অকাল ফুলধারণ সমস্যা রয়েছে।

পরাগায়ন ও বীজ ধারণ : বাঁধাকপি একটি পর-পরাগায়িত উদ্ভিদ। পতঙ্গের মাধ্যমে পরাগায়ন হয়। পরাগায়নের পর থেকে গর্ভাধান শেষ হতে প্রায় ৫দিন সময় লাগে। পরাগের অঙ্কুরোদগমের জন্য ১৫-২০° সেঃ তাপমাত্রা দরকার। তাই তাপমাত্রা অনুকূল না হলে গাছে ফুল উৎপাদিত হলেও তা থেকে বীজ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তাপমাত্রা এদেশে বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা। তাপমাত্রা ২৫° সেঃ-এর উপরে গেলেই পরাগের সজীবতা নষ্ট হতে থাকে। সেই সাথে বীজের ফলন কমে আসে। উচ্চ তাপমাত্রার সাথে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতার আধিক্য আরও ক্ষতিকর।

স্বঅসঙ্গতি এবং পুংবন্ধ্যাত্ব : বাঁধাকপির সব জাতেই বিভিন্ন মাত্রায় স্বঅসঙ্গতি (self incompatibility) বিদ্যমান। অসঙ্গতির দরুণ একটি গাছের পরাগ দ্বারা নিজের ফুলের পরাগায়ন কার্যকরী হয় না। ক্রোমোজমের একই লোকাসে অবস্থিত একটি জিন অসঙ্গতির প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

১০.৪.৪. বাঁধাকপি চাষে জলবায়ু ও মাটি

বাঁধাকপির ভৌগোলিক বিস্তার প্রশস্ত। বিষুবরেখা থেকে শুরু করে হিমরেখা পর্যন্ত এর চাষ হতে দেখা যায়। ১০ থেকে ২০° সেঃ তাপমাত্রার বাঁধাকপি গাছের বৃদ্ধি সবচেয়ে ভালো হয়। চারা অবস্থায় গাছের উষ্ণতা সহ্য করার ক্ষমতা আছে। নিম্ন তাপমাত্রায় জন্মানো বাঁধাকপি স্বাদে উৎকৃষ্ট। বাংলাদেশে রবি মৌসুমের জলবায়ু বাঁধাকপি চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। অক্টোবরের প্রথম দিকে বীজ বপন করে নভেম্বরে চারা রোপণ করলে ফলন ভালো হয়।

১০.৪.৫. বাঁধাকপির জাত

কপির দেশী ও বিদেশী উভয় ধরনের জাত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আবার আগাম ও নাবী জাত রয়েছে। আগাম জাতের চারা অক্টোবর-নভেম্বর এবং নাবী জাতের চারা ডিসেম্বর মাসে রোপণ করা হয়। বিদেশী জাতের মধ্যে চার্লসটন, ওয়েকফিল্ড, জার্সি

ওয়েকফিল্ড, কোপেন হ্যাগেন মার্কেট, গোল্ডেন একর, আর্লি রাউন্ড ড্রাচ আলফা, অলহেড আর্লি গ্লোবগ্লোরি একস্ট্রা আর্লি এক্সপ্রেস, ইত্যাদি আগাম জাত নাবী জাতের মধ্যে গ্লোব, ম্যারিয়ন মার্কেট বোনাঞ্জ বাঞ্চউইক, কোহিনূর, ড্রামহেড, ভেনিশ বলহেড, ভলগা, রেড ডেনিশ, লার্জ রেড ইত্যাদি কে কে ক্রস ও কে ওয়াইক্রস জাতের বাঁধাকপি গ্রীষ্মকালেও জন্মানো যায়

১০.৪.৫.১. বাংলাদেশে উদ্ভাবিত উন্নত বাঁধাকপির জাত : বাংলাদেশে উদ্ভাবিত বাঁধাকপির ২টি জাত রয়েছে। এসব জাত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো–

(১) বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী) : নির্বাচনের মাধ্যমে এদেশে ফুল ও বীজ উৎপাদনে সক্ষম এজাত উদ্ভাবন করা হয় পরবর্তীতে এজাত 'প্রভাতী' নামে ১৯৮৫ সালে অবমুক্ত করা হয়।

ক. বীজ বপনের ১০০-১১০ দিন পরই সংগ্রহের উপযুক্ত হয়।
খ. প্রতিটি বাঁধাকপির গড়ে ২.০-২.৫ কেজি ওজনের হয়।
গ. বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদিত।
ঘ. হেক্টর প্রতি ৪০০-৫০০ কেজি বীজ উৎপাদন করা যায়।
ঙ. জীবনকাল বীজ বপন থেকে কপি উৎপাদন পর্যন্ত ১০০-১১০।
চ. বীজ উৎপাদনে প্রায় ১৮০ দিন সময় লাগে
ছ. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন হেক্টর প্রতি ৫০-৬০ টন পাওয়া যায়।
জ. বাংলাদেশে সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বীজতলায় বীজ বপন করা যায়
ঝ. বীজ উৎপাদনের জন্য অক্টোবরে বপন করতে হয়।
ঞ. বীজের ভালো ফলন পেতে হলে দেশের উত্তরাঞ্চলেই এর চাষ লাভজনক।

(২) বারি বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত) : দেশী বিদেশী জাতের মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এ জাতটি নির্বাচন করে ১৯৯৮ সালে অবমুক্ত করা হয়।

ক. হেড চ্যাপ্টাকৃতির।
খ. পাতা মোমের আবরণের সময় ন্যায় মাথার।
গ. ২.০-২.৫ কেজি।
ঘ. এ জাতটি এদেশের জলবায়ুতে বীজ উৎপাদন করে।
ঙ. বীজ বপন থেকে কপি উৎপাদন ১১০ দিন সময় লাগে।
চ. হেক্টর প্রতি ফলন ৬০ টন এবং বীজ ফলন ৬০০ কেজি।
ছ. জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।

১০.৪.৬. বাঁধাকপি উৎপাদন পদ্ধতি

চারা রোপণ : সাধারণত বীজ দিয়েই বাঁধাকপির বংশবিস্তার করা হয়। তবে প্রয়োজনবোধে অযৌন পদ্ধতিতেও বংশবিস্তার সম্ভব। কপি সংগ্রহ করার সময় গাছের কাণ্ডের নিম্নাংশ মাটিতে থেকে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই সে অংশ থেকে অনেকগুলো করে গুঁড়িচারা (কাক্ষিক মুকুল) গজায়। মাটি দিয়ে ঢেকে রাখলে এগুলোর গোড়ার দিক থেকে শিকড় গজালে সেগুলোকে আলাদা করে লাগালে এসব চারা থেকে পূর্ণাঙ্গ গাছ উৎপন্ন হয়।

বাঁধাকপির জন্য হেক্টর প্রতি ১৫০-১৮০ গ্রাম বীজ লাগে। বীজ ৩×১ বর্গমিটার আকারে ২০টি বীজতলায় বপন করতে হয়। বীজ বোনার ৪-৬ সপ্তাহ পর চারা রোপনের উপযোগী হয়। বাঁধাকপির জাত ও চাষ মৌসুমের উপর রোপণের দূরত্ব নির্ভর করে। একই জাত রবি মৌসুমে জন্মালে বড় মাথা উৎপাদন করবে।

আগাম জাতের গাছ সাধারণত নাবী জাতের গাছ অপেক্ষা ছোট হয়। তাই পরিস্থিতি অনুযায়ী রোপণের দূরত্ব হয় সারির মধ্যে ৫০-৭০ সেন্টিমিটার এবং চারার দূরত্ব ৪০-৬০ সেন্টিমিটার।

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হয়। রোপণের পর প্রথম দিকে মাটি ঝুরঝুরে রাখতে হয়। এজন্য মাঝে মাঝে বিশেষ করে সেচ দেয়ার পর জমিতে 'জো' আসলে কোদালের পাতলা কোপ দিয়ে জমির চটা ভেঙে দিতে হয়।

সার প্রয়োগ : গোবর সার ও ছাইয়ের সম্পূর্ণ অংশ ভূমি কর্ষণকালে সারা জমিতে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। আবার মাঠে অর্ধেক অংশ প্রয়োগ করে বাকি অর্ধেক চারা রোপণের গর্তে দিতে হয়। খৈল ও সুপার ফসফেট চারার গর্তে রোপণের ২ সপ্তাহ পূর্বে মাটির সাথে মিশাতে হয়। ইউরিয়া সার এবং মিউরেট অব পটাশ সার চারা রোপণের প্রায় দুই সপ্তাহ পরে উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

সার প্রয়োগ মাত্রা : হেক্টর প্রতি ২০০-২২৫ কেজি ইউরিয়া, ৩৫০-৩৭৫ কেজি টিএসপি, ২০০-২৫০ কেজি এমপি এবং ৭-১০ টন গোবর সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। শেষ চাষের সময় সবটুকু কম্পোস্ট, ফসফেট ও পটাশ সার জমিকে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। সম্পূর্ণ ইউরিয়া ও বাকি এমপি সার তিনটি সমান কিস্তিতে ভাগ করে চারা রোপণের ১০দিন, ২৫দিন ও কপি বাঁধার সময় প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
সুষম কমপোস্ট	৪০০-৬০০
ইউরিয়া	২০০-২৫০
টিএসপি	১৫০-২০০
এমপি	১০০-১৫০
ডলোচুন (অম্লমাটি)	৪০০-৬০০
জিপসাম	৬০-৮০
বোরিক এসিড	৮-১১

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

ক. ইউরিয়া ব্যতীত সব সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

খ. ইউরিয়া ২-৩ ভাগে জমি প্রস্তুত, ২০-৩০ দিন পর এবং ৫০-৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

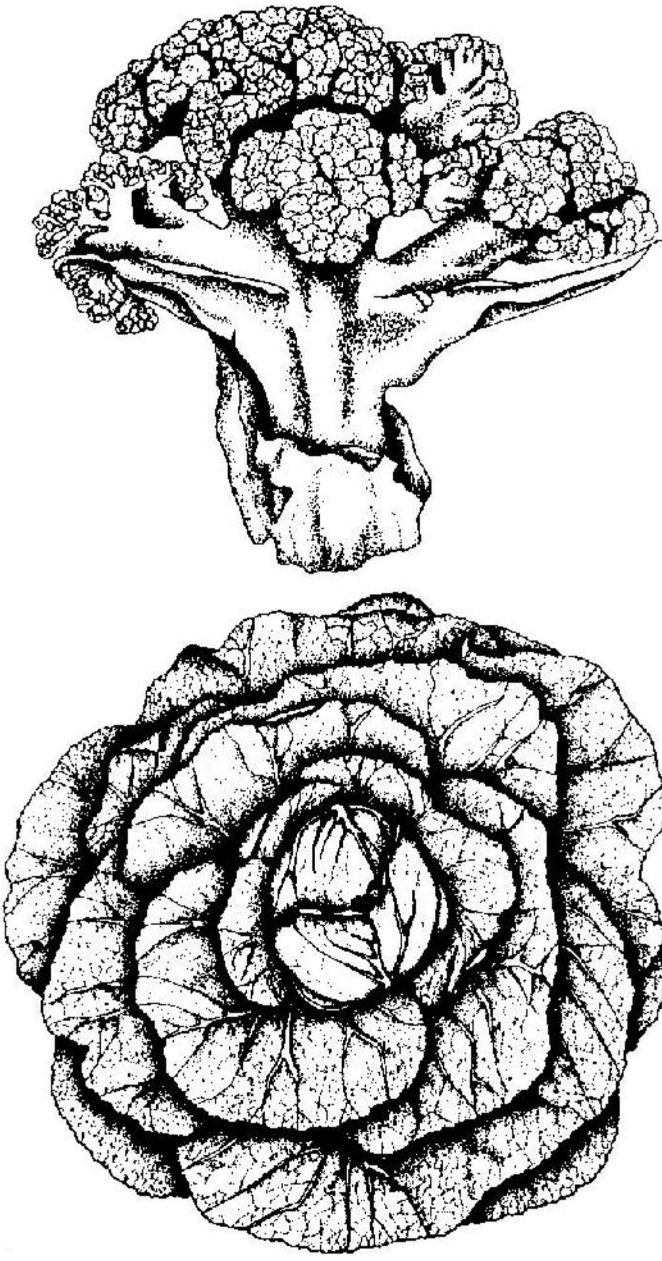

চিত্র ১০.১ : কপি গোত্রের সবজি : ফুলকপি (উপরে) ও বাঁধাকপি (নিচে)

বীজ ফসলের জন্য জমি তৈরি ও চারা রোপণ : গভীর চাষ দিয়ে ঢেলা ভেঙে আগাছা পরিষ্কার করে ভালোভাবে বাঁধাকপির জন্য তৈরি করতে হয়। বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর চারা রোপণের উপযুক্ত হয়। উত্তমরূপে জমি তৈরি করার পর ১৫-২০ সেন্টিমিটার উঁচু ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করতে হয়। পাশাপাশি দুটি বেডের মাঝখানের ৩০ সেন্টিমিটার নালা রাখতে হয়। বীজতলার উপর ৬০ সেন্টিমিটার দূরত্বে সারি করে সারিতে ৪৫ সেন্টিমিটার দূরে দূরে চারা লাগাতে হয়।

সেচ প্রয়োগ : মাটিতে পানির মোট ধারণ ক্ষমতার ৫০-৬০ পানি রাখলে বৃদ্ধি দ্রুততর হয় এবং এর ফলন ভালো হয়।

বীজ উৎপাদন পরিচর্যা : বাংলাদেশে 'প্রভাতী' জাতে বীজ উৎপাদিত হয়। বীজ ফসল উৎপাদনের জন্য সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বীজ বপন করতে হয়।

উত্তরাঞ্চলে একটু দেরিতে বীজ বোনা চলে। বোনার সময় এমনভাবে নির্ণয় করতে হয় যাতে অধিক শীত পড়ার সময় প্রথম দিকে গাছ মাথা উৎপাদন পর্যায়ে উপনীত হয়। পাশের দিকে মাথা কাটা যেতে পারে। মাথার কাটার কয়েকদিনের মধ্যেই পুষ্পমঞ্জরি বের হয়। যেসব গাছ দেরিতে এবং একই সময়ে ফুল দেয় কেবল সেগুলো রাখতে হয়। দুটি বীজ ফসলের ক্ষেতের মধ্যে ৫০০-১০০০ মিটার ব্যবধান রাখা হয়।

কপি গোত্রের অন্যান্য ফসলের মধ্যে এদেশে কেবল ফুলকপির বীজ উৎপন্ন হয়। বাঁধাকপি ও ফুলকপির মধ্যে পর পর ৩০০ মিটার ব্যবধান রাখা উচিত। ফল হলুদ ও ভিতরের বীজ কালো হওয়া শুরু হলেই বীজ ফসল সংগ্রহ করা উচিত।

পোকা দমন : জাবপোকা পাতার রস চুষে। সরুই পোকার (Diamond back moth) ও শুঁয়া পোকা পাতা খায়। চোরা পোকা ও কাটুই পোকার শুককীট চারার গোড়া কাটে। এফিডান ডাস্টিং (.৫%) সেফস কিংবা নেক্সিনের সাহায্যে জাব পোকা, সেভিন, নেক্সিন বা ম্যালাথিয়নের সাহায্যে চোরা, কাটুই ও সরুই পোকা দমন করা যেতে পারে।

রোগ দমন : বাঁধাকপি ঢলে পড়া এবং মূলের গিঁট বা দাগ দেখা যায়।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : আগাম বাঁধাকপি মোটামোটি বাঁধলেই সংগ্রহ ও বাজারজাত করা চলে। এতে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়। পরের দিকে এটি বেশ ভালোভাবে বেঁধে দৃঢ় হলে সংগ্রহ করা উচিত। বাঁধাকপির ঠাণ্ডা গুদামে বেশ কিছু দিনের জন্য রাখা যায়। সচরাচর ৩২^{0} ফাঃ তাপ বাঁধাকপি সংরক্ষণ করে রাখার জন্য উপযোগী হয়।

বাঁধাকপির প্রজনন ও জাত উন্নয়ন : বর্তমানে পরিকল্পিত উপায়ে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী বাঁধাকপির জাত সৃষ্টি করা হচ্ছে। উন্নত জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে বাঁধাকপির ভৌগোলিক বিস্তার ছাড়াও এর ব্যবহার বহুগুণ বেড়েছে। সঙ্কর জাত উৎপাদন এবং বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাত উদ্ভাবন সাম্প্রতিককালে বাঁধাকপি প্রজননে উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে স্বীকৃত।

প্রজনন পদ্ধতি : বাঁধাকপি একটি উচ্চমাত্রার পরপরাগায়িত উদ্ভিদ। সে কারণে এটি খুবই হেটারোজাইগাস। স্বগোত্র-প্রজনন (inbreeding) করলে গাছের তেজ কমে যায়।

বাঁধাকপি এবং সমগোত্রীয় উদ্ভিদে উন্নত জাত তৈরির জন্য সমষ্টি নির্বাচন পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। পুরানো জাতের সমরূপীতা রক্ষা বা ছোট-খাটো সাধারণ উন্নয়নের উদ্দেশ্যেও এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। কোনো জাতের এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটাতেও এ পদ্ধতি খুব কার্যকরী। এ পদ্ধতিতে আকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যধারী গাছ কয়েক ধাপে বাছাই করা হয়।

সঙ্কর জাত উদ্ভাবন : সাম্প্রতিককালে সঙ্করায়িত বাঁধাকপির ব্যবহার খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। জাপানে ব্যবহৃত বীজের শতকরা ৯৫ ভাগের বেশি সঙ্কর জাতের। অন্যান্য দেশেও সঙ্কর বীজের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাপানিরাই সর্বপ্রথম সঙ্করজাত উৎপাদন করে। সাধারণ জাতের তুলনায় সঙ্করজাতের চাষ করে নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়া যায়–

ক. গাছ দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।
খ. ফলন বেশি।
গ. সব গাছ একই রকম হয়।
ঘ. পারিবারিক উপযোগিতা অধিক বিস্তৃত।

নিম্নলিখিত উপায়ে সঙ্কর জাত উৎপাদন করা যায়–

ক. একটি স্ব-প্রজাতির (Inbred) লাইনের গাছকে পরাগায়িত করে।
খ. একই জাতের দুটি স্ব-প্রজাতির লাইনের মধ্যে সঙ্করায়ন করে।
গ. প্রথমে একটি জাতের দুটি লাইনের সঙ্কর তৈরি করে তার সাথে অপর জাতের দুটি লাইন থেকে একইভাবে তৈরি সঙ্করের সাথে সঙ্করায়ন করে।

১০.৫. ওলকপি

বপনের সময় : সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত।

মাটি : গোবর অথবা কম্পোস্ট দিয়ে প্রস্তুত করা যে কোনো মাটি।

দূরত্ব : সারি থেকে সারি ১০ ইঞ্চি থেকে ১২ ইঞ্চি এবং চারা থেকে চারা ৪ ইঞ্চি থেকে ৬ ইঞ্চি দূরত্বে বপন করতে হয়।

বীজ বপনের গভীরতা : $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি

গজাতে সময় লাগে : ৪-৬ দিন।

বপনের নিয়ম : বীজ-বাক্সে অথবা সরাসরি বাগানে বীজ বপন করুন। বীজ-বাক্সে বপন করা হলে চারা প্রায় ২ ইঞ্চি লম্বা হওয়ার পর বাগানে রোপণ করতে হয়।

যত্ন : মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ ও আগাছা দমনের বেডে মালচ দিতে হয়।

ফসল সংগ্রহ : কাণ্ডের গোড়া থেকে দু-তিন ইঞ্চি মোটা ওলকপি তোলা যায় (২-৩ মাস)।

১০.৬. চীনা কপি

পাতা সবজির মধ্যে চীনা কপি বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে। এখানে চীনা কপির জাত উল্লেখ করা হলো।

চিত্র ১০.২ : কপি গোত্রের সবজি : ওলকপি (উপরে) ও চীনা বাঁধাকপি (নিচে)

১০.৬.১. বারি চীনা কপি-১ জাতের বৈশিষ্ট্য

শংকর জাতীয় সবজি নির্বাচন পদ্ধতিতে ১৯৯৬ সনে উদ্ভাবন করা হয়।

ক. শীতকালে বাঁধাকপির মত শক্ত কপি উৎপাদন করে।

খ. গ্রীষ্মকালেও এ জাতটি শাক হিসেবে চাষাবাদ করা যায়।

গ. সালাদ হিসেবে এ সবজির যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে।

ঘ. স্বল্পকালীন সময়ে উত্তোলনযোগ্য।

ঙ. ১.০-১.৫ কেজি।

চ. বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম।

ছ. দ্রুত বর্ধনশীল জীবনকাল ৬৫-৭০ দিন।

জ. বীজ উৎপাদনের জন্য ১০৫-১২০ দিন সময় লাগে।

ঝ. বাংলাদেশের সব এলাকায় শীতকালে এ সবজির চাষ করা যায়। গ্রীষ্মকালে সুনিষ্কাশিত উঁচু জমিতে বেড করে এই জাতের সবজি চাষ করা উত্তম।

চাষ পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয় অনেকটা বাঁধাকপির অনুরূপ।

১০.৭. ব্রোকলি

মাটির অবস্থা : উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জৈব উপাদান (গোবর, কম্পোস্ট ইত্যাদি) মিশ্রিত মাটি হতে হয়।

দূরত্ব : সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৪ ইঞ্চি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৮ ইঞ্চি।

বপনের সময় : আগস্ট থেকে নভেম্বর।

বীজ বপনের গভীরতা : $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি

গজাতে সময় লাগে : ৩-৪ দিন।

বীজ বপনের নিয়ম : বীজ-বাক্স অথবা বীজতলায় বীজ বপন করতে হয়। বপনের প্রায় ৪-৫ সপ্তাহ পর চারা ২ ইঞ্চি লম্বা হলে তা বাগানে রোপণ করতে হয়।

যত্ন : অনেকেই রোপণের পর প্রথম ৩-৪ দিন চারার জন্যে ছায়ার ব্যবস্থা করেন। মাটি আর্দ্র রাখা এবং আগাছা দমনের জন্যে বেডে মালচ দেয়া যেতে পারে। মৌসুমে কয়েকবার তরল সার দিতে হয়।

ফসল তোলা : ক্ষুদ্র হলুদ ফুল ফোটার আগেই প্রথম মাথা কাটতে হয়। মাথা যত বেশি কাটা হয় পুনরায় তত মাথা জন্মাতে থাকে।

১০.৮. মূলা

বাংলাদেশে মূলা উৎপাদনকারী জেলা সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, পাবনা, রংপুর ও নোয়াখালী।

১০.৮.১. মূলার উদ্ভিদতত্ত্ব

মূলার বৈজ্ঞানিক নাম *Raphanus sativus*, Crucifereae গোত্রের অন্তর্গত। এর শিকড় মোচাকার রূপান্তরিক মূল (fusiform root)। মূলার গাছ একটি বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। জাত অনুযায়ী এটি বর্ষজীবী অথবা দ্বি-বর্ষজীবী। মূলার মধ্যে উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য প্রচুর। যেমন—

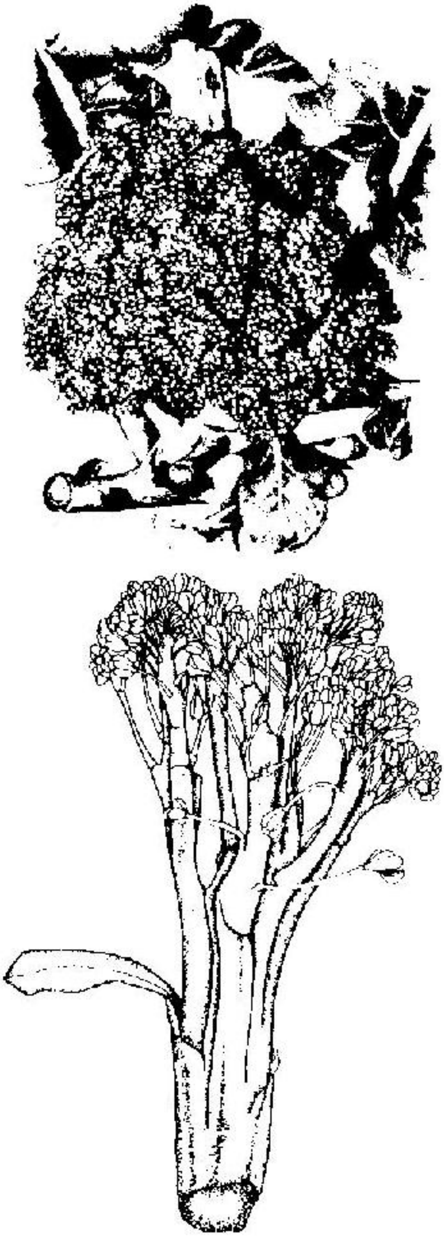

চিত্র ১১.৩ : কপি গোত্রের সবজি : ব্রোকলি (উপরে সম্পূর্ণ পুষ্প মঞ্জরি)

রেডিকুলা (var. *radicula*) : ইউরোপীয় ছোট জাত এটি ক্ষুদ্রাকার প্রধানত ইউরোপে সালাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শাঁস রসালো ও প্রায় শর্করাবিহীন, পাতা লোমশ। বীজ বোনার এক মাসের মধ্যে সংগ্রহের উপযোগী হয়।

মেজর (var. *major*) : ইউরোপীয় মধ্যম জাত। দক্ষিণ ইউরোপে পাওয়া যায়। আকার মধ্যম মূল লম্বাটে ডিম্বাকৃতি অথবা কোণাকৃতি। দৈর্ঘ্যে ১২-১৫ সেন্টিমিটার ও ব্যাসে ৫-৬ সেন্টিমিটার। ৪০-৫০ দিনে এটি সংগ্রহ করা হয়।

নাইজার (var. *niger*) : ইউরোপীয় কালো মূল। রঙ বাদামি, ধূসর অথবা বেগুনি। শাঁস ঝাঁঝালো। পাতা রোমশ ও ছড়ানো। প্রধানত ইউরোপে এর চাষ হয়।

রেফানিট্রয়েডস (var. *raphanitroides*) : চীনা মূলা, চীন ও জাপানের প্রধান জাত। এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

ক. মচমচে
খ. মিষ্টিভাবাপন্ন শাঁস
গ. পারিবেশিক উপযোগিতা বেশি
ঘ. কম শর্করা বিশিষ্ট
ঙ. কম রসালো
চ. কম রোমশ
ছ. পাতা গভীরভাবে খণ্ডায়িত

কডেটাস (*var. caudatus*) : ইঁদুর লেজ মূলা ভারত, পাকিস্তান ও চীনে বেশি দেখা যায়। অপক্ব ফল সালাদ ও সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। এটি একটি বর্ষজীবী উদ্ভিদ।

কাণ্ড : কন্দমূলের অগ্রভাগে মূলার খাটো ও প্রায় অদৃশ্য কাণ্ড রয়েছে। ফুল ধরার সময় কাণ্ড লম্বা হয়ে শাখা-প্রশাখা উৎপাদন করে। ফুলগুচ্ছসহ গাছের উচ্চতা ২ মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

পাতা : মূলার পাতাকে লাইরেট শ্রেণিভুক্ত করা হয়ে থাকে, যদিও জাত অনুযায়ী পাতার ফলকের আকৃতি বিভিন্ন। পাতা দৈর্ঘ্যে ১০-৪৫ সেন্টিমিটার এবং রোজেট আকারে কন্দমূলের উপরে স্থাপিত। পাতা ছড়ানো। পত্রফলক সরল ও বিভিন্ন মাত্রায় খণ্ডিত।

শিকড় : শিকড় মূলার প্রধান ভক্ষণযোগ্য অঙ্গ। কন্দমূলের নিম্নাংশ থেকে খাদ্য আহরণকারী শাখা-প্রশাখা বের হয়। কোন কোন জাতের কন্দমূলের সম্পূর্ণ অংশ মাটির ভিতর থেকে। আকার-আকৃতি ও বর্ণের দিক দিয়ে কন্দমূলের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। কন্দমূলের আকৃতি মোচাকার লাটিমাকার অথবা বেলুনাকার। কন্দমূলের ত্বক সাদা, পার্পল ও লাল হতে পারে। শাঁস অধিকাংশ জাতে সাদা, তবে লাল শাঁসবিশিষ্ট জাতও আছে। কোনো কোনো জাত কন্দমূল উৎপাদন করে না, পাতাই এগুলোর ভক্ষণযোগ্য অঙ্গ।

ফুল, ফল ও বীজ : রেসমজাতীয় মঞ্জরিতে মূলার ফুল উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ ফুলের বর্ণ সাদা। ফলের অগ্রভাগ কোণাকৃতি। ফলে ৬-১২টি বীজ থাকে।

১০.৮.২. বাংলাদেশের মূলার উন্নত জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতসমূহের বর্ণনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

বারি মূলা-১ (তাসাকিসান মূলা) : বারি ১৯৮৬ সালে তাসাকিসান মূলা জাতটি বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

ক. এ জাতের মূলার অর্ধেকের বেশি মাটির উপরিভাগে থাকে।
খ. বেলুনাকৃতি।
গ. পাতায় শুং থাকে না।
ঘ. শাক হিসেবে ব্যবহারের জন্য উপযোগী।
ঙ. বীজ বপনের ৪৫ দিন পর সংগ্রহোপযোগী হয়।
চ. মূলা ৭০ দিন পর্যন্ত আশহীন থাকে।
ছ. এ মূলা গড়ে লম্বায় ৩৫ সেন্টিমিটার ও বেড়ে ৭.৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে
জ. প্রতি মূলার ওজন প্রায় ১ কেজি পর্যন্ত হয়।
ঝ. মূলা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু।
ঞ. দেশীয় আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম।
ট. জীবনকাল মূলার ক্ষেত্রে ৭০দিন।
ঠ. বীজ ফসলের বেলায় ১৫০ দিন।
ড. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন মূলা ৭৫ টন এবং বীজ ১.০-১.৫ টন।

(২) **বারি মূলা-২ বা পিংকি** : এ মূলার জাত ১৯৯৬ সালে অবমুক্ত করা হয়

ক. মূলা দেখতে লালচে।
খ. লম্বাকৃতির
গ. পাতায় শুং কম শাক হিসেবে খাওয়ার উপযোগী।
ঘ. ভিতরে ফাঁপা হয় না।
ঙ. বীজ বপনের ৪৫-৫০ দিন পর থেকেই সংগ্রহোপযোগী হয়।
চ. প্রায় ৭৫ দিন পর্যন্ত তা খাওয়ার উপযোগী থাকে।
ছ. মূলা লম্বায় ৩০ সেন্টিমিটার ও বেড়ে ৭.৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে।
জ. অর্ধেকের বেশি অংশ মাটির উপরিভাগে জন্মে।
ঝ. প্রতি মূলার ওজন ৮৫০-৯৫০ গ্রাম।
ঞ. স্থানীয় আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদন করা যায়।
ট. মূলার ক্ষেত্রে জীবনকাল ৭০ ৮০ দিন
ঠ. বীজ ফসলের ক্ষেত্রে জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন সময় লাগে
ড. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ৬০ টন এবং বীজ ১ টন পাওয়া যায়।

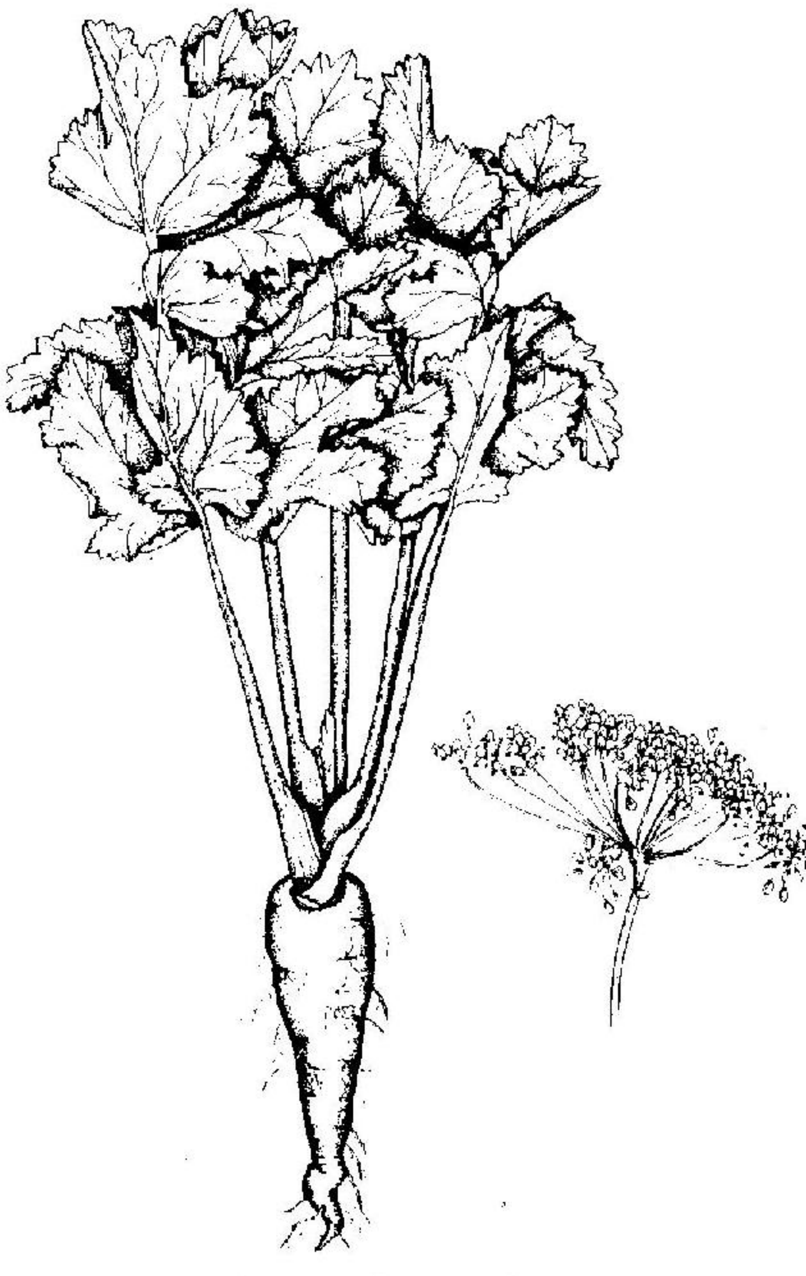

চিত্র ১০.৪ : কপি গোত্রের সবজি : মুলা

(৩) বারি মূলা-৩ (দ্রুতি) : কয়েক বছর নির্বাচনের মাধ্যম এ উচ্চ ফলনশীল জাতটি উদ্ভাবিত করে ১৯৯৮ সালে অবমুক্ত করা হয়।

ক. এ জাতের মূলার রং সাদা।
খ. নলাকার।
গ. মূলের অর্ধেক অংশ মাটির উপর থাকে।
ঘ. এ জাতের মূলা ৪০-৪৫ দিনের মধ্যেই খাবার উপযোগী হয়।
ঙ. মূলার ওজন ৪৫০-৫০০ গ্রাম ও লম্বায় ২৫ সেন্টিমিটার।
চ. পাতার কিনার ঢেউ খেলানো
জ. জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদন করতে পারে।
ঝ. এই জাতটির জীবনকাল ৫৫-৬০ দিন।
ঞ. প্রতি হেক্টরে ফলন ৪০-৪৫ টন ও বীজ ১.২-১.৩ টন।

১০.৮.৩. মূলার উৎপাদন পদ্ধতি

মাটি : দোঁআশ ও বেলে দোঁআশ মাটি মূলা চাষের জন্যে সবচেয়ে ভালো। মাটি অনুযায়ী জমিতে জৈব সার ও রাসায়নিক সার সরবরাহ করে যত্ন নিলে এর চাষ লাভজনকভাবে করা যায়

বীজের হার ও বীজ বপন : সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মূলার বীজ বপন করা যেতে পারে। হেক্টর প্রতি ২.৫-৩.০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। মূলাবীজ ছিটিয়ে বপন করা হয়, কিন্তু সারিতে বীজ বপন করাই ভালো।

সার প্রয়োগ : শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর বা কম্পোষ্ট সার ও টিএসপি সার এবং ইউরিয়া এবং এমপি দিতে হয়। বাকি পরিমাণ ইউরিয়া ও এমপি সার সমান অংশে বীজ বপনের ৩ এবং ৫ সপ্তাহে দিতে হয়।

মূলায় সারের প্রয়োগ মাত্রা : এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
সুষম কমপোস্ট গুঁড়া	৩০০-৫০০ কেজি
ইউরিয়া	১৫০-২০০ কেজি
টিএসপি	১০০-১৫০ কেজি
এমপি	১০০-১৫০ কেজি
জিপসাম	৪০০-৬০০ কেজি
ডলোচুন (অম্লমাটি)	৭০-৮০ কেজি

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা : বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যেই ৩০ সেন্টিমিটার দূরত্বে একটি ভালো গাছ রেখে আর অন্যগুলো তুলে ফেলতে হয়। মাটিতে রস কম থাকলে বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যেই একটি সেচ দেওয়া ভালো।

চারা অবস্থায় জমিতে রসের অভাব হলে ভালো ফসল হয় না। সাধারণত ২ সপ্তাহ পর পর ২-৩ বার সেচ দিলে মূলার ফলন ভালো হয়। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হয়। এজন্যে প্রয়োজন অনুযায়ী নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার ও মাটির চটা ভেঙে দিতে হয়।

১০.৯. গাজর

মাটি : ঝুরঝুরে বেলে মাটি। খুব বেশি গোবর অথবা অন্য মল-পচা সার দেওয়া যাবে না। কম্পোস্ট দেয়া যেতে পারে।

বপনের সময় : সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর।

দূরত্ব : সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি থেকে ৮ ইঞ্চি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ২ ইঞ্চি থেকে ৩ ইঞ্চি।

বীজ বপনের গভীরতা : $\frac{১}{৪}$ – $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

গজাতে সময় লাগে : ৭-১২ দিন

বপনের নিয়ম : বেডে সারি করে অথবা ছিটিয়ে বীজ বোনা হয়। তাড়াতাড়ি গজানোর জন্য বীজ ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখা যায়।

যত্ন : চারা গজাবার ৭-১০ দিন পর অপেক্ষাকৃত কম ঘন করা উচিত। চারা ৪ ইঞ্চি লম্বা হবার পর আবার অপেক্ষাকৃত কম ঘন করে দেয়া যেতে পারে। বেশি গোবর দিলে গাজরের মূল বিকৃত আকার ধারণ করে।

ফসল তোলা : লাগানোর ২ মাস পর কচি গাজর তোলা যেতে পারে। তিন মাসের মধ্যে গাজরের বড় মূল খাওয়া যায়।

১০.১০. বিট

মাটি : কিছু জৈব উপাদান (জীবজন্তুর পচা মল, কম্পোস্ট ইত্যাদি) মিশ্রিত ঝুরঝুরে বেলে মাটি।

বপনের সময় : অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর

দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৮ইঞ্চি থেকে ১২ ইঞ্চি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪ ইঞ্চি থেকে ৫ ইঞ্চি।

বীজ বপনের গভীরতা : $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি

বীজ গজাতে সময় লাগে : ৫-৭ দিন।

বপনের নিয়ম : বীজতলার উপর সারি করে অথবা ছিটিয়ে বীজ বোনা হয়।

যত্ন : ছিটিয়ে বীজ বোনা হলে চারা পাতলা করা উচিত, যতক্ষণ না চারা থেকে চারার মধ্যে ৪-৫ ইঞ্চি দূরত্ব হয়। বীজতলা আর্দ্র রাখতে হয়।

ফসল সংগ্রহ : বিটের পাতা খুবই সুস্বাদু এবং মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ। বিট লাগানোর দু-তিন মাস পরই বিটের মূল খাওয়ার উপযুক্ত হয়।

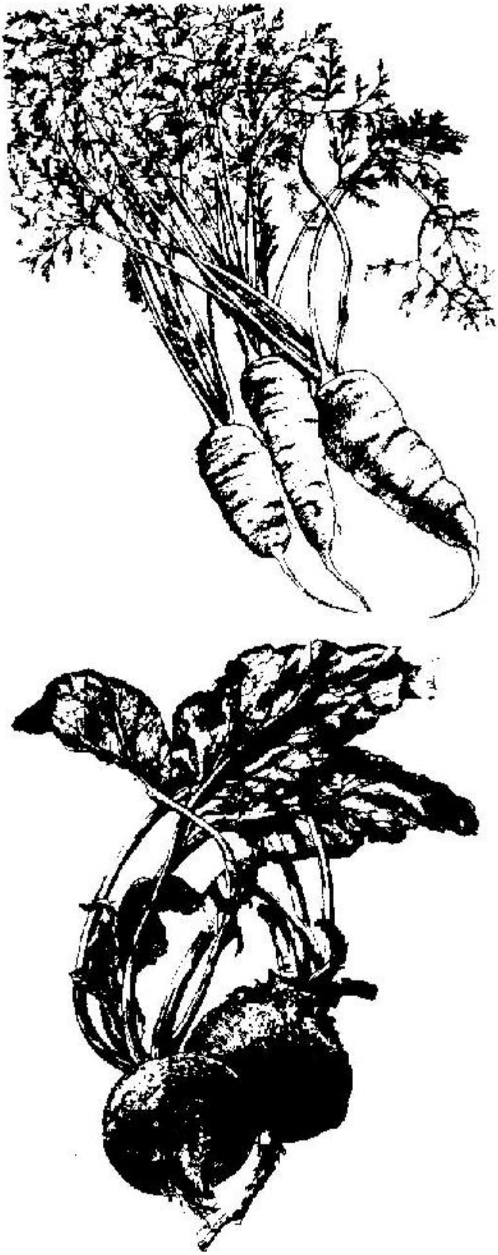

চিত্র ১০.৫ : কপি গোত্রের সবজি : গাজর (উপরে) ও বিট (নিচে)

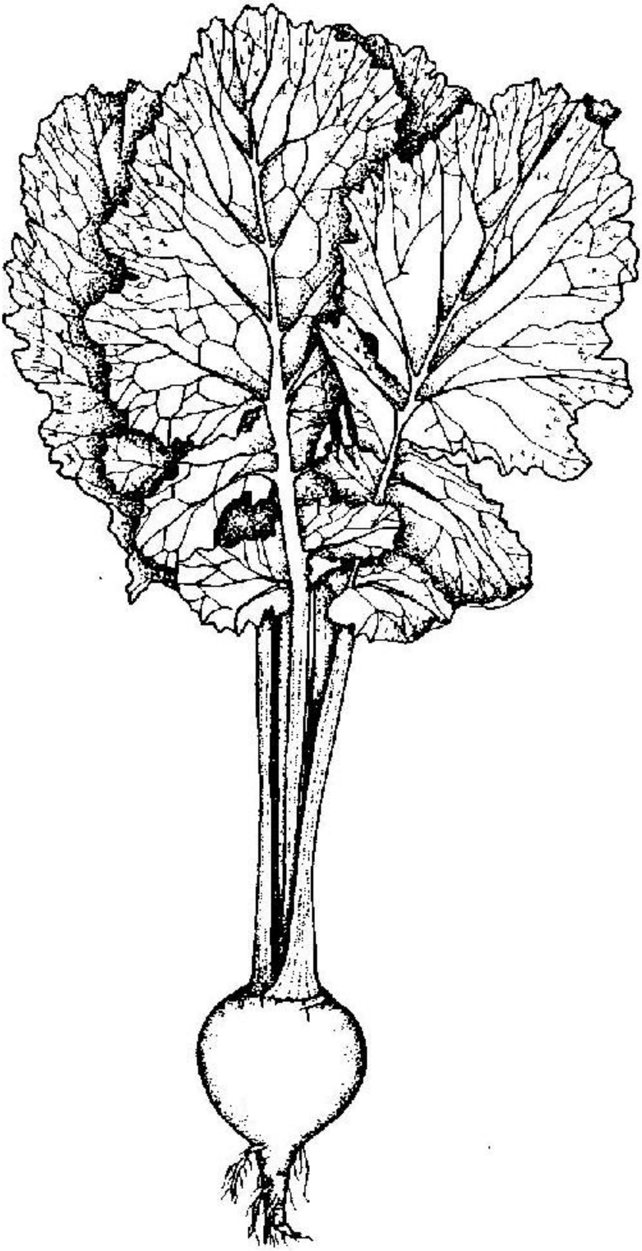

চিত্র ১০.৬ : কপি গোত্রের সবজি : শালগম

১০.১১. শালগম

মাটি : জৈব উপাদান (পঁচা গোবর, কম্পোস্ট ইত্যাদি) মিশ্রিত ঝুরঝুরে বেলে মাটি।

বপনের সময় : সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর।

দূরত্ব : সারি থেকে সারির দূরত্ব ৮ ইঞ্চি -১২ ইঞ্চি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৬ ইঞ্চি।

বীজ বপনের গভীরতা : $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

বীজ গজাতে সময় লাগে : ৫-৮ দিন।

বপনের নিয়ম : বীজতলায় সারি করে অথবা ছিটিয়ে বীজ বোনা হয়।

যত্ন : ছিটিয়ে বীজ বোনা হলে চারা অঘন করে দিতে হয় যতক্ষণ না চারা থেকে চারার মধ্যে ৪ ইঞ্চি দূরত্ব তৈরি হয়।

ফসল সংগ্রহ : শালগমের পাতা খেতে খুবই সুস্বাদু। বপনের ৩ মাস পর মূলা সংগ্রহ করা যায়।

একাদশ অধ্যায়

কন্দাল ফসল

১১.০. কন্দাল ফসলের পরিচিতি ও উৎপাদন

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জমা হওয়ার দরুন স্ফীত হয়ে যেসব ফসলের কাণ্ড বা শিকড় রূপান্তরিত হয় সেসব ফসলই কন্দাল ফসল। অধিক শর্করা থাকার কারণে অনেক দেশেই এসব ফসল প্রধান খাদ্য বা সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই ফসলগুলো অন্যান্য প্রধান খাদ্য শস্য থেকে বেশি পরিমাণে খাদ্য শক্তি তৈরি করে।

বাংলাদেশের জন্য কন্দাল ফসলের চাষাবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কন্দাল ফসলের মধ্যে নিম্নলিখিত ফসলসমূহ অন্তর্ভুক্ত :

ক. আলু; খ. মিষ্টি আলু

গ. সব ধরনের কচু; ঘ. কাসাবা

ঙ. গাছ আলু; চ. ইয়ামবিন।

বাংলাদেশের প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর জমিতে এসব কন্দাল ফসলের চাষ হয় এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ২৫ লক্ষ টন দেশের খাদ্য ঘাটতি এবং পুষ্টির অভাব পূরণে কন্দাল ফসল খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে

বাংলাদেশে কন্দাল ফসলের জমির পরিমাণ ও উৎপাদন উল্লেখ করা হলো।

ফসলের নাম	জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)	গড় ফলন টন/হেক্টর	সর্বোচ্চ ফলন টন/হেক্টর
আলু	১৩০	১১.৪	৪০
মিষ্টি আলু	৫২	১০.০	৬০
গাছ আলু	১.৪	১৪.২	৩৮
কাসাবা	০.৮	১২.৮	২৫
ইয়ামবিন	১.০	১১.৮	২০
অন্যান্য	৪.৮	–	–
মোট	২০০		–

১১.১. আলু

বাংলাদেশে ধান ও গমের পরই আলুর স্থান। এদেশে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয় এবং উৎপাদন প্রায় ১৬ লক্ষ টন। এটি দেশের উৎপাদিত মোট খাদ্য শস্যের প্রায় ৭.৩%। হেক্টর প্রতি আলুর গড় ফলন ১১.৪ টন বাংলাদেশে বছরে

জনপ্রতি ১৩.৩০ কেজি আলু প্রধানত সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পৃথিবীর প্রা ৪০টির বেশি দেশে আলু প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করা হলে হেক্টর প্রতি ৩০-৪০ টন উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশে আলু উৎপাদিত অঞ্চলের মধ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলার গড় ফলন হেক্টর প্রতি ২৭টন, অর্থাৎ মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশই মুন্সিগঞ্জ জেলাতেই উৎপাদিত হয়। ষাটের দশক থেকে বাংলাদেশে উচ্চ ফলনশীল আলু জাতের অনুমোদন শুরু হয়। এ পর্যন্ত আলুর ৩০টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও অনুমোদিত হয়েছে। বিদেশী জার্মপ্লাজম ও জাত থেকে নির্বাচন করে আলুর জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। বারি টিপিএস-১ এবং বারি টিপিএস-২ নামে দুটি হাইব্রিড আলুর জাত প্রকৃত আলু বীজ থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১১.১.১. আলুর স্থানীয় জাত

বাংলাদেশে আলুচাষকৃত ১৪০ হাজার হেক্টর জমির মধ্যে প্রায় ৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে স্থানীয় জাতের আলু চাষ হয়। স্থানীয় জাতের আলুর প্রায় ৯০% বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা এবং রাজশাহী বিভাগে চাষ হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে আলুর গড় উৎপাদন হলো–

(১) আধুনিক জাত ১২-২০ টন/হেক্টর এবং (২) স্থানীয় জাত ৭-৮ টন/হেক্টর

বাংলাদেশে চাষ করা স্থানীয় জাতসমূহের মধ্যে রয়েছে–

ক. আউশা (Ausha)
খ. চল্লিশা (Chalisha)
গ. দোহাজারি লাল (Dohazari red)
ঘ. ফেস্টা শিল (Festa shil)
ঙ. হাগরাই (Hagrai)
চ. লাল পাকড়ি (Lal pakri)
ছ. লাল শিল (Lal shil)
জ. পাটনাই (Patnai)
ঝ. সাদা গুটি (Sada guti)
ঞ. শিল বিলাতি (Shil bilati)
ট. সূর্যমুখী (Surjamukhi)
ঠ. দেশী সাদা (Deshi sada)
ড. দোহাজারি সাদা (Dohazari sada)
ঢ. ঝাউ বিলাতি (Jhaubilati)
ণ. লাল সাদা (Lal sada)
ত. পাকড়ি ললিতা (Pakri lalita)
থ. সাদা পাকড়ি (Sada Pakri)

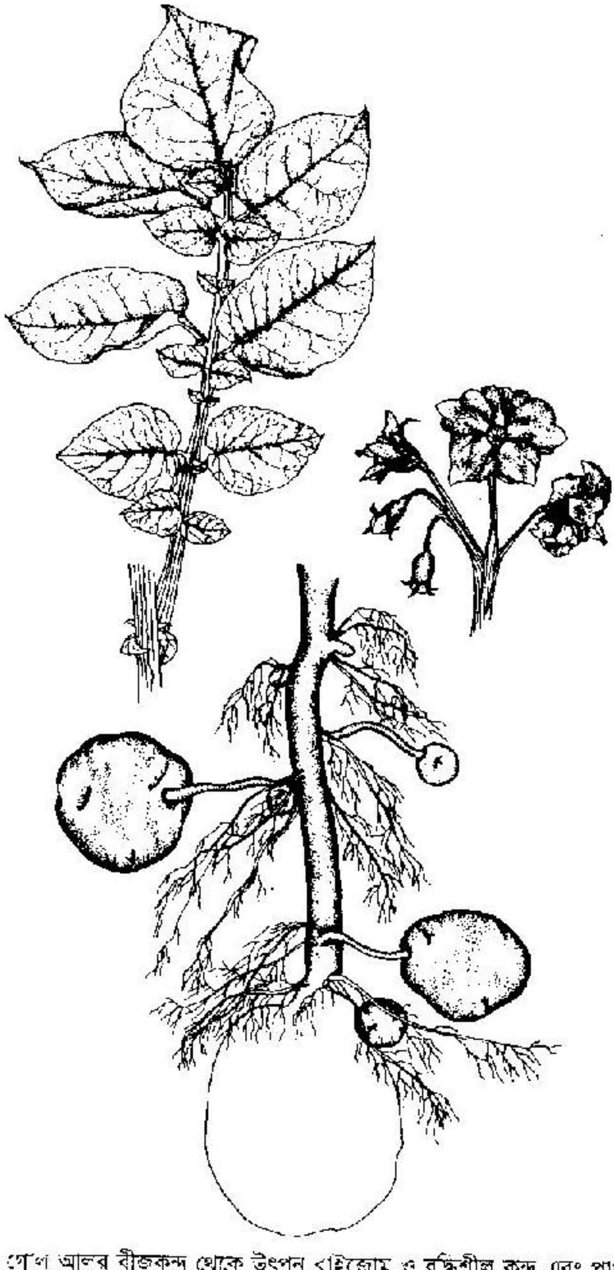

চিত্র ১১.১ : গোল আলুর বীজকন্দ থেকে উৎপন্ন রাইজোম ও বৃদ্ধিশীল কন্দ এবং পাতা ও পুষ্প মঞ্জুরি

স্থানীয় ও উচ্চ ফলনশীল আলুর জাতের সাধারণ, পরিবেশগত, শারীরবৃত্তীয়, কৃষিতাত্ত্বিক এবং ফলের বৈশিষ্ট্য ছক আকারে উল্লেখ করা হলো।

১১.১.১.১. স্থানীয় আলু জাতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

জাতের নাম	গাছ	বৈশিষ্ট্য	অঙ্কুর
আউশা	মধ্যম খাটো	হাল্কা লাল	বাদামি, লোমযুক্ত
চল্লিশা	মধ্যম খাটো	সাদা	হাল্কা সবুজ, গোড়া লাল
দোহাজারি লাল	লম্বাটে	লালচে	সাদা, গোড়া, লাল
ফেস্টা শিল	লম্বাটে	হাল্কা লাল	বাদামি সবুজ, মোটা
হাগরাই	লম্বাটে	হাল্কা বাদামি	লালচে, গোড়া মোটা
লাল পাকড়ি	খাটো	লালচে	সাদা, লম্বা, গোড়া লাল
লালশিল	লম্বাটে	লাল	খাটো, মোটা অগ্রভাগ লাল
পাটনাই	লম্বাটে	গাঢ় লাল	হাল্কা বাদামি
সাদাগুটি	লম্বাটে	সাদা	হাল্কা সবুজ ও সাদা
শিল বিলাতি	লম্বাটে	লালচে	গোড়া মোটা লাল
সূর্যমুখী	মধ্যম লম্বা	হাল্কা লাল	বাদামি, খাটো, শাখা বেশি

১১.১.১.২. স্থানীয় আলু জাতের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য

জাতের নাম	উৎপাদন এলাকা	পরিপক্বতা	অঙ্কুরোদ্গম	গাছের বৃদ্ধি
আউশা	টাংগাইল	মধ্যম আগাম	দ্রুত	দ্রুত
চল্লিশা	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা	আগাম	দ্রুত	দ্রুত
দোহাজারি লাল	চট্টগ্রাম	নাবি	বিলম্বিত	মধ্যম
ফেস্টা শিল	জয়পুরহাট, বগুড়া	নাবি	বিলম্বিত	মধ্যম
হাগরাই	বগুড়া গাইবান্ধা	নাবি	বিলম্বিত	বিলম্বিত
লাল পাকড়ি	বগুড়া, রংপুর	আগাম	দ্রুত	দ্রুত
লালশিল	জয়পুরহাট	নাবি	বিলম্বিত	বিলম্বিত
পাটনাই	নওগাঁ, দিনাজপুর	নাবি	বিলম্বিত	বিলম্বিত
সাদা গুটি	রংপুর, গাইবান্ধা	নাবি	বিলম্বিত	দ্রুত
শিল বিলাতি	রংপুর, গাইবান্ধা	আগাম	দ্রুত	বিলম্বিত
সূর্যমুখী	বগুড়া, জয়পুরহাট	মধ্যম	বিলম্বিত	বিলম্বিত

১১.১.১.৩. স্থানীয় আলু জাতের গাছের বৈশিষ্ট্য

জাতের নাম	পাতা	বিস্তার	কাণ্ড সংখ্যা ও বর্ণ	পল্লব
আউশা	গাঢ় সবুজ	মধ্যম ছড়ানো	কম, সবুজ	মধ্যম
চল্লিশা	গাঢ় সবুজ	মধ্যম ছড়ানো	কম, লালচে	কম
দেহাজারি লাল	সবুজ	মধ্যম ছড়ানো	কম, সবুজ	বেশি
ফেন্টা শিল	সবুজ	মধ্যম ছড়ানো	বেশি, সবুজ	মধ্যম
হাগরাই	হাল্কা সবুজ	খাড়া	বেশি, লালচে	বেশি
লাল পাকড়ি	গাঢ় সবুজ	মধ্যম ছড়ানো	কম, সবুজ	কম
লাল শিল	সবুজ	খাড়া	কম, সবুজ	বেশি
পাটনাই	সবুজ	খাড়া	বেশি, লালচে	বেশি
সাদা গুটি	হাল্কা সবুজ	খাড়া	বেশি, সবুজ	বেশি
শিল বিলাতি	হাল্কা সবুজ	ছড়ানো	কম, লালচে	মধ্যম
সূর্যমুখী	সবুজ	ছড়ানো	কম, সবুজ	মধ্যম

১১.১.১.৪. স্থানীয় আলু জাতের কন্দের বৈশিষ্ট্য

জাতের নাম	কন্দের আকার	কন্দের আকৃতি	ত্বক	চোখ, গভীরতা
আউশা	বড়	গোলাকার	খসখসে	কম, বেশি
চল্লিশা	মধ্যম	গোলাকার	মধ্যম মসৃণ	কম, মধ্যম
দেহাজারি লাল	মধ্যম	ডিম্বাকার ও গোলাকার	মসৃণ	কম, মধ্যম
ফেন্টাশিল	মধ্যম	ডিম্বাকার	মসৃণ	মধ্যম, মধ্যম
হাগরাই	ছোট	অনিয়ত গোলাকার	মসৃণ	কম, বেশি
লাল পাকড়ি	মধ্যম	গোলাকার	খসখসে	কম, মধ্যম
লাল শিল	মধ্যম	ডিম্বাকার ও গোলাকার	মসৃণ	মধ্যম, বেশি
পাটনাই	মধ্যম	ডিম্বাকার	মসৃণ	কম, বেশি
সাদাগুটি	মধ্যম	অনিয়ত গোলাকার	মসৃণ	মধ্যম, মধ্যম
শিলা বিলাতি	বড়	লম্বাটে	মসৃণ	বেশি, বেশি
সূর্যমুখী	বড়	অনিয়ত গোলাকার	মসৃণ	কম, মধ্যম

১১.১.১.৫. স্থানীয় আলু জাতের কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

জাতের নাম	গাছের উচ্চতা (সেমি)	কাণ্ডের সংখ্যা	কন্দের ওজন (গ্রাম)	পরিপক্বতার সময় (দিন)	ফলন (টন/হেক্টর)
আউশা	৪৭	৫	১৮	১০২	২৫
চল্লিশা	৪৪	৬	১১	৯৬	১৭
দোহাজারি লাল	৮৫	৭	৭	১১২	২৪
ফেন্ডা শিল	৮৭	৯	৮	১১৩	২৩
হাগরাই	৯৭	১১	৫	১১১	১৪
লাল পাকড়ি	৪৫	৫	১৩	৯৬	২৫
লাল শিল	৮৩	৭	৭	১১১	২৭
পাটনাই	৯৪	১০	৮	১১৪	২১
সাদাগুটি	৮৭	৮	১০	১১২	২৩
শিলবিলাতি	৯১	৭	১৬	৯৬	১৮
সূর্যমুখী	৬৯	৩	২৮	১০২	১৯

১১.১.২. আলুর উচ্চ ফলনশীল জাত : বাংলাদেশে স্থানীয় ও বিদেশী ৪০টি বেশি জাত রয়েছে। দেশে সচরাচর ব্যবহৃত কতকগুলো উচ্চ ফলনশীল বিদেশী জাতসমূহের নাম, ও ফলন উল্লেখ করা হলো

জাতের নাম/মূল নাম	পরিচিত নাম	উৎস দেশের নাম	ফলন (টন/হেক্টর)	অনুমোদনের সাল
মোরেনি Morene	বারি আলু-২	হল্যান্ড	২৪-৩৮	১৯৮৫
অরিগো Origo	বারি আলু-৩	হল্যান্ড	১৮-৩৫	১৯৯০
পেট্রোনিস Patrone's	বারি আলু-৫	হল্যান্ড	২০-২৫	১৯৯৩
মুলটা Multa	বারি আলু-৬	হল্যান্ড	২০-২৫	১৯৯৩
ডায়মান্ট Diamant	বারি আলু-৭	হল্যান্ড	২৫-৩০	১৯৯৩
কার্ডিনাল Cardinal	বারি আলু-৮	হল্যান্ড	২৫-৩০	১৯৯৩

মন্ডিয়াল Mondial	বারি আলু-৯	হল্যান্ড	২৫-৩০	১৯৮০
কুফরি সিন্দুরি Kufrinsinduri	বারি আলু-১০	ভারত	২৫-৩০	১৯৯০
হীরা Heera	বারি আলু-১	পেরু	৩০-৩৫	১৯৯৩
আইলসা Ailsa	বারি আলু-৪	স্কটল্যান্ড	২৫-৩০	১৯৯৩
চমক Chamak	বারি আলু-১১	পেরু	২৫-৩০	১৯৯৩
ধীরা Dheera	বারি আলু-১২	পেরু	২৫-৩০	১৯৯৩
গ্রানোলা Granola	বারি আলু-১৩	হল্যান্ড	২৫-৩০	১৯৯৪
ক্লিওপেট্রা Cleopatra	বারি আলু-১৪	হল্যান্ড	২৫-৩০	১৯৯৫
বিনেলা Binella	বারি আলু-১৫	হল্যান্ড	৩০-৩৫	১৯৯৪

(১) **বারি টি পি এস-১ :** আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র, লিমা, পেরু, (বংশ-MFxTPS-67) থেকে বাছাইয়ের মাধ্যমে ১৯৯৭ সালে অবমুক্ত করা হয়। এ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টসমূহ নিচে দেওয়া হলো

ক. গাছ কিছুটা ছড়ানো, উচ্চতা ৫০-৬০ সেন্টিমিটার

খ. কাণ্ডের সংখ্যা বেশি ও শক্ত

গ. পাতা গোলাকার ও গাঢ় সবুজ

ঘ. ফুল সাদা

ঙ. আলু ডিম্বাকার, মাঝারি

চ. ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল ক্রিম, শাঁস হলুদ

ছ. চোখ সামান্য গভীর

জ. সাধারণ তাপমাত্রায় বীজের সুপ্তিকাল ৭৮-৮০ দিন

ঝ. জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন

ঞ. প্রকৃত আলু বীজ থেকে টিউবারলেটের ফলন হেক্টর প্রতি ৪৫-৫০ টন এবং টিউবারলেট থেকে আলুর ফলন হেক্টর প্রতি ৩৩-৩৫ টন।

সারা দেশেই চাষাবাদ করা যায়। এই জাতটি প্রকৃত আলু বীজ দিয়ে চাষ করে চাষীদের উচ্চ মূল্যে বীজ আলু ক্রয়ের প্রয়োজন হবে না। চাষীর নিজের সংগৃহীত টিউবারলেট পরবর্তী বছরের বীজ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

(২) **বারি টিপিএস-২ :** অন্তর্জাতিক আলু, কেন্দ্র, লিমা, পেরু, (বংশ - TPS-7xTPS-67) থেকে বাছাইয়ের মাধ্যমে ১৯৯৭ সালে অবমুক্ত করা হয়। এ জাতের বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. গাছ কিছুটা খাটো, উচ্চতা ৪৫-৫০ সেন্টিমিটার।

খ. কাণ্ডের সংখ্যা বেশি এবং শক্ত

গ. পাতা ও কাণ্ড হাল্কা সবুজ, পাতা কিছুটা লম্বা এবং প্রান্তভাগ একটু খাঁজ কাটা।

ঘ. ফুল বেগুনি

ঙ. আলু ডিম্বাকার, ত্বক মসৃণ ও হাল্কা হলদে শাঁস হলদে।

চ. চোখ কিঞ্চিত গভীর।

ছ. অঙ্কুর প্রথমে আঁটোসাটো পরে লম্বা ডিম্বাকার রঙ গাঢ় লাল-বেগুনি।

জ. কিঞ্চিত লোমশ হয়।

ঝ. সাধারণ তাপমাত্রায় বীজের সুপ্তিকাল ৭৫-৮০ দিন।

ঞ. জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন।

ট. প্রকৃত আলু বীজ থেকে টিউবারলেট হেক্টর প্রতি ফলন ৪৫-৫০ টন এবং টিউবারলেট থেকে আলুর ফলন হেক্টর প্রতি ৩০-৩৫ টন।

ঠ. মড়ক ও অন্যান্য ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী।

১১.১.২.১. **উচ্চ ফলনশীল আলু জাতের গাছের বৈশিষ্ট্য**

জাতের নাম	মূল নাম	কাণ্ডের বর্ণ	কাণ্ডের ধরন	কাণ্ড সংখ্যা	পাতা
বারিআলু ১	হীরা	সবুজ		মধ্যম	সবুজ
বারিআলু ২	মোরেনি	সবুজ	মধ্যম	মধ্যম	সবুজ
বারিআলু ৩	অরিগো		খাড়া, শক্ত	কম	গাঢ় সবুজ, বড়
বারিআলু ৪	আইলসা	হাল্কা সবুজ	ছড়ানো, নরম	বেশি	হাল্কা সবুজ
বারিআলু ৫	পেট্রোনিসা		শক্ত, মধ্যম ছড়ানো	বেশি	চওড়া হাল্কা সবুজ
বারিআলু ৬	মুলটা	হাল্কা সবুজ	ছড়ানো, মধ্যম নরম	বেশি	গোড়ায় হাল্কা বেগুনি
বারিআলু ৭	ডায়ামান্ট	হাল্কা সবুজ	মধ্যম ছড়ানো	কম	গাঢ় সবুজ
বারিআলু ৮	কার্ডিনাল	লালচে বেগুনি		কম লাল	প্রান্ত ঢেউ খেলানো
বারিআলু ৯	মন্ডিয়াল		ছড়ানো	বেশি	হাল্কা সবুজ

বারিআলু ১০	কুফরী সিন্দুরী	হাল্কা পিঙ্গল	মধ্যম ছড়ানো	কম	সবুজ
বারিআলু ১১	চমক	সবুজ	শক্ত	বেশি	সবুজ
বারিআলু ১২	ধীরা		মধ্যম	বেশি	গাঢ় সবুজ
বারিআলু ১৩	গ্রানোলা	সবুজ	মধ্যম ছড়ানো	কম	সবুজ
বারিআলু ১৪	ক্লিওপেট্রা	পিঙ্গল	ছড়ানো	কম	সবুজ
বারিআলু ১৫	বিনেলা	সবুজ	মধ্যম	মধ্যম	গাঢ় সবুজ

১১.১.২.২. বিভিন্ন আলু জাতের কন্দের বৈশিষ্ট্য

জাতের নাম	আকার	আকৃতি	ত্বক	বর্ণ
বারিআলু ১	বড়	চ্যাপ্টা	মসৃণ	শাঁসের ক্রিম
বারিআলু ২	মাঝারি	গোল ডিম্বাকার	মসৃণ	
বারি আলু ৩	বড়	ডিম্বাকার	হাল্কা হলদে	সাদা
বারিআলু ৪	মাঝারি	ডিম্বাকার	অমসৃণ হলদে	হাল্কা হলদে
বারিআলু ৫	মাঝারি	ডিম্বাকার	ময়লা হলদে	ময়লা হলদে
বারিআলু ৬	মাঝারি	ডিম্বাকার	ময়লা হলদে	হলদে
বারিআলু ৭	মাঝারি	ডিম্বাকার	হলদে	ময়লা হলদে
বারিআলু ৮	মাঝারি	ডিম্বাকার	মসৃণ	হাল্কা
বারিআলু ৯	বড়	লম্বা ডিম্বাকার	মসৃণ	হলদে
বারিআলু ১০	মাঝারি	গোলাকার	মসৃণ লাল	ময়লা হলদে
বারিআলু ১১	মাঝারি	ডিম্বাকার	মসৃণ হলদে	হলদে
বারিআলু ১২	মাঝারি	ডিম্বাকার	হাল্কা হলদে	হাল্কা হলদে
বারিআলু ১৩	মাঝারি	ডিম্বাকার	বাদামি হলদে	হাল্কা হলদে
বারিআলু ১৪	বড়	ডিম্বাকার	গাঢ় লাল	ফ্যাকাসে হলদে
বারিআলু ১৫	মাঝারি	ডিম্বাকার	উজ্জ্বল হলদে	হলদে

১১.১.৩. বারি আলুর উৎপাদন পদ্ধতি

আবহাওয়া : শীত মৌসুমের ফসল।

মৃত্তিকা : উঁচু ও মাঝারি উঁচু দোঁআশ মাটি।

বীজ বপনের সময় : নভেম্বর।

বীজ : ১.৩-১.৬ টন/হেক্টর আস্ত আলু বা কাটা অর্ধেক আলু।

পানিসেচ : দু'বার গোড়া বাঁধাইয়ের সময়।

আন্তঃ ফসল : ইক্ষুর সাথে আন্তঃ ফসল হিসেবে চাষ করা যায়।

রোপণ দূরত্ব : ৫৫-৬৫×৪০-৫০ সেন্টিমিটার।

আগাছা দমন : বীজ রোপণের ৪০ দিনের মধ্যে ২ বার আগাছা দমন (গোড়া বাঁধাইয়ের সময়)

রোগ-পোকা দমন : স্বাস্থ্য সম্মত চাষাবাদ ও ওষুধ প্রয়োগ।

ফসল সংগ্রহ : বীজ রোপণের ৭০-১০০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়।

সারের পরিমাণ : আলু চাষে নিচে উল্লেখিত হারে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
গোবর	৭-১০ টন
ইউরিয়া	২২০-২৫০ কেজি
টিএসপি	১২০-১৫০ কেজি
এমপি	২২০-২৫০ কেজি
জিপসাম	৮-১০ কেজি
জিঙ্ক সালফেট	১০০-১২০ কেজি
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৮০-১০০ কেজি
বোরন	৮-১০ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : শতকরা ৫০ ভাগ ইউরিয়া সব গোবর, টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট সবটুকু রোপণের সময় জমিতে মিশিয়ে নিতে হবে

বাকি ইউরিয়া রোপণের ৪০ দিন পর অর্থাৎ দ্বিতীয় বার মাটি তোলার সময় প্রয়োগ করতে হবে। অম্লীয় বেলে মাটির জন্য ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং বেলে মাটির জন্য বোরন প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

সেচ প্রয়োগ : বীজ আলু বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (স্টোলন বের হওয়া মাত্র) প্রথম সেচ দিতে হয়। ২য় সেচ বীজ আলু বপনের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে এবং আলু বীজ বপনের ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে ৩য় সেচ দিতে হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলে বেশি ফলন পেতে হলে ৮-১০ দিন পর পর সেচ দিতে হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা : ২-৩ বার গোড়ায় মাটি দেয়া প্রয়োজন বপনের সময় ভেলি করে মাটি দিতে হয়।

দেশী আলুর উন্নয়ন কৌশল : অতীতে বিদেশ থেকে যেসব আলুর জাত এদেশে এসেছে তা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে এখনো চাষাবাদে আছে এসব জাতই বর্তমানে দেশী জাত হিসেবে পরিচিত

দেশে প্রায় ৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে দেশী জাতের আলুর চাষ হয়। দেশী জাতের আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে দেশে সামগ্রিক আলুর উৎপাদন বেড়ে যাবে। উন্নত উৎপাদন কৌশল অবলম্বন করে দেশী আলুর নির্বাচিত জাত থেকে সহজেই হেক্টর প্রতি ২০-২৫ টন ফলন পাওয়া যেতে পারে।

১১.১.৩.১. উন্নত আলু চাষের দশটি নীতি

ক. লাল পাকরি, চল্লিশা, শিল বিলাতি, দোহাজারি, আউশা ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত ভালো দেশী জাত এবং উন্নত জাত চাষ করতে হয়।

খ. সতেজ এবং সুস্থ গাছ থেকে মাঝারি আকারের বীজ সংগ্রহ করে হিমাগারে সংরক্ষণ করতে হয়।

গ. ফসল পর্যায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হয় এবং ভালোভাবে চাষ করে আলু লাগানোর উপযুক্ত করে নিতে হয়।

ঘ. জমির উর্বরতা মান ও আলুর কাঙ্ক্ষিত ফলন মাত্রার ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করতে হয়।

ঙ. অক্টোবর মাসের শেষ ভাগ থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম ভাগে আলু লাগাতে হয়।

চ. হেক্টর প্রতি ১.৫ টন বীজ ব্যবহার করতে হয়।

ছ. বপন সময় ও গাছের আকৃতি অনুসারে রোপণ দূরত্ব নির্ধারণ করতে হয়।

জ. জমিতে উপরি সার, পানি, সেচ, ও ভেলি বাঁধ এবং পরিচর্যা কাজে সমন্বয় রাখতে হয়।

ঝ. অণুপুষ্টির ঘাটতি দেখা দিলে তা স্প্রে করে পূরণ করতে হয়।

ঞ. যথাযথ রোগ এবং পোকা দমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় এবং ৯০-১০০ দিন পর আলু তুলে বাছাই ও কিউরিং করে সংরক্ষণ করতে হয়।

১১.১.৪. আলুর রোগ

আলুর গাছ অনেক সংক্রামক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। নিচে এগুলোর বিবরণ দেয়া হলো।

ভাইরাসজনিত রোগ : আলুর ভাইরাস জনিত রোগের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে পোকাবাহিত পাতা মোড়ানো ভাইরাস, ভাইরাস ওয়াই, ভাইরাস এ, ভাইরাস এম খুব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিকার : রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ ও ভাইরাসবাহী পোকা দমন করতে হয়।

আলুর পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ : আক্রান্ত গাছের পাতা খসখসে, খাড়া ও উপরের দিকে গুটানো হয়। আগার পাতার রঙ হাল্কা সবুজ হয়ে যায়। কখনো আক্রান্ত পাতার কিনারা লালচে বেগুনি রঙের হয়।

রোগ দমন : কীটনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে জাবপোকা দমন। এন্ডোড্রিন, নোভাক্রনসম মেনোড্রিন ইত্যাদি ২ মিলি প্রতি লিটারে অথবা ১ মিলি ডাইমেক্রন প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।

আলুর মোজাইক রোগ : পাতায় উজ্জ্বল হলুদ ছিটে দাগ পড়ে, পাতা বিকৃত ও ছোট হয়ে যায়।

মোজাইক রোগ দমন

ক. জাবপোকা দমন করতে হয়

খ. টমেটো, তামাক এবং কতিপয় সোলানেসি গোত্রভুক্ত আগাছা ও ভাইরাসের বিকল্প পোষক। সুতরাং আশেপাশে এ ধরনের আগাছা রাখা যাবে না।

আলুর হলদে রোগ : স্থানীয় জাতের আলুতে এ রোগ হয়। পাতা কুচকে মুড়িয়ে যায় ও ছোট ছোট দাগ দেখা যায়।

হলদে রোগ দমন

ক. রোগিং করে আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে ফেলতে হয়।

খ. কীটনাশক প্রয়োগে পাতা ফড়িং দমন করা, ডাইমেক্রন (০.১%) ৭-১০ দিন পর পর ছিটানো হয়।

আলুর মড়ক বা নাবি ধ্বসা রোগ : পাতায়, ডগায় এবং কাণ্ডে ছোট ভেজা দাগ পড়ে ক্রমে দাগ বড় হয়ে সমগ্র পাতা, ডগা এবং কাণ্ডের কিছু অংশ নষ্ট হয়। পরিবেশ অনুকূল হলে, অর্থাৎ বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি থাকলে ২-৩ দিনের মধ্যেই জমির সমস্ত ফসল আক্রান্ত হয়ে পড়ে

ক. রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা অথবা যে জমিতে মড়ক রোগ হয়েছে সে জমির আলু বীজ হিসেবে ব্যবহার না করা।

খ. জমির যে এলাকায় এ রোগ মারাত্মক হয়, সে জায়গায় গাছ মাটির উপর থেকে কেটে অন্যত্র পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

গ. ছত্রাকনাশক ১০-১২ দিন পর পর ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। যেমন- রিডোমিল (০.২%), ডাইথেন এম-৪৫ (০.২%) ইত্যাদি

আলুর আগাম ধ্বসা বা আরলি ব্লাইট রোগ : নিচের পাতায় ছোট ছোট বাদামি দাগ পড়ে। গাছ হলুদ হওয়া, পাতা ঝড়ে পড়া এবং অকালে গাছ মরে যাওয়া এ রোগের লক্ষণীয় উপসর্গ। আক্রান্ত টিউবারের গায়ে গাঢ় কালচে বাদামি রঙের দাগ পড়ে

প্রতিকার

ক. সুষম সার প্রয়োগ এবং সময়মতো সেচ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হয়

খ. রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর প্রয়োগ করতে হয়। ডাইথেন এম-৪৫, ০.২% হারে প্রয়োগ করতে হয়।

গ. আগাম জাতের আলু চাষ করতে হয়।

স্ক্লেরোসিয়ামজনিত কাণ্ড ও আলু পঁচা রোগ : বাদামি দাগ কাণ্ডের গোড়া চেয়ে ফেলে গাছ ঢলে পড়ে আক্রান্ত অংশে ছত্রাকের সাদা জালিকা দেখা যায় এবং স্ক্লেরোসিয়া সৃষ্টি হয়। ক্রমে আলু পচে নষ্ট হয়ে যায়।

প্রতিকার

ক. আক্রান্ত গাছ কিছুটা মাটিসহ সরিয়ে ফেলতে হয়।

খ. ওষুধ প্রয়োগ করলেও।

আলুর রাইজকটোনিয়া স্টেম ক্যাঙ্কার স্কার্ফ রোগ : গাছের গোড়ার দিকে লালচে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কাণ্ডের সাথে অনেক ছোট ছোট বায়বীয় টিউবার দেখা যায়। আক্রান্ত টিউবারের গায়ে শক্ত কালো সুপ্ত রোগ জীবাণুর গুটি দেখতে পাওয়া যায়।

আলুর রাইজোকটোনিয়া রোগ দমন

ক. ফসল পর্যায় অবলম্বন।

খ. টেবক্লোর (PCNB) হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি মাত্রায় বীজ লাগানোর পূর্বে বীজ নালায় প্রয়োগ করতে হয়।

গ. বীজ আলু মাটির বেশি গভীরে রোপণ করা যাবে না।

ঘ. ভালোভাবে অঙ্কুরিত বীজ আলু রোপণ করতে হয়।

আলুর ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া এবং বাদামি পচন রোগ : গাছের একটি অংশ ঢলে পড়তে পারে। পাতা সবুজ অবস্থায়ই হঠাৎ ঢলে পড়ে। আক্রান্ত আলু কাটলে বাদামি বিবর্ণতা দেখা যায়। আলুর চোখে সাদা পুঁজের মতো দেখা যায়, যেখানে মাটি লেগে থাকে। আক্রান্ত আলু অল্প দিনের মধ্যেই পঁচে যায়।

আলুর ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ দমন

ক. সুস্থ রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার ও ফসল পর্যায় অবলম্বন করতে হয়।

খ. আলু লাগানোর সময় ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করতে হয়

গ. জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হয়।

আলুর দাঁদ রোগ : দাঁদ হলে টিউবারের উপরে উঁচু বাদামি বর্ণের দাগ পড়ে। আক্রমণ গভীরে প্রবেশ না করে সাধারণত ত্বকেই সীমাবদ্ধ থাকে।

আলুর দাঁদ রোগ দমন

ক. রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার।

খ. জমিতে বেশি মাত্রায় নাইট্রোজেন সার ব্যবহার বর্জন করতে হয়।

গ. জমিতে ১২০ কেজি/হেক্টর জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হয়

১১.১.৪.১. আলুর সংগ্রহোত্তর এবং গুদামজাত রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

আলুর শুকনো পচা রোগ : আলুর গায়ে কিছুটা গভীর কালো দাগ পড়ে। আলুর ভিতরে গর্ত হয়ে যায়

শুকনা পচা রোগ দমন

ক. শতকরা ২ ভাগ ডাইথেন এম-৪৫ দ্রবণ দ্বারা বীজ আলু শোধন করতে হয়।

খ. প্রতি কেজিতে ২ গ্রাম টেকেটো ২% গুড়া দিয়ে আলু শোধন করতে হয়।

আলুর নরম পচা রোগ : আক্রান্ত অংশ পচে যায়। পচা আলুতে এক ধরনের উগ্র গন্ধ সৃষ্টি হয়।

নরম পচা রোগ দমন

ক. উচ্চ তাপ এড়ানোর জন্য আগাম চাষ করতে হয়।
খ. ভালোভাবে বাছাই করে আলু সংরক্ষণ করতে হয়।
গ. শতকরা ১ ভাগ ব্লিচিং পাউডার দ্রবণে বীজ আলু শোধন করতে হয়

১১.১.৫. আলুর ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন

আলুর কাটুই পোকার আক্রমণ : কাটুই পোকার কীড়া বেশ শক্তিশালী পিঠ কালচে বাদামি। কাটুই পোকার কীড়া চারা গাছ কেটে এবং আলুতে ছিদ্র করে ফসলের ক্ষতি করে থাকে।

কাটুই পোকা দমন

ক. কাটা আলু গাছ দেখে কীড়া খুঁজে সংগ্রহ করে মেরে ফেলা উচিত
খ. প্রতি লিটার পানির সাথে ডারসবান ২০ ইসি ৫ মিলি হারে মিশিয়ে গাছের গোড়া ও মাটি ভিজিয়ে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

আলুর সুতলি পোকার আক্রমণ : কীড়া আলুর মধ্যে লম্বা লম্বা সুড়ঙ্গ করে আলুর ক্ষতি করে থাকে। বাংলাদেশে কেবল বাড়িতে সংরক্ষিত আলুতে এ পোকা ক্ষতি করে

সুতলি পোকা দমন

ক. বাড়িতে সংরক্ষিত আলু শুকনা বালি, ছাই, তুষ অথবা কাঠের গুড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।
খ. আলু সংরক্ষণ করা আগে সুতলি পোকা দ্বারা আক্রান্ত আলু বেছে ফেলে দিতে হয়।

১১.১.৬. টিস্যু কালচারে বীজ আলু উৎপাদন

টিস্যু কলচার এক মজার পদ্ধতি যা প্রয়োগে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত গাছ উৎপাদন করা যায়। গবেষণাগারে উৎপন্ন মাইক্রোটিউবার নেট হাউজের ভিতর লাগিয়ে রোগমুক্ত আলু উৎপন্ন করা হয়। আলু গাছের প্রতিটি পাতার ফাঁকে একটি কুঁড়ি থাকে। এসব কুঁড়ি জীবাণুমুক্ত অবস্থায় কেটে কৃত্রিম পুষ্টিকর খাদ্য-মাধ্যমে স্থাপন করে বিশেষ মাত্রার তাপ এবং আলোতে রাখতে হয়। এ অবস্থায় কুঁড়ি থেকে ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে গাছ গজাতে আরম্ভ করে। টেস্টটিউবের ভিতর গাছ ৮-৯ পাতা বিশিষ্ট হলে প্রতিটি পর্বসন্ধি কেটে খাদ্যমাধ্যমে স্থাপন করতে হয়। ২০-২৫ দিনের মধ্যে প্রতিটি পর্বসন্ধি থেকে ৫-৬ সেন্টিমিটার গাছ পাওয়া যায়। এসব গাছে ভাইরাস রোগের উপস্থিতি 'ইলাইজা' পরীক্ষা করে জানতে হয়।

যদি পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ আসে তবে ধরে নিতে হয় গাছগুলো ভাইরাস রোগমুক্ত। ভাইরাসমুক্ত গাছ দিয়ে পর্বসন্ধি কর্তন করে সারা বছর ধরে গবেষণাগারে

টেস্ট টিউবের ভিতর গাছ এবং মাইক্রোটিউবার উৎপন্ন করা যায়। মাইক্রোটিউবার এবং এদের থেকে উৎপন্ন আলু কমপক্ষে ৩ বছর নেট হাউজের ভিতর লাগাতে হয়। উন্নত মানের বীজ আলু উৎপন্ন করতে এটি সহজ পদ্ধতি।

গবেষণাগারে একটি গাছ বা একটি মাইক্রোটিউবার উৎপন্ন করতে খরচ হয় মাত্র ১০ থেকে ২০ পয়সা। একটি গাছ থেকে জাত ভেদে ৩০-৪০টি আলু পাওয়া যায়। এসব আলুর আকার প্রায় ১৫-২৫ গ্রাম।

১১.১.৭. র‍্যাপিড মাল্টিপ্লিকেশন পদ্ধতিতে আলু উৎপাদন

স্প্রাউট কাটিং : বীজ আলু জমিতে লাগানোর ৪০-৪৫ দিন পূর্বে হিমাগার থেকে বের করে প্রথম ৩০ দিন অন্ধকারে এবং ১০-১৫ দিন ছায়াযুক্ত স্থানে রাখলে ৪-৭টি কুঁড়ি পাওয়া যাবে। এসব স্প্রাউট এর প্রতিটির গায়ে ৩-৫টি পর্ব সন্ধি পাওয়া যায়। সবগুলো কুঁড়ি কর্তন করে বীজতলায় লাগালে ৪-৭ দিনের মধ্যে শিকড়সহ লম্বা গাছ পাওয়া যায়।

টপ শুট কাটিং : আলু লাগানোর ২০-২৫ দিন পরে ৩-৫ সেন্টিমিটার লম্বা করে মাথা কেটে নিতে হয়। এসব কাটিং নেওয়ার সাথে সাথে ইনডোল বিউটারিক এসিড (২৫ পিপিএম) ও নেপথালিন এসিটিক এসিড (১২.৫ পিপিএম) মিশ্রিত রুটিং হরমোন দ্রবণে কর্তিত মাথা কয়েক সেকেন্ড ডুবিয়ে বেডে লাগাতে হয়। বীজতলা থেকে ১০ দিনের মধ্যেই শিকড়সহ কাটিং জমিতে লাগাতে হয়।

১১.১.৮. বিনা চাষে আলু উৎপাদন

বাংলাদেশের আবহাওয়ার আলু চাষ মৌসুম খুবই ছোট এবং ভূমির বন্ধুরতা বিভিন্ন রকম। যেমন– উঁচু, সমতল, ঢালু, নিচু ইত্যাদি। কোথাও কোথাও বর্ষার পানি সরে যেতে অনেক সময় লেগে যায়। সেসব জায়গায় দেরিতে আলু রোপণ করতে হয়– ফলে অনেক সময় ফলন খুব কম হয়। এ ধরনের নিচু জমিতে বিনা চাষে আলু উৎপাদন করা যায়।

রোপণের দূরত্ব ও পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে বীজ আলু মাটিতে ৬০×২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করতে হয়। রোপণের পর কচুরিপানা দিয়ে ৭-১২ সেন্টিমিটার পুরু করে ঢেকে দিতে হয়। তাতে বীজ অঙ্কুরোদ্গমে কোনো অসুবিধা হয় না। এ পদ্ধতিতে আলু সাধারণত মাটির উপরই উৎপন্ন হয়। কার্ডিনাল, ডায়মান্ট প্রভৃতি উচ্চ ফলনশীল জাত ব্যবহার করতে হয়।

সারের মাত্রা ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে জমিতে প্রতি হেক্টরে ইউরিয়া ৩০০-৩৩০ কেজি, টিএসপি ১৮০-২০০ কেজি এবং এমপি ৩০-৪০ কেজি সার রোপণের পূর্বে প্রয়োগ করতে হয়। বীজ আলু রোপণ সারির উভয় পার্শ্বে লাইন টেনে ঐ সার ব্যবহার করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

সতর্কতা

ক. জমিতে রস বেশি থাকলে বীজ আলু মাটির বেশি গভীরে রোপণ করা উচিত নয়।

ঙ. আলু মাটির উপরে জন্মায় এবং মালচিং ব্যবহার করার ফলে ইঁদুরের আক্রমণ বেশি হয় এবং তাই যথাসময়ে ইঁদুর নিধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হয়

১১.১.৯. আলুর বীজ উৎপাদন প্রযুক্তির সারমর্ম

ক. রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার।

খ. আগাম জাতের আলু লাগানো।

গ. অন্যান্য পরিচর্যা সম্পাদন।

ঘ. পাতা গজানোর পর থেকে ৭-১০ দিন পর পর জাব পোকা দমনের জন্য ওষুধ প্রয়োগ।

ঙ. দুই এক দিন পর পর রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা।

চ. আলু তোলার ৭-১০ দিন পূর্বে মাটির উপরের গাছ উপড়ে বা কেটে ফেলা।

ছ. আলু ৭০-৮০ দিন বয়সে তুলে দেখা।

জ. জাব পোকার চূড়ান্ত আক্রমণের পূর্বেই গাছ কেটে ফেলা।

অন্যান্য আলু ফসল, মরিচ, টমেটো, তামাক ইত্যাদি সোনালেসি গোত্রভুক্ত গাছ থেকে বীজ আলু ফসল অন্তত ৩০ মিটার দূরে লাগাতে হয়।

১১.১.১০. আলুর প্রকৃত বীজ উৎপাদন

আলু গাছে ফুল ফল উৎপাদন করে সেখান থেকে উৎপাদিত বীজকে উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ বা প্রকৃত বীজ বলে। বাংলাদেশে আলুর কন্দকে বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়

বর্তমানে সরবরাহকৃত কন্দ বীজের পরিমাণ মোট চাহিদার মাত্র ৩-৪%। বাকি বীজের অধিকাংশই কৃষক কর্তৃক সংরক্ষিত অনুন্নত বীজ। তাই আলু উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বীজ একটি প্রধান সমস্যা। আলুর প্রকৃত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করে আলু বীজের সমস্যা অনেকটা সমাধান করা সম্ভব।

১১.১.১০.১. আলুর বীজ ফসল উৎপাদন

ক. **জলবায়ু** : দীর্ঘ শীতকাল আলু বীজের জন্য অত্যাবশ্যক। দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রকৃত আলু বীজ উৎপাদনের জন্য অধিক উপযোগী।

খ. **জমি নির্বাচন** : সমতল মাঝারি উঁচু ও উঁচু জমি নির্বাচন করতে হয়।

গ. **মাটি** : উর্বর দোআঁশ মাটি, অম্লমান (pH) ৫.৫-৬.৫।

ঘ. **বীজ রোপণ সময়** : অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ

ঙ. **বীজ শোধন** : এগালল (০.৫% বা জিঙ্ক ফসফেট ০.০৫%) দ্রবণে মিনিটকাল শোধন করতে হয়

চ. **রোপণ দূরত্ব** : সারি থেকে সারি ৬০-৭৫ সেন্টিমিটার, বীজ থেকে বীজ ২০-২৫ সেন্টিমিটার, বীজের পরিমাণ ১.৫-২ টন (প্রতি বীজের ওজন ২৫-৩০ গ্রাম)

ছ. **চাষ পদ্ধতি :** সাধারণ আলু চাষের অনুরূপ তবে সুষম সার প্রয়োগ ও রোগ পোকা দমন নিশ্চিত করতে হয়।

১১.১.১১. প্রকৃত বীজ দিয়ে আলু উৎপাদন

প্রকৃত বীজ দিয়ে আলু উৎপাদন বাংলাদেশের একটি নতুন প্রযুক্তি। এ পদ্ধতিতে প্রকৃত বীজ ঘন করে লাগিয়ে অল্প জায়গা থেকে ছোট আলু উৎপাদন করা হয় যা পরবর্তী বছর বীজ আলু হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

কন্দকে বীজ হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও প্রকৃত বীজ থেকে আলু উৎপাদন করা যায়। সাধারণত তিন উপায়ে এই বীজ দ্বারা আলু উৎপাদন করা যায় যেমন–

ক. মাঠে সরাসরি প্রকৃত বীজ বপন

খ. বীজতলায় প্রকৃত বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে মাঠে চারা রোপণ।

গ. প্রকৃত বীজের চারা থেকে ছোট ছোট কন্দবীজ উৎপাদন করে পরবর্তী মৌসুমে মাঠে রোপণ

প্রকৃত বীজের সুবিধা

ক. এ বীজে ভাইরাসজনিত রোগ কম থাকে এবং উৎপাদন ক্ষমতা বেশি।

খ. বীজ আলু যেখানে হেক্টর প্রতি ২ টন দরকার, সেখানে ৫০ গ্রাম বীজের উৎপাদিত আলু দিয়ে ২য় বৎসর সেই পরিমাণ জমি আবাদ করা সম্ভব।

গ. রোপণ পদ্ধতিতে ১০০ গ্রাম বীজের চারা দিয়ে এক হেক্টর জমি রোপণ করা যায়। প্রকৃত বীজ লাগানোর পূর্বে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে নিতে হয়

বীজতলা : নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ১ মিটার× ১০ মিটার আকারে ৪টি বেড কুপিয়ে মাটি শুকিয়ে নিতে হয়। তারপর বর্গমিটার প্রতি পচা শুকনা ১ ঝুড়ি গোবর বা মুরগীর বিষ্ঠা, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমপি সার মাটিতে মিশিয়ে নিতে হয়। তারপর ২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে লাইন করে ৪ সেন্টিমিটার পর পর ২-৩টি বীজ বপন করতে হয়। বীজের উপরে গোবর মিশানো মাটি হাল্কা করে দিয়ে হাতের তালু দিয়ে একটু চেপে দিতে হয়– যাতে পানি দেয়ার সময় বীজ ভেসে না যায়। এরপরে ঝরনা দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হয়।

বীজ গজানো পর্যন্ত শুকনা নারিকেল বা সুপারির পাতা বা চাটাই দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। বীজ গজানোর এক সপ্তাহ পরে প্রতি গর্তে দু'টি করে চারা রেখে বাকিগুলো অন্যত্র লাগানো যেতে পারে। দ্বিতীয় সপ্তাহ পরে ১টি করে চারা রেখে বাকিটা তুলে দিতে হয়। এক মাস পরে চারা গোড়ার মাটি তুলে দিতে হয়, এর সাথে কিছু ইউরিয়া দিতে হয়। ৪০-৪৫ দিন বয়সে ইউরিয়াসহ আর একবার মাটি তুলে দিতে হয়। এরপরে সময়মতো পানি এবং ১০দিন পর পর কীটনাশক ছিটাতে হয়। ১০০ থেকে ১২০ দিন পর আলু উত্তোলন করা হয়।

বীজ আলু উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রকৃত বীজ লাগিয়ে প্রতি বর্গ মিটারে ৫ থেকে ৭ কেজি ছোট আলু পাওয়া যায়। এক কেজিতে গড়ে ১০০টি ছোট আলু থাকে। এই আলু

দ্বিতীয় বছর সাধারণ আলুর মত ৬০×২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে লাগিয়ে হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ টন আলু পাওয়া যায়। রোপণ পদ্ধতিতে প্রথম বছর ২০-২৫ টন খাবার আলু পাওয়া যায়, যার কিছু অংশ বীজ আলু হিসেবে পরের বছর ব্যবহার করা যায়।

বীজ আলুর জাত : বাংলাদেশে প্রকৃত বীজ থেকে আলু উৎপাদনের উপযোগী জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে–

ক. এইচপিএস -১/৬৭

খ. এইচপিএস-১১/৬৭ এবং

গ. এইচপিএস-৭/১৩

চারা রোপণে : সারি থেকে সারি দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪ সেন্টিমিটার।

১১.১.১১.১. আলুর প্রকৃত বীজ (হাইব্রিড টিপিএস) উৎপাদন পদ্ধতি : বাংলাদেশে আলুর সঙ্কর বীজ উৎপাদন একটি নতুন প্রযুক্তি ১৯৮৫ সন থেকে গবেষণা করে এ প্রযুক্তি বাংলাদেশের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া আলুর ফুল ও ফল উৎপাদনের জন্য খুব উপযোগী নয়। ভালো ফলন পেতে হলে দিনের দৈর্ঘ্য অন্তত ১৬ ঘন্টার প্রয়োজন। তাই হাই প্রেসার সোডিয়াম লাইট ব্যবহার করতে হয়। ৪০০ ওয়াট ৮টি বাল্ব ৫ মিটার উপর থেকে ঝুলিয়ে নিয়ে ১০০ বর্গ মিটার জমিতে আলুর ফুল ও ফল উৎপাদন করা যায়। আলু লাগানোর ১৫ দিন পর প্রতিদিন বিকাল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত আলো দিতে হয়। আলু লাগানোর জন্য ৫০ সেন্টিমিটার অন্তর এক মিটার চওড়া বেডে ২০ সেন্টিমিটার পর পর আলু রোপণ করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি বেডে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেন্টিমিটার রাখতে হয়। ১০০০ বর্গমিটার জমির জন্য ২০০ কেজি মাতৃ জাতের এবং ৫০ কেজি পিতৃ জাতের প্রয়োজন হয়। পিতৃ জাতের আলু ১০দিন পূর্বে লাগানো প্রয়োজন। ৩৫-৪০ দিন পর গাছে ফুল আসা আরম্ভ করে। এ সময় পুরুষ গাছের ফুল তুলে রেণু সংগ্রহ করে ডেসিকেটরে সিলিকা জেলসহ রেখে দিতে হয়। স্ত্রী গাছের ফুল ফোটার আগের দিন ফুলের গর্ভকেশর রেণুর ভিতর ডুবিয়ে দিতে হয়। প্রতি ফুলে বিকেলে ২-৩ বার পরের দিন সকালে এবং বিকালে রেণু প্রয়োগ করতে হয়। পরাগায়নের দেড় মাস পরে ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করে শুকিয়ে ডেসিকেটরে রাখতে হয়।

১১.১.১২. কৃষক পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ

আলু সংগ্রহের মৌসুমে প্রচুর পরিমাণ আলু কৃষক বাড়িতে সংরক্ষণ করে। সে কারণে সংরক্ষণকালীন সময়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। এতে আলু ৫ থেকে ৬ মাস ভালোভাবে ঘরে সংরক্ষণ করা যায় এবং ৩ থেকে ৪ মাস পর বিক্রি করে কৃষক লাভবান হতে পারে। আলু সংগ্রহের সময় নিচের বিষয়সমূহের লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

ক. মেঘলা দিনে আলু তোলা যাবে না।
খ. আলু পরিপক্ব হলে তুলতে হয়, আলু উত্তোলনের ৭-১০ দিন আগে আলু গাছ গোড়া কেটে 'হামকিলিং' (Halm killing) করতে হয়।
গ. আলু তোলার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেন আলু কেটে না যায়।
ঘ. আলু আনার সময় চটের ব্যাগ বা বস্তা ব্যবহার করা ভালো।
ঙ. বস্তায় আলু ভরার সময় বাঁশের ঝুড়ির বদলে প্লাস্টিকের ঝুড়ি বা গামলা ব্যবহার করা উত্তম। যদি বাঁশের ঝুড়ি ব্যবহার করতে হয় তাহলে ঝুড়ির মাঝখানে ছালা বিছিয়ে সেলাই করে নিতে হয়।
চ. আলু সংগ্রহ শেষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। যদি আলু ক্ষেতে রাখতে হয় তা হলে ছায়াযুক্ত জায়গায় পাতলা কাপড় বা খড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়।
ছ. আলু সংগ্রহ করা সম্পূর্ণরূপে শেষ হলে ১ থেকে ৭ দিন 'কিউরিং' করতে হয়।
জ. আলু সংরক্ষণ করার আগে কাটা, সবুজ, রোগাক্রান্ত আলু বাছাই করতে হয়।
ঝ. বাছাই করা আলু বাড়ির সবচেয়ে ঠাণ্ডা ও বাতাসযুক্ত ঘরে সংরক্ষণ করতে হয়।
ঞ. সংরক্ষিত আলু ঢিবি করে বা ১০-১৫ সেন্টিমিটার উঁচু করে মেঝেতে বিছিয়ে রাখা দরকার। এছাড়া বাঁশের তৈরি মাচায় বা খাটের নিচেও আলু বিছিয়ে রাখা যেতে পারে।
চ. সংরক্ষিত আলু ১০-১৫ দিন পর নিয়মিত বাছাই করতে হয়।
ছ. গাড়িতে আলুর বস্তা উঠানোর আগে বস্তার মুখ দড়ি দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে নিতে হয়।

১১.২. মিষ্টি আলু

নিরক্ষীয় আমেরিকা মিষ্টি আলুর উৎপত্তি স্থান। আমেরিকা আবিষ্কারের পর স্পেনীয় নাবিকরা বিভিন্ন মহাদেশে মিষ্টি আলুর বিস্তার ঘটায়। তারপর ফিলিপাইন হয়ে মিষ্টি আলুর চাষ বিস্তার লাভ করে। পর্তুগীজরা ১৮৭৪ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে মিষ্টি আলুর প্রবর্তন করেছিল।

১১.২.১. মিষ্টি আলুর উদ্ভিদতত্ত্ব

মিষ্টি আলু Convolvulacee গোত্রের উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Ipomoea batates* এবং ইংরেজি নাম Sweet potato।

মিষ্টি আলু প্রজাতি পরিচিতি

ক. পারগাটা *(I. purgata)* : এর কন্দমূল দিয়ে বিরেচক ওষুধ তৈরি হয়।
খ. বেটালিলা *(I. batalilla)* : ভেনেজুয়েলায় এর কন্দমূল মিষ্টি আলুর ন্যায় খাওয়া হয়।
গ. টারপেথাম *(I. turpethum)* : তাহিতি দ্বীপে ছোট ছেলেমেয়েরা মিষ্টি কাণ্ড চুষে খায়।

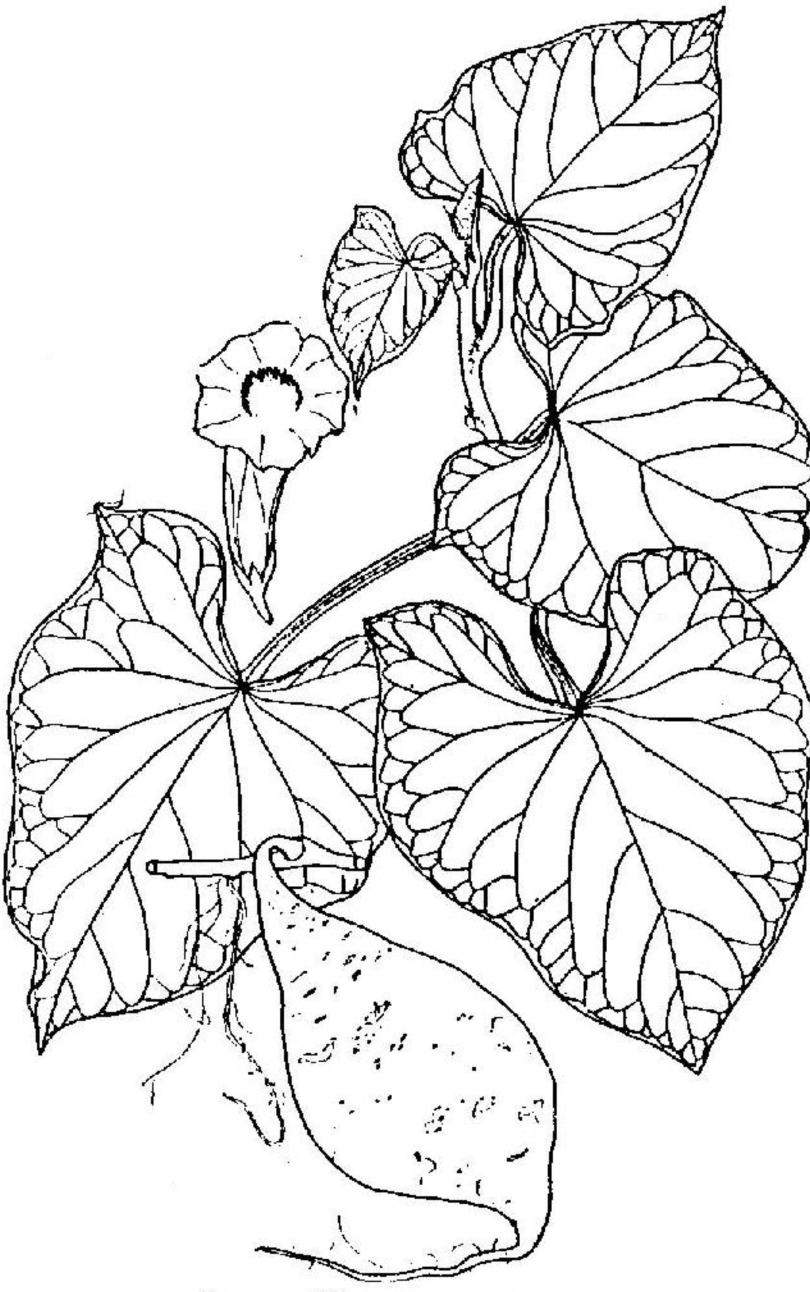

চিত্র ১১.২ : মিষ্টি আলুর মূল, কাণ্ড, পাতা ও ফুল

ঘ. বিলোবেড (*I. bilobad*) : তাহিতি দ্বীপে দুর্ভিক্ষের সময় এর কাণ্ড খাওয়া হয়।
ঙ. টিউবারোসা (*I. tuberosa*) লেপ্টোফাইলা (*I leptophyla*) : এ দুটি প্রজাতির কন্দমূল দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় সীমিতভাবে খাওয়া হয়।
চ. পেস্টিগ্রিডিস (*I. pestigridis*) এরিওকারপা (*I. eriocarpa*) : ভারতের কোনো কোনো স্থানে এগুলো সবজি ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মিষ্টি আলু একটি হেক্সাপ্লয়েড যার জেনোম ১৫টি ক্রোমোজম নিয়ে গঠিত (x= 15, 2n = 90) আইপোমিয়া গণের প্রজাতিসমূহের মধ্যে কেবল *bataes*-ই হেক্সাপ্লয়ড, অন্যান্যগুলো মধ্যে অধিকাংশ ডিপ্লোয়েড, কিছু সংখ্যক টেট্রাপ্লয়ড-এর কচিৎ দু'একটি ট্রিপ্লয়েড।

পাতা : মিষ্টি আলুর পাতা সরল ও দীর্ঘ বোঁটাধারী। ফলক ৫-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও চওড়া, হাতের পাঞ্জার মতো খণ্ডিত পাতা সবুজ অথবা হাল্কা বেগুনি

কাণ্ড : ডাল-পালা শাখা বৃদ্ধির ধরন অনুযায়ী আলুর জাতসমূহকে ঝোপালো ও লতানো-এ দুভাগে ভাগ করা হয়। ঝোপালো কাণ্ডে পর্ব খাটো। আলু সরু, নলাকার। কচি অবস্থায় কাণ্ড রোমশ।

শিকড়: শাখা কলম এবং কন্দমূলের চারার সব মূলই অস্থানিক। আসল বীজ থেকে উৎপাদিত গাছ অন্যান্য উদ্ভিদের ন্যায় ভ্রূণমূল উৎপাদন করে যা ক্রমে শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে। পারিবেশিক অবস্থাভেদে বিভিন্ন সংখ্যক মূল খাদ্য জমা করে কন্দমূলে পরিণত হয়। মিষ্টি আলুর মূল সরু কিন্তু মাটির খুব গভীরে প্রবেশ করে, এ কারণে গাছের খরা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে।

আকার-আকৃতি ও বর্ণের দিক দিয়ে মিষ্টি আলুর কন্দমূলে প্রচুর বৈচিত্র্য বিদ্যমান। জাত অনুযায়ী এক একটি কন্দমূল কয়েক গ্রাম থেকে কয়েক কেজি পর্যন্ত হতে পারে। কন্দমূল আকৃতিতে মোচাকার (fusiform), শালগমাকার (napiform), গোলাকার, উপবৃত্তাকার, লম্বাটে অথবা অনিয়মিত হতে পারে।

মূলের ত্বক মেটে, বেগুনি লাল অথবা হলুদ। শাঁস সাদা, ঘিয়ে অথবা কমলা। কোনো কোনো জাতে সাদা শাঁসে বেগুনি ছোপ থাকে শাঁসের সর্বত্র কষনালী বিদ্যমান। মূল কাটলে সাদা কষ বের হয়, বাতাসের সংস্পর্শে এটি কালো বর্ণ ধারণ করে এবং আঠালো হয়ে যায় মিষ্টি আলুর জাতসমূহকে নরম শাঁসবিশিষ্ট ও শুকনা শাঁসবিশিষ্ট এ দুভাগে ভাগ করা হয়। নরম কন্দমূল সিদ্ধ করার পর নরম স্যাঁতসেঁতে থেকে যায়।

ফুল, ফল ও বীজ : পাতার কক্ষে সাইমজাতীয় মঞ্জরিতে মিষ্টি আলুর ফল উৎপন্ন হয় প্রতিটি মঞ্জরিতে ১-১২টি মুকুল থাকে কিন্তু সবগুলো ফুলে পরিণত হয় না। ফুলের বৃতি পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত দলমণ্ডল বর্গাকার, ব্যাসে ২.৫-৫ সেন্টিমিটার, বর্ণে হাল্কা বেগুনি অথবা সাদা। স্ত্রীকেশরে দুটি ডিম্বধর থাকে ফুলে মৌ-গ্রন্থি থাকে। মিষ্টি আলুর ফুল

ভেরে ফোটে। এটি পতঙ্গ পরাগী। মিষ্টি আলুর ফল একটি বিদারণশীল ক্যাপসুল ফুল ফোটার এক মাসের মধ্যে বীজ পরিপক্বতা লাভ করে প্রতিটি ফলে ১ থেকে ৪টি বীজ থাকে। বীজ গভীর বাদামি ব্যাসে ৩-৫ মিমি প্রতি ১০০টি বীজের ওজন ১ ৩.০ গ্রাম, বীজের ত্বক শক্ত। ত্বকে কোনোভাবে ক্ষত সৃষ্টি না করলে এটি সহজে অঙ্কুরিত হয় না।

১১.২.২. জলবায়ু ও মাটি

মিষ্টি আলু উষ্ণমণ্ডলীয় ফসল হলেও এর চাষ ৪০° উত্তর অক্ষাংশ ৩২° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত নিরক্ষীয় অঞ্চলে জন্মানো যায়। মিষ্টি আলুর গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ও কন্দমূল উৎপাদনের উপর তাপমাত্রা, আলো এবং মাটির সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। ১০ ডিগ্রির নিচে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং হিমাঙ্কে গাছ বেঁচে থাকতে পারে না উচ্চ তাপমাত্রায় গাছের লতানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য পরিচর্যা : সমতল জমিতে চারা রোপণ করে পরবর্তীতে দুই কিস্তিতে সারি বরবার আইল উঠাতে হয়। প্রথমবার রোপণের ১৪-১৫ দিন পর এবং ২য় বার রোপণের ৩০-৪০ দিন পর। দুই কিস্তিতে আইলের উচ্চতা হয় ১২-১৫ সেন্টিমিটার

আগাছা দমন : চারার রোপণের পর থেকে চারা বয়স ৩৫-৪০ দিন না হওয়া পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হয়।

ফসল সংগ্রহ : চারা রোপণের পর ১৩০-১৫০ দিনের মধ্যে মিষ্টি আলু সংগ্রহ করতে হয়। দেরি করে উঠালে আলুতে আঁশের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

মিষ্টি আলুর প্রক্রিয়াজাতকরণ : মিষ্টি আলু বিশেষ করে কমলাসুন্দরী, বারি-৪ এবং বারি-৫ প্রচুর পরিমাণ ক্যারোটিন আছে যা ভিটামিন 'এ' এর একটি ভালো উৎস মিষ্টি আলু স্বাভাবিক অবস্থায় মাত্র ১-২ মাস সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে চিপস, শুকানো চিপস, জ্যাম, জেলি ও সস করা যায়। শহর ও গ্রামের মেয়েরা ঘরে বসে এসব খাবার তৈরি করে খেতে পারে ও প্রয়োজন বিক্রি করে আর্থিক উন্নতি সাধন করতে পারে। দৌলতপুরী ও তৃপ্তি থেকে ভালো চিপস, হালুয়া তৈরি করা যায় এবং কমলাসুন্দরী, বারি মিষ্টি আলু-৪ ও বারি মিষ্টি আলু-৫ থেকে জ্যাম, জেলি সস ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

১১.২.৩. মিষ্টি আলুর উন্নত জাত

(১) বারি মিষ্টি আলু-১ (তৃপ্তি)

ফিলিপাইন থেকে 'টিনিরিনিং' নামে একটি লাইন ১৯৮১ সালে সংগ্রহ করে বাংলাদেশের অন্যান্য সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের সাথে তুলনামূলক পরীক্ষা করা হয়। সেখান থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯৮৫ সালে উক্ত লাইনটি 'তৃপ্তি' নামে অবমুক্ত করা হয়। এ জাতটির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. এ জাতের কাণ্ড বেগুনি।
খ. কাণ্ডের গাঁয়ে ঘন লোম আছে।
গ. কাণ্ডের অগ্রভাগ সবুজ, পাতা গাঢ় সবুজ ও খাঁজবিহীন।
ঘ. কন্দমূল সাদা, শাঁস হাল্কা ও স্যাঁতস্যাঁতে
ঙ. মূলের ওজন ২০০-৩০০ গ্রাম, তবে কোনো কোনো সময় একেকটি মূল ১.৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।
চ. কন্দমূল লম্বাটে উপবৃত্তকার।
ছ. প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে প্রায় ৪৫০ আ. ইউ. ভিটামিন 'এ' আছে।
জ. জীবনকাল ১৩৫-১৪০ দিন।
ঝ. স্বাভাবিক অবস্থায় এর ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ৪০-৪৫ টন।
ঞ. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ৮০টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারে।
ট. রোগবালাই তেমন নেই।
ঠ. বাংলাদেশের সব জেলাতেই এ আলুর চাষ করা যায়।

(২) বারি মিষ্টি আলু-২ (কমলা সুন্দরী)

এশীয় সবজি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, তাইওয়ান থেকে লাইনটি ১৯৮০ সনে সংগ্রহ করে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ১৯৮৫ সালে 'কমলা সুন্দরী' নামে মুক্ত করা হয়। এ জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. এ জাতের কাণ্ড সবুজ।
খ. পাতা কচি অবস্থায় বেগুনি, কাণ্ডের অগ্রভাগ বেগুনি।
গ. পাতা সবুজ, খাঁজকাটা বিহীন।
ঘ. কন্দমূল লাল, শাঁস কমলা বর্ণের দেখতে গাজরের মতো
ঙ. কন্দমূলের আকৃতি উপবৃত্তার থেকে লম্বাটে, দেখতে অতি আকর্ষণীয়।
চ. কন্দমূলের ওজন প্রায় ১৭৫-২২৫ গ্রাম।
ছ. শাঁস নরম। প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে প্রায় ৭,৫০০ আ. ইউ. ভিটামিন 'এ' আছে।
ঙ. পাতার উল্টাদিকের শিরা বর্ণহীন দেখে সহজে চেনা যায়।
চ. জীবনকাল ১৩৫-১৪০ দিন।
ছ. এর ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ৪০-৪৫ টন। তবে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ৪০-৪৫ টন ফলন পাওয়া যায়।
ছ. বাংলাদেশের সব জেলাতেই এ আলুর চাষ করা যায়।

(৩) বারি মিষ্টি আলু-৩ (দৌলতপুরী)

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাছাই করে এ জাতটি ১৯৮৮ সনে দৌলতপুরী নামে অবমুক্ত করা হয়। এ জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. এ জাতের কাণ্ড সবুজ
খ. পাতা খাঁজকাটা ও সবুজ।
গ. কন্দমূল সাদা, শাঁস সাদা, শুষ্ক পদার্থ শতকরা ৩০-৩৩ ভাগ।
ঘ. কন্দমূলের আকৃতি লম্বাটে।
ঙ. কন্দমূলের ওজন প্রায় ১৮০-২০০ গ্রাম।
চ. জীবনকাল ১৩৫-১৪০ দিন।
ছ. ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ৩০-৩৫ টন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ৪০-৪৫ টন পর্যন্ত হয়ে থাকে

(৪) বারি মিষ্টি আলু-৪

কমলা সুন্দরী, তৃপ্তি, দৌলতপুরী ও এসপি-০২৯ এর সাথে সঙ্করায়নের মাধ্যমে বারি মিষ্টি আলু-৪ জাত ১৯৯৪ সালে অবমুক্ত করা হয়। এ জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক. একটি উচ্চফলনশীল, ক্যারোটিন সমৃদ্ধ ও মাঝারি শুষ্ক শাঁসযুক্ত জাত।
খ. এ জাতের কাণ্ড সবুজ কাণ্ডের অগ্রভাগ বেগুনি।
গ. কচিপাতা বেগুনি, পাতা খাঁজবিহীন।
ঘ. কন্দমূল ও শাঁস ক্রিম বর্ণের
চ. কন্দমূলের গড় ওজন ১৭০-১৮৫ গ্রাম, শাঁস মাঝারি শুষ্ক।
ছ. কন্দমূলের আকৃতি উপবৃত্তাকার ও আকর্ষণীয়।
জ. প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে প্রায় ১০৫০ আ. ইউ. ভিটামিন 'এ' আছে।
ঝ. পাতার উল্টাদিকের রঞ্জিত শিরা দেখে এ জাতটিকে সহজে চেনা যায়।
ঞ. জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন।
চ. সাধারণ অবস্থায় এর ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ৩৫-৪০ টন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন হয় ৫০-৬০ টন।
ছ. বিশেষ করে যশোর ও খুলনা অঞ্চলে এ জাতটি আগাম চাষ করা যায়।

(৫) বারি মিষ্টি আলু-৫

কমলাসুন্দরী, তৃপ্তি, দৌলতপুরী ও এসপি-০২৯ এর মধ্যে সঙ্করায়নের মাধ্যমে বারি মিষ্টি আলু-৫ নামে জাতটি ১৯৯৪ সালে অবমুক্ত করা হয়। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. ইহা একটি উচ্চ ফলনশীল, ক্যারোটিন সমৃদ্ধ ও শুষ্ক শাঁসযুক্ত জাত।
খ. এ জাতের কাণ্ড ও কাণ্ডের অগ্রভাগ সবুজ। কাণ্ড লোমযুক্ত।
গ. কচি পাতা সবুজ।
ঘ. পাতা সামান্য খাঁজ কাটা। কচি পাতায় বেশি খাঁজকাটা থাকে।
ঙ. পরিপক্ব পাতায় অনেক সময় খাঁজকাটা থাকে না।
চ. কন্দমূল লম্বাটে বৃত্তাকার ক্রিম বর্ণের।

ছ. কন্দমূলের ওজন ১৮০-১৯০ গ্রাম।
জ. কন্দমূলের আকৃতি উপবৃত্তাকার ও আকর্ষণীয়। প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে প্রায় ১০৫০ আই. ইউ. ভিটামিন 'এ' আছে।
ঝ. কাণ্ডের বেগুনি অগ্রভাগ ও পাতার উল্টা দিকের রঞ্জিত শিরা দেখে এ জাতটিকে সহজে চেনা যায়।
ঞ. জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন।
ট. ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ৩৫-৪০ টন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ৫০-৬০ টন ফলন পাওয়া যায়।
ঠ. বাংলাদেশে বিশেষ করে যশোর ও খুলনা অঞ্চলে এ জাতটি আগাম চাষ করা যায়।

১১.২.৪. মিষ্টি আলুর উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি : বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত।

বপনের সময় : অক্টোবর থেকে নভেম্বর।

রোপণ পদ্ধতি : ৫৬ হাজার/হেক্টর লতার মাথা থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড রোপণ করা উচিত। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার এবং আলু থেকে আলুর দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার। সমতল পদ্ধতিতে সারি তৈরি করে লাগাতে হয়। যাতে ২-৩টি পর্ব মাটির নিচে থাকে।

সারের পরিমাণ : মিষ্টি আলুর চাষে নিচে উল্লেখিত হারে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন

সারের নাম	প্রতি হেক্টরে সারের পরিমাণ
গোবর	৭-১০ টন
ইউরিয়া	১৪০-১৬০ কেজি
টিএসপি	১২০-১৩০ কেজি
এমপি	১৫০-১৮০ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : গোবর ও টিএসপি শতকরা ২৫% ভাগ ইউরিয়া, এবং ২৫% ভাগ এমপি বপনের সময় জমিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয় বাকি ইউরিয়া এবং এমপি বপনের ৬০দিন পর সারির পার্শ্বে প্রয়োগ করতে হয়।

সেচ প্রয়োগ : জমির আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে সেচের সংখ্যা ২-৩ বার হতে পারে।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা হিসেবে নালা তৈরি : ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগের সময় ২ বার নালা বেঁধে দিতে হয়।

মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা : পূর্ণবয়স্ক উইভিল্স পিঁপড়ার মত। এ পোকার মাথায় শুঁড়ের মত একটি মুখাংশ আছে। মাথা এবং পাখার উপরিভাগ ধাতব নীল কীড়া কন্দমূলের ভিতরে আঁকাবাকা সুড়ঙ্গ করে ক্ষতি করে থাকে। উইভিল আক্রান্ত কন্দমূল মানুষ এমনকি গরুর খাওয়ারও অযোগ্য হয়ে পড়ে। আক্রান্ত আলু সিদ্ধ করলে শক্ত হয়ে যায় এবং খেতে দুর্গন্ধযুক্ত ও তিতা স্বাদের

উইভিল পোকা দমন পদ্ধতি

ক. মাঠে এবং গুদামে উভয় জায়গাতেই পোকা দমন করা প্রয়োজন। গাছের সারিতে মাটি তোলার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে পুরানো লতা এবং কন্দমূল মাটির নিচে থাকে।

খ. উইভিল আক্রমণমুক্ত কন্দমূল শুষ্ক বালি দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়

১১.২.৪.১. চর অঞ্চলে মিষ্টি আলুর চাষ

জমি নির্বাচন ও তৈরি : চর অঞ্চলের বেলে দোআঁশ মাটি মিষ্টি আলুর জন্য উৎকৃষ্ট মাটির 'জো' অবস্থায় ৩-৪টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়।

রোপণের সময় : অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত।

লতার প্রকার, রোপণ পদ্ধতি ও চারার পরিমাণ : মিষ্টি আলুর লতার ১ম ও ২য় খণ্ড রোপন করা উচিত। তবে ১ম খণ্ড উত্তম। প্রতিটি খণ্ডের দৈর্ঘ্য হয় ২৫-৩০ সেন্টিমিটার। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব হয় ৩০ সেন্টিমিটার। প্রায় তিনটি গিঁট মাটির নিচে থাকা উত্তম। উপরোক্ত দূরত্বে চারা রোপণ করতে প্রতি হেক্টরে চারার প্রয়োজন ৫৫,৫০০টি।

সারের পরিমাণ : চর অঞ্চলে মিষ্টি আলুর চাষে নিচে উল্লেখিত হারে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	১৩০-১৪০ কেজি
টিএসপি	৭০-৮০ কেজি
এমপি	১৪০-১৫০ কেজি
গোবর	৫-৭ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : গোবর, টিএসপি, এমপি, ইউরিয়া জমি তৈরির সময়, অর্ধেক ইউরিয়া চারা রোপণের ১৪-১৫ দিন পর এবং বাকি অর্ধেক ৩০-৩৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন : দেশী জাতসমূহে কন্দমূল উৎপাদন অপেক্ষাকৃত দেরিতে শুরু হয়। ভালো ফলন পেতে হলে অন্তত ১৫০ দিন পর ফসল তোলা উচিত। সংরক্ষণ করতে হলে পরিপক্ব হওয়ার পর কন্দমূল তোলা উচিত। কন্দমূল কাটলে যদি এটির কষ বিবর্ণ না হয়ে দ্রুত শুকিয়ে যায় তাহলে বুঝতে হয় মূলে পরিপক্বতা এসেছে পরিপক্বতা লাভের সাথে সাথে কন্দমূলে শর্করা ও ক্যারোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়

বাংলাদেশে মিষ্টি আলুর ফলন হেক্টর প্রতি ১০-১৫ টন দেশী জাতসমূহের ফলনশীলতা কম। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করলে কমলা সুন্দরী ও তৃপ্তি ২০ টনের অধিক ফলন দিতে পারে। অধিকাংশ জাতে কন্দমূল ও লতার ওজন প্রায় সমান

সংরক্ষণ : মিষ্টি আলুর সংরক্ষণ গুণাবলী তাৎপর্যপূর্ণ ১২.৬-১৫.০° সে. তাপমাত্রা এবং ৮০-৮৫% আদ্রর্তায় মূল ৪-৬ মাস রাখা যায় এ সময়ে ওজন ১০-১৫% হ্রাস পায় গুদামে নেওয়ার পূর্বে ২৯.৭০৪ সে. তাপমাত্রায় এবং ৮৫-৯০% আর্দ্রতায় ৫-১০ দিন রেখে মূলের ক্ষত সারানো হয়, এ প্রক্রিয়াকে কিউরিং বলা হয়।

১০° সে. নিচের তাপমাত্রায় কন্দমূল হিমাঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এতে কোষ কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে এবং মূল দ্রুত নষ্ট হয়।

১১.৩. কচু

কচু বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সবজি। মৌসুমভেদে এদেশে বহু ধরনের কচুর চাষাবাদ হয়। নিচে সংক্ষেপে কচুর প্রকারভেদ উল্লেখ করা হলো।

ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	বাংলা নাম
কোকো ইয়াম (Coco-yam)	*xanthosama violaceum*	দুধকচু, সুরমা কচু, কাজলা কচু
	xanthosoma atrovirens	মৌলভী কচু, সাহেবী কচু, বাবু কচু, সাদা কচু
জায়ান্ট টারো (Giant taro)	*Alocasia maurorhiza*	ফেন কচু বা মান কচু
ওলকচু (Elephant foot yam)	*Amorhpophallus campanulatus*	ওলকচু
টারো (Taro)	*Colocasia esculenta*	উঁচু জমিতে চাষকৃত জাতের নাম মুখী কচু, পঞ্চমুখী কচু, পাইদনাল কচু, গারো কচু, কুরি কচু মাঝারি উঁচু জমিতে চাষকৃত জাতের নাম ছোরা কচু, ইটালি কচু, নাগা কচু, পেচা কচু, দেশী কচু, শাক্তি কচু, দুলি কচু, ঝুমেরমুখী কচু, বিন্নি কচু, ঘাট কচু নিচু জমিতে চাষকৃত জাতের নাম পানিকচু, নারিকেলি কচু, শোলা কচু, জাত কচু, বাঁশ কচু, খামা কচু, বাক্স কচু মদন কচু, কাঠ কচু

১১.৩.১. পানি কচু

যে সব কচু আবাদের জন্য সাধারণত দাঁড়ানো পানি প্রয়োজন সেগুলোকে পানি কচু বলে আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই কচু একটি সুস্বাদু সবজি হিসেবে পরিচিত। কচু বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সবজি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী (১৯৯৬-৯৭) ১৬ হাজার হেক্টর জমিতে বিভিন্ন কচু চাষ করে ১২০ হাজার মেট্রিক টন কচু উৎপাদন করা হয়। কচুর মধ্যে ৮৫% পানি কচু ও মুখী কচু।

১১.৩.১.১. বাংলাদেশের পানি কচুর উন্নত জাত

লতিরাজ : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে কচুর জাতসমূহ সংগ্রহ এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'লতিরাজ' নামক একটি উফশী জাত ১৯৮৮ সালে উদ্ভাবন করা হয় এ জাতের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ।

ক. লতিরাজ জাতে কাণ্ড অপেক্ষা লতির প্রাধান্য বেশি।

খ. উপযুক্ত পরিবেশে অনেক বেশি লতি উৎপন্ন করে

গ. লতি বেশ লম্বা (৯০-১০০ সেন্টিমিটার) পুরু, সামান্য চ্যাপ্টা, সবুজ, দেখতে আকর্ষণীয়।

ঘ. গাছ মাঝারি আকারের শক্ত, সবুজ, পাতা সবুজ

ঙ. লতি সিদ্ধ করলে সমানভাবে সিদ্ধ হয়।

চ. লতা গলে যায় এবং গলা চুলকানি মুক্ত।

ছ. বোঁটা এবং পাতার সংযোগস্থলের উপরিভাগ বেগুনি রঙের।

জ. জীবনকাল ১৮০-২১০ দিন লাগানোর ২ মাস পর থেকে শুরু করে ৬-৭ মাস পর্যন্ত লতি হয়ে থাকে।

ঝ. হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ টন লতি এবং প্রায় ২০ টন কাণ্ড উৎপন্ন করে।

ঞ. বাংলাদেশের সব জেলাতেই এর চাষ করা যায়

১১.৩.১.২. পানি কচু উৎপাদন পদ্ধতি

মাটি : দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ মাটি এ জাতের কচু চাষের জন্য উপযোগী।

রোপণের সময় : পানি কচু সাধারণত খরিপ মৌসুমে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে লাগানো হয়। অনেক জায়গায় অক্টোবর নভেম্বর মাসেও লাগানো হয়। এ ক্ষেত্রে পুরো শীতকাল গাছের কোনো বৃদ্ধি হয় না। শীতের পর পরই বৃদ্ধি শুরু হয়। অক্টোবর থেকে নভেম্বর আগাম ফসলের জন্য এবং মার্চ-এপ্রিল দক্ষিণাঞ্চলের জন্য উপযুক্ত রোপণ সময়।

বীজ হার : ৩৫-৪০ হাজার হেক্টর গুঁড়ি চারা বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বীজ রোপণের দূরত্ব : সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪৫ সেন্টিমিটার।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : গোবর, টিএসপি এবং এমপি রোপণের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া সার ২ বা ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করা হয় তবে, প্রথম কিস্তি রোপণের ২০-২৫ দিনের মধ্যে দিতে হয়

সার প্রয়োগ : পানি কচু চাষে নিম্নে বর্ণিত সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সারের নাম	প্রতি হেক্টরে সারের পরিমাণ
গোবর	১০-১৫ টন
ইউরিয়া	১৪০-১৬০ কেজি
টিএসপি	১২০-১৩০ কেজি
এমপি	১৫০-১৭০ কেজি

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা : পানি কচুর গোড়ায় দাঁড়ানো পানি রাখতে হয় এবং জলাবদ্ধতা দূর করতে মাঝে মাঝে দাঁড়ানো পানি নেড়ে চেড়ে দিতে হয়। লতিরাজ জাতের পানি কচুর জন্য দাঁড়ানো পানির গভীরতা ৮-১০ সেন্টিমিটার হতে হয়।

কচুর পাতার মড়ক রোগের লক্ষণ : পাতার উপর বেগুনি হতে বাদামি রঙের গোলাকার দাগ পড়ে। পরবর্তীতে এ সব দাগ বৃদ্ধি পেয়ে পাতা ঝলসে যায়। উচ্চতাপমাত্রা, আর্দ্র আবহাওয়া ও পরপর ৩-৪ দিন বৃষ্টি এ রোগের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

প্রতিকার : রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রিডোমিল এম জেড-৭২ ডব্লিউ কিংবা ডাইথেন এম ৪৫ মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ৩ থেকে ৪ বার প্রয়োগ করতে হয়।

১১.৩.২. মুখীকচু

মুখীকচু একটি উৎকৃষ্ট সবজি। বৈজ্ঞানিক নাম *Alocasia esculenta* । মুখীকচু ছড়াকচু, গুঁড়ি কচু নামেও পরিচিত। এর মুখী বা কন্দের আকার ছোট কন্দের যথেষ্ট ফলন হয়ে থাকে

ব্যবহার : বিভিন্ন তরকারিতে এটি আলুর স্থলাভিষিক্ত হয় মুখীকচু সহজপ্রাচ্য ও সুস্বাদু। কোনো এক সময়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এটি প্রধান খাদ্য রূপে বিবেচিত হতো। বাংলাদেশে সিলেট পাবনা ও বগুড়া প্রধান মুখীকচু উৎপাদনকারী জেলা।

মাটি : উঁচু বেলে, দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী। জমি শুষ্ক ও ছায়াবিহীন হওয়া উচিত।

১১.৩.২.১. মুখীকচু উৎপাদন পদ্ধতি

মার্চ-এপ্রিল মাসে বাক্সের মধ্যে খড়ের অভ্যন্তরে মুখীসমূহকে ১০-১২ দিন রাখতে হয়। তারপর ৬০×২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে ৫-৮ সেন্টিমিটার গভীর করে রোপণ করা যেতে পারে। রোপণের পূর্বে জমির মাটি ভালোভাবে চাষ করে মাটির সাথে গোবর খৈল সুপার ফসফেট ও সার দিতে হয়।

রোপণের মাসখানেক পরে ইউরিয়া ও পটাশ সারের অর্ধেক পরিমাণ সারির উভয় পার্শ্বে প্রয়োগ করে পানি সেচ দিতে হয়। 'জো' আসলে দুইসারির মধ্যবর্তী স্থানে কোদাল দ্বারা কর্ষণ করে সারিতে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হয় এর মাস

দেড়েক পরে আবার অবশিষ্ট ইউরিয়া ও পটাশ সার প্রয়োগ করতে হয়। পানি সেচ দেওয়ার পর 'জো' আসলে গোড়ায় দ্বিতীয়বার মাটি উঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এ শস্যের প্রথম ২-৩ মাস জমিতে খড় দিয়ে ঢেকে রাখলে মাটিতে রস সংরক্ষণের সুবিধা হয়।

মুখীকচু একটি জনপ্রিয় ও সুস্বাদু সবজি। এটি খরিফ মৌসুমের সবজি চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ পূরণ করে থাকে। মুখীকচুর ছড়া বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয় সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটি এ কচু চাষের জন্য ভালো। মুখী কচুর গাছ হলদে হয়ে শুকিয়ে গেলে সংগ্রহ হয়। এতে ৬-৭ মাস সময় লাগে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বিলাসী' নামে একটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে।

১১.৩.২.২. বিলাসী মুখীকচু উৎপাদন প্রযুক্তি

বিলাসী মুখী কচুর বৈশিষ্ট্য : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম হতে গবেষণার মাধ্যমে 'বিলাসী' নামে একটি উফশি জাত উদ্ভাবন করা হয় পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে অবমুক্ত করা হয়। এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

- ক. উচ্চ ফলনশীল
- খ. বিলাসি গুণে উৎকৃষ্ট।
- গ. এর গাছ সবুজ, খাড়া, মাঝারি লম্বা।
- ঘ. এর মুখীগুলো মসৃণ ও ডিম্বাকৃতি।
- ঙ. সিদ্ধ মুখী নরম ও সুস্বাদু। সিদ্ধ করলে মুখী সমানভাবে সিদ্ধ হয় ও গলে যায়।
- চ. খাওয়ার পর গলা চুলকায় না।
- ছ. জীবনকাল ২১০-২৮০ দিন।
- জ. ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ২৫-৩০ টন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ৩৫-৪০ টন পর্যন্ত ফলন হয়ে থাকে।
- ঝ. বাংলাদেশের সব জেলাই এর চাষ করা যায়।

মাটি : দোআঁশ মাটি বিলাসি মুখী কচু চাষের জন্য উপযোগী।

রোপণ সময় : ফেব্রুয়ারি-মে মাস পর্যন্ত।

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭৫ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪৫ সেন্টিমিটার।

বীজের হার : ৪৫০-৬০০ কেজি/হেক্টর, ১৫-২০ গ্রাম ওজনের মুখীর ছড়া।

সার প্রয়োগ : নিম্নলিখিত পরিমাণে সার দেওয়া যায়।

সারের নাম	প্রতি হেক্টরে সারের পরিমাণ
গোবর/আবর্জনা পচা সার	১০-১২ টন
ইউরিয়া	১২০ ১৫০ কেজি
টিএসপি	১১৫-১২৫ কেজি
এমপি	১৪০-১৬৫ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : গোবর, টিএসপি এবং এমপি রোপণের সময় এবং ইউরিয়া সার ২-৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়।

১১.৩.৩. কৃষ্ণ কচু

বপনের সময় : এপ্রিল ও মে মাস।

মাটি : জৈব উপাদান (জীবজন্তুর পচা মল, কম্পোস্ট ইত্যাদি) সমৃদ্ধ বেলে মাটি।

দূরত্ব : প্রতি ঢিপিতে ১টি চারা ঢিপি থেকে ঢিপি ১-২ ফুট।

মূল রোপনের গভীরতা : ২ -৩ ইঞ্চি

অঙ্কুরিত হতে সময় লাগে : ৫-৭ দিন।

লাগানোর নিয়ম : প্রতি ঢিবিতে কাটা মূলের একটি টুকরো রোপণ করতে হয়। গোড়ায় জমা পানি ভালোভাবে বের করে দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বছরে চার-পাঁচবার গোড়ার কাছে মাটি দিতে হয়। যে কোনো পচা কাণ্ড ফেলে দেওয়া উচিৎ।

ফসল তোলা : পাতা ও কাণ্ড দুটিই সংগ্রহ করতে হয়। এর পাতা ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের খুবই ভালো উৎস। বছরের পর বছর এর উৎপাদন পাওয়া যায়।

১১.৩.৪. মানকচু

মানকচু (Coco-yam) বাংলাদেশের প্রধান এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Colocasia indica. macea.* এটি *Aracea* গোত্রের অন্তর্গত। মানকচু একটি পুষ্টিকর সবজি। এর কন্দ, পাতা, পাতার বোঁটা ইত্যাদি সকল অংশই সবজিরূপে ব্যবহৃত হয়। গ্রাম ও শহর এ উভয় স্থানের বহু গৃহের আঙিনায় দু' চারটি মানকচু গাছ দেখতে পাওয়া যায়। মানকচুসহ বিভিন্ন প্রকারের কচু উৎপাদনের ক্রমানুসারে উল্লেখযোগ্য জেলাসমূহের সিলেট, খুলনা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বরিশাল ও ফরিদপুর।

১১.৩.৪.১. মানকচু উৎপাদন পদ্ধতি

মানকচুর একটি চোখবিশিষ্ট খণ্ড রোপণ করা হয়ে থাকে। জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করা উচিত সাধারণত মে-জুলাই মাসের মধ্যে বীজতলায় বা খড়ের মধ্যে রেখে মুখী গজিয়ে নিতে হয় চারা সারিতে ভেলি বেঁধে লাগানো যেতে পারে। রোপণের সময় পাতা ও মূল কেটে দিলে চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গোবর সার ও খৈল জমি তৈরির সময় টিএসপি চারা রোপণের পূর্বে এবং ইউরিয়া ও মিউরিট অব পটাশ রোপণের ২ মাস অন্তর দু কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। মাঝে মাঝে চারপাশের মাটি কোদাল দিয়ে কেটে গোড়ায় বেঁধে দিতে হয়। কন্দ অপেক্ষা পাতা বৃদ্ধিশীল। কিছু কিছু ঝুরিমূল (stilt root) কেটে দেয়া যেতে পারে। পার্শ্ব চারা কেটে দিলেও কন্দের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।

শস্য সংগ্রহ : সাধারণত এক বছর পরে শীতকালে শস্য সংগ্রহ করা হয়। মানকচু দু'তিন বৎসর পর্যন্ত মাটিতে থাকলে বড় আকার ধারণ করে। এরূপ মানকচুর ১.২-১.৫ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫-২০ কেজি ওজনের হতে পারে। যদি প্রতি বছর প্রতি তিনটি মানকচুর মধ্যে একটি মানকচু উঠিয়ে শূন্য স্থানটি নুতন মুখী রোপণ দ্বারা পূর্ণ করা হয়,

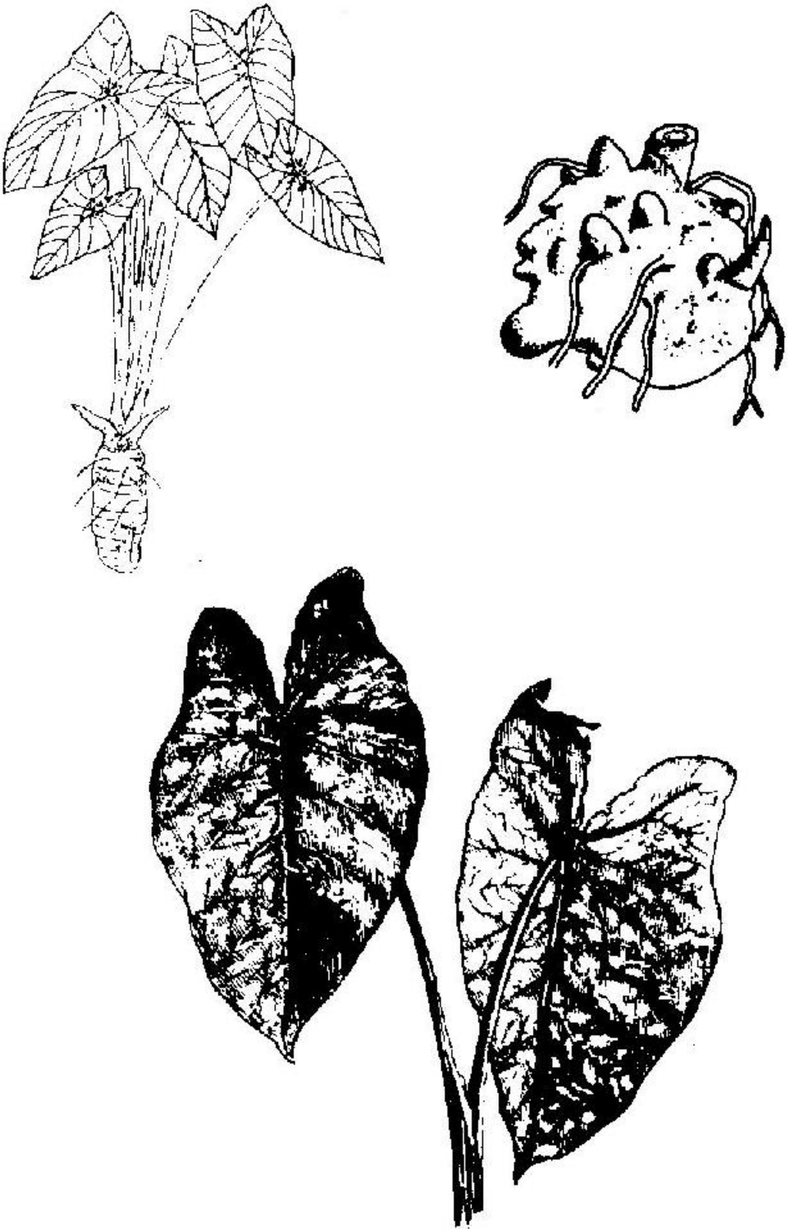

চিত্র ১১. ৩ : বিভিন্ন প্রকার কচু : পানি কচু (উপরে বামে), ওলকচু (উপরে ডানে) ও কৃষ্ণকচু (নিচে)

তবে এটির চাষও বহুকাল স্থায়ী হতে পারে। প্রতি বৎসর ফসল সংগ্রহের পর অন্তত একবার সার প্রয়োগ করা উচিত।

১১.৩.৫. ওলকচু

ওলের জন্য গভীর, হালকা ও বেলে দোআঁশ মাটি আবশ্যকীয়। জমি উঁচু হওয়া এবং স্যাঁতসাঁতে না হওয়া ভালো। জানুয়ারি মাস ওলের মুখী রোপণের উপযুক্ত সময়। এর প্রায় এক মাস পূর্বেই জমি উত্তমরূপে চাষ করে তৈরি করা হয় মে-জুন মাসেও ওল রোপণ করা হয়। ওলকচুর মুখী ৭৫×৭৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করতে হয়: চারা গজানোর পূর্ব পর্যন্ত পানি সেচ দিতে হয়। রোপণের প্রায় ছয় মাস পর হতেই ওলকচু আহারের উপযোগী হয়। তবে আগস্ট মাসের পূর্বে ওল না খাওয়া ভালো: শীতকালে গাছ মরে যায় এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গোড়ায় নূতন চারা গজালে সে চারা রোপণ করা যেতে পারে। সাধারণত এক বছর হতে দু বছর বয়স পর্যন্ত ওল জমিতে রেখে খাওয়া হয়। ওলের ফলন হেক্টর প্রতি ১০-১৭ টন।

১১.৩.৬. পঞ্চমুখী কচু

পঞ্চমুখী কচু বেশ কোমল ও স্বাদযুক্ত। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে কটি শাঁসযুক্ত মুখীকে খড়ের মধ্যে রেখে ১৫-১৬ দিন পর ৩০-৪৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করতে হয়। ফসল সংগ্রহ অন্তবর্তীকালীন যত্ন, সারের পরিমাণ, কন্দ সংগ্রহ প্রভৃতি মুখীকচুর অনুরূপ। নভেম্বর-মার্চ মাস পর্যন্ত কন্দ সংগ্রহ করা হয়:

১১.৩.৭. গাছ আলু বা ইয়াম

ইয়াম বাংলাদেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত: দেশের এলাকাভেদে এগুলোর নামও ভিন্ন। যেমন, গাছ আলু, মাছ আলু, পেস্তা আলু, সাদা পেস্তা, গচি আলু, গেছো আলু, মধু আলু, মৌ আলু, টৈকাই আলু, বরই আলু, পোড়া আলু, বেল আলু ইত্যাদি:

১১.৩.৭.১. গাছ আলুর বৈজ্ঞানিক পরিচিতি

বৈজ্ঞানিক নাম	বৈশিষ্ট্য
Dioscorea dlata	লতা ডান দিকে উঠে। পাতার অক্ষে আলু উৎপাদিত হয় আলু সাধারণত একক কন্দবিশিষ্ট পাতা বিপরীত
Dioscorea esculenta	লতা চিকন ও কাঁটাযুক্ত কম দিকে উঠে। পাতা একান্তর। আলু গুচ্ছাকারে হয়।
dioscorea bulbifera	পাতা বড় ও একান্তর। কাণ্ড গোলাকার ও মসৃণ। আলু বড়। গোলাকার ও মসৃণ। মাটির নিচের আলু ছোট।
Dioscorea dumetorum	লতা চিকন, বাম দিকে উঠে। পাতা ত্রিপত্রক ধরনের। পাতার অক্ষে অনেক সংখ্যক কন্দ উৎপাদিত হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

শিমজাতীয় সবজি

১২.০. শিমজাতীয় সবজি

বাংলাদেশের নিম্নলিখিত শিমজাতীয় সবজি চাষ করা হয়ে থাকে।

১২.১. শিম

শিম বাংলাদেশের জনপ্রিয় প্রোটিন সমৃদ্ধ সবজি। শিমজাতীয় সবজির মধ্যে শিম, বরবটি, মটরশুঁটি ফ্রেঞ্চ মটর, বুশ মটর, মাঠ মটর, মাখন মটর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য

১২.১.১. শিম চাষে মাটি ও জলবায়ু

পানি নিকাশের সুবিধাযুক্ত দোঁআশ, এঁটেল দোঁআশ, বেলে দোঁআশ সব রকম মাটিতে শিম জন্মানো যায়। তবে দোঁআশ ও বেলে মাটিতেই এর উৎপাদন ভালো হয়। শিম ঠাণ্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়া ফলন ভালো দিয়ে থাকে। তাই শীত মৌসুমে এর ফলন ভালো পাওয়া যায়।

১২.১.২. শিমের জাত

শিমের বিভিন্ন জাত এবং জাতের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

১২.১.২.১. বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত শিমের জাত

(১) বারিশিম ১

নির্বাচনের মাধ্যমে উফশি জাতটি বারিশিম ১ নামে ১৯৯৬ সালে অবমুক্ত করা হয়। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ–

ক. শিম সবুজ বর্ণের ; প্রতিটি শিম লম্বায় ১১ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ২.০-২.৫ সেন্টিমিটার হয়।

খ. পডের ওজন ১০-১১ গ্রাম। প্রতিটি শিমে ৪-৫টি বীজ হয়।

গ. প্রতিটি গাছে ৪৫০-৫০০টি শিম ধরে। পাকার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নরম থাকে এবং খেতে নরম ও সুস্বাদু।

ঘ. অনেক বার শিম সংগ্রহ করা যায়।

ঙ. মাঝারি আগাম জাত।

চ. এই জাতিটির জীবনকাল ২০০-২২০ দিন।

ছ. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২২ টন পর্যন্ত।

জ. জাতটি ভাইরাস প্রতিরোধী।

ঝ. বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এই জাতটির চাষের উপযোগী।

ঞ. শিম কাঁচা অবস্থায় এবং পরিপক্ব বীজ সবজি হিসেবে খাওয়া যায়।

(২) বারিশিম ২

নির্বাচনের মাধ্যমে এই আগাম জাতটি ১৯৯৬ সালে অবমুক্ত করা হয়।

ক. শিম সবুজ বর্ণের

খ. প্রতিটি শিম ১০.০-১০.০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১.৫ সেন্টিমিটার প্রস্থ

গ. পডের ওজন ৭-৮ গ্রাম প্রতিটি শিমে ৪-৫টি বীজ থাকে।

ঘ. প্রতিগাছে ৩৮০-৪০০ টি শিম ধরে।

ঙ. পাকার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নরম থাকে।

চ. খেতে নরম ও সুস্বাদু।

ছ. অনেক বার শিম সংগ্রহ করা যায়।

জ. শিম সরু ও লম্বাটে।

ঝ. আগাম জাত।

ঞ. জীবনকাল ১৯০-২১০ দিন।

ট. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করে হেক্টর প্রতি ফলন ১১-১২ টন পাওয়া যায়।

ঠ. এই জাতটি ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী।

ড. বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এই জাতটি চাষ করা যায়।

ঢ. জাতটি আগাম বিধায় এর চাষাবাদ অত্যন্ত লাভজনক।

ণ. শিম কচি অবস্থায় এবং পরিপক্ব বীজ সবজি হিসেবে খাওয়া যায়।

১২.১.৩. শিম উৎপাদন পদ্ধতি

বপনের সময় : মধ্য জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত।

বীজ বপন : পারিবারিক বাগানে চাষে ৯০ সেন্টিমিটার চওড়া ও ৭৫ সেন্টিমিটার গভীর করে ২-৩ টি মাদা তৈরি করে নিয়ে মাদা প্রতি ৪-৫টি বীজ বুনলেই চলে. মাঠে চাষের জন্য ২ মিটার চওড়া বীজতলা তৈরি করে নিয়ে ২-৩ সেন্টিমিটার দূরত্বে একইভাবে তৈরি মাদায় বীজ বপন করতে হয়। চারা গজালে মাদাপ্রতি ১-২টি সবল চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হয়।

বীজের হার : হেক্টর প্রতি ৫-৭ কেজি।

সারের মাত্রা ও সার প্রয়োগ : মাদা তৈরির সময় প্রতি মাদায় ১০ কেজি গোবর, ২০০ গ্রাম খৈল ও ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২ কেজি ছাই প্রয়োগ করতে হয়। চারা গজালে ২-৩ পরপর দু'কিস্তিতে ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা : বীজ বপনকালে গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়।

১২.২. বরবটি

১২.২.১. বরবটির জাত

ক. কেগর নাটকী

খ. ইয়ার্ড লং
গ. পুষা বর্ষাতি
ঘ. পুষা ফাল্গুনী।

জাতের বৈশিষ্ট্য : কেগর নাটকী জাতের বরবটির গাছ দু'তিন মিটার পর্যন্ত উপরের দিকে লতিয়ে উঠতে পারে। উপরদিকে ওঠার সময় গাছ বাউনির সাথে পেঁচিয়ে ওঠে। পাতা গাঢ় সবুজ, ফুল বেগুনি আভাযুক্ত সাদা। শুঁটি সবুজ এবং সামান্য বক্র। শুঁটি লম্বায় ৬০-৭৫ সেন্টিমিটার হয়। এক সাথে ২-৩টি শুঁটি হয় এবং গাছ প্রতি ১৬-৩০টি শুঁটি হয়ে থাকে।

১২.২.২. মাটি

অনেক ধরনের মাটিতে বরবটি চাষ করা যায়। তবে দোঁআশ এবং বেলে দোঁআশ মাটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

১২.২.৩. উৎপাদন পদ্ধতি

আইলের আকার : দৈর্ঘ্য-২২ মিটার, প্রস্থ-৪৫ সেন্টিমিটার

আইল নির্ধারণ : আইল উঁচু অথবা মাঝারি উঁচু এবং চওড়া আইল। পানিতে ডুবে না এবং স্যাঁতসেঁতে থাকে না এমন আইল নির্বাচন করতে হয়।

আইল তৈরি : পুরাতন আইলের ক্ষেত্রে কোদাল দিয়ে আইল কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট দূরত্বে মাদা তৈরি করতে হয়। তবে নতুন করে উঁচু করা আইল সম্পূর্ণ না কুপিয়ে শুধু গর্ত প্রস্তুত করলেই চলে।

সারের পরিমাণ এবং প্রয়োগ : আইল প্রতি নিচে উল্লেখিত হারে সার প্রয়োগ করা দরকার

সারের নাম	হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ
গোবর/কম্পোস্ট	১০ কেজি
ইউরিয়া	৫০ গ্রাম
টিএস পি	১০০ গ্রাম
এমপি	২০০ গ্রাম।

সারের ব্যবহারের নিয়ম : সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমপি সার আইল তৈরির সময় আইলের মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয় অথবা মাদায় প্রয়োগ করতে হয়

সারের উপরিপ্রয়োগ

সার ব্যবহারের সময়	সারের নাম ও পরিমাণ	
	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)
১ম উপরি প্রয়োগ : বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর	১০০	৫০
২য় উপরি প্রয়োগ : বীজ গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর	১০০	৫০

আইলের মাঝখানে খুঁটি দিয়ে লম্বালম্বি করে লাইন টেনে সেখানে সার দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয় অথবা গাছের চতুর্দিকে গোল করে খুড়ে নিয়ে তাতে সার প্রয়োগ করতে হয়।

বীজ বপনের হার : প্রতি আইলে ৩৫-৪০ গ্রাম।

বীজ বপনের সময় : ফেব্রুয়ারি-জুলাই মাস। তবে মার্চ-এপ্রিল মাস বীজ বপনের উপযোগী সময়।

অঙ্কুরোদগম সময় কাল : ৩-৫ দিন।

দূরত্ব : এক গাছ থেকে আরেক গাছের দূরত্ব ২০ সেন্টিমিটার। আইলে এক সারি পদ্ধতিতে বরবটি চাষ করা হয়। তবে আইল অধিক চওড়া হলে দুই সারি পদ্ধতিতে চাষ করা যায়।

বীজ বপনের গভীরতা : ২০ সেন্টিমিটার।

বীজ বপন : নির্ধারিত দূরত্বে মাদা তৈরি করে প্রতি মাদায় ২-৩টি করে বীজ বপন করতে হয়। বপনের পূর্বে বীজ ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে সহজে অঙ্কুরোদগম হয়ে থাকে।

মালচিং : রবি মৌসুমে আর্দ্রতা সংরক্ষণ আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য খড়কুটা, লতাপাতা অথবা শুকনো কচুরিপানা ইত্যাদি দিয়ে মালচিং করলে ভালো হয়।

চারা পাতলাকরণ ও শূন্যস্থান পূরণ : প্রতি মাদায় সর্বোচ্চ ২টি চারা রাখাই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং চারা ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট হলে ২টি সুস্থ-সবল চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হয়। প্রয়োজনে শূন্যস্থান পূরণ করতে হয়।

আগাছা দমন : চারা গজানোর পর থেকেই হাতের সাহায্যে ছোট ছোট আগাছা উঠিয়ে ফেলতে হয়। বীজ বপনের ২০-৩০ দিন পর্যন্ত কোনো আগাছা জমিতে থাকতে দেয়া যাবে না।

মাটি আলগাকরণ : আগাছা নিড়ানির সময় আইলের মাটি নিড়ানি দিয়ে ভালোভাবে ঝুরঝুরে করে দিতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় যেন মাটি আলগাকরণের সময় গাছের শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। সার প্রয়োগের পর মাটি আলগাকরণের কাজ করলে ভালো হয়।

গাছের গোড়ায় মাটি দেয়া : আগাছা দমন ও সারের উপরি-প্রয়োগের সময় গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হয়।

খুঁটি দেয়া : গাছ লতাতে শুরু করলে যাতে ভালোভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে সে জন্য ২০-২৫ সেন্টিমিটার লম্বা হলেই বাঁশ বা বাঁশের কঞ্চি অথবা কাঠি দিয়ে খুঁটি দিতে হয়।

জাবপোকা দমন : জাবপোকা দলবদ্ধভাবে গাছের কচি পাতা ও ডগা, ফুল ও ফলের বোঁটা এবং ফলের রস চুষে খেয়ে ক্ষতি করে। আক্রমণের ফলে গাছ দুর্বল হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছ ফুল দিতে পারে না। অনেক সময় ফুলের কুঁড়ি ও কচি ফল ঝরে পড়ে। জাবপোকা মোজাইক ভাইরাসের বাহক হিসেবে কাজ করে।

বিছাপোকা : বিছাপোকা বরবটি গাছের পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ক্ষতি করে থাকে। আক্রমণের ফলে পাতার শিরাগুলো শুধু থেকে যায়, গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফলন কম হয়।

শিমের মাছি : শিমের মাছি আক্রমণের ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়, গাছ হলুদ রঙের হয়ে পড়ে। মাটির সামান্য উপরে গাছের কাণ্ড মোটা হয়ে যায়। গাছ লম্বালম্বি কাটলে কাণ্ডের ভিতর শূককীট অথবা মূককীট দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ মরে যায়।

থ্রিপস : এ পোকা পূর্ণাঙ্গ এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় জাবপোকার মতো গাছের কচি পাতার রস চুষে খেয়ে গাছের ক্ষতি করে। আক্রমণের ফলে ফুল ঝরে যায়।

ফলের মাজরা পোকা : পোকার কীড়া বরবটি গাছের কাণ্ড, মুকুল এবং ফল ছিদ্র করে নষ্ট করে দেয়। কীড়া আক্রান্ত ফলের বীজ ও শাঁস খেয়ে ক্ষতি করে। আক্রান্ত ফল খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে।

নেতিয়ে পড়া রোগ দমন : বীজ বপনের পর থেকে চারা অবস্থায় এ রোগের আক্রমণ হয়। এ রোগের আক্রমণে আক্রান্ত বীজ পচে যায়। চারার গোড়া চিকন, লিকলিকে হয়ে ধ্বসে পড়ে ও গাছ মারা যায়।

পাউডারি মিলডিউ : এ রোগ হলে পাতা ও গাছের গায়ে সাদা পাউডারের মতো আবরণ দেখা যায়। আক্রমণের মাত্রা খুব বেশি হলে গাছ সবুজ হয়ে মারা যায়।

হলুদ মোজাইক : পাতায় হলদে সবুজের নকশা দেখা যায়। পরে ধীরে ধীরে পাতা হলদে হয়ে যায়, পাতার আকারের বিকৃতি ঘটে এবং আয়তনে ছোট হয়। আক্রান্ত গাছগুলোর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফলে গাছ ছোট হয়, ফল কম ধরে এবং শুটিতে বীজের সংখ্যা কম থাকে।

অ্যানথ্রাকনোজ : রোগের জীবাণু প্রথমে পাতায় আক্রমণ করে। পাতায় বিভিন্ন আকারের দাগ পড়ে, স্বাভাবিক অবস্থায় পাতার ক্ষতি হয় সীমিত। পাতা থেকে ফলে আক্রমণ হয়। কচি অবস্থায় আক্রমণ হলে গোটা ফলটির ক্ষতি হতে পারে। আক্রমণ দেরিতে হলে ফল ছোট হয় এবং পঁচে যায়।

শিকড় পচা বা গোড়া পচা : এ রোগ চারা অবস্থা থেকে গাছের পরিণত অবস্থা পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। এই রোগের আক্রমণে আক্রান্ত চারা গাছের মাটির সংলগ্ন অংশ পচে যায়। পরিণত গাছের মাটির সংলগ্ন অংশ কালো বা গাঢ় বাদামি রঙ ধারণ করে।

ফসল সংগ্রহ সময় : বীজ বপনের ৪০-৫০ দিনের মধ্যেই বরবটি সংগ্রহ শুরু করা যায়। কচি বরবটি খুব সাবধানে হাত দ্বারা অথবা ধারালো ছোট খুর বা কাঁচি দিয়ে বোটাসহ কেটে সংগ্রহ করতে হয়। ফল ধরার ৪-৫ দিনের মধ্যেই বরবটি সংগ্রহ করলে উপযোগী হয়।

ফলন : প্রতি আইলে ২০-২৫ কেজি।

১২.৩. মটরশুঁটি

মটরশুঁটি একটি পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ, সুস্বাদু শীতকালীন সবজি। বিশেষভাবে শহর অঞ্চলে এ সবজির জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১২.৩.১. মটরশুঁটির জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত মটর শুটির জাতসমূহের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

(১) **বারি মটরশুঁটি ১ :** এ জাতটি বাছাইকরণ পদ্ধতিতে ১৯৯৬ সালে অবমুক্ত হয়। এ জাতের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

ক. এ জাতটি উচ্চ ফলনশীল।
খ. রোগবালাই প্রতিরোধী।
গ. পরিপুষ্ট শুঁটি সবজি হিসেবে সমাদৃত।
ঘ. খাটো জাত।
ঙ. গাছে সাদা রঙের ফুলসহ সবুজ রঙের শুঁটি ধরে।
চ. প্রতি শুঁটিতে ৪-৭টি সবুজ বীজ থাকে।
ছ. শুঁটি মিষ্টি, সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর।
জ. গাছ প্রতি ২০-২৫টি শুঁটি ধরে।
ঝ. পরিপক্ক শুকনা বীজ কুচকানো এবং বাদামি রঙের হয়।
ঞ. দিনের মধ্যে সবুজ শুঁটি উত্তোলন করা যায়।
ট. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতিফলন ১০-১২ টন সবুজ শুঁটি উৎপন্ন হয়।
ঠ. এ জাতটি ডাউনি মিলডিউ ও পাউডারি মিলডিউ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।
ড. তেমন কোনো পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয় না।
ঢ. মটরশুঁটি একটি প্রোটিনসমৃদ্ধ, সুস্বাদু শীতকালীন সবজি। সাধারণত সালাদ, ভাজি এবং তরকারিতে এই সবজি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(২) **বারি মটরশুঁটি-২ :** এশিয়া সবজি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের সহযোগিতায় প্রাপ্ত এ জাতটি বাছাইকরণ পদ্ধতিতে ১৯৯৬ সালে উদ্ভাবন করা হয়

ক. মটরশুঁটি হালকা সবুজ রঙের চ্যাপ্টা আকৃতির।
খ. শুঁটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৮ ও ২ সেন্টিমিটার। অপরিপক্ক বীজসহ আস্ত শুঁটি সালাদ হিসেবে অথবা সিদ্ধ করে খাওয়া যায়।
গ. এই মটরশুঁটি নরম, মিষ্টি, প্রটিনসমৃদ্ধ এবং সুস্বাদু।
ঘ. অপরিপক্ক বীজসহ সবুজ শুঁটি দেশী শিমের মতো সম্পূর্ণ ভক্ষণযোগ্য।
ঙ. পরিপক্ক শুকনা বীজ গোলাকার পুষ্ট সবুজাভ রঙের।
চ. দিনের মধ্যে সবুজ শুঁটি সংগ্রহ করা যায়।
ছ. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন প্রতি হেক্টরে ১২-১৪ টন পাওয়া যায়।
জ. জাতটি পাউডারি মিলডিউ ও ডাউনি মিলডিউ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।
ঝ. এটি দ্রুত বর্ধনশীল ও একটি পুষ্টিকর সবজি।

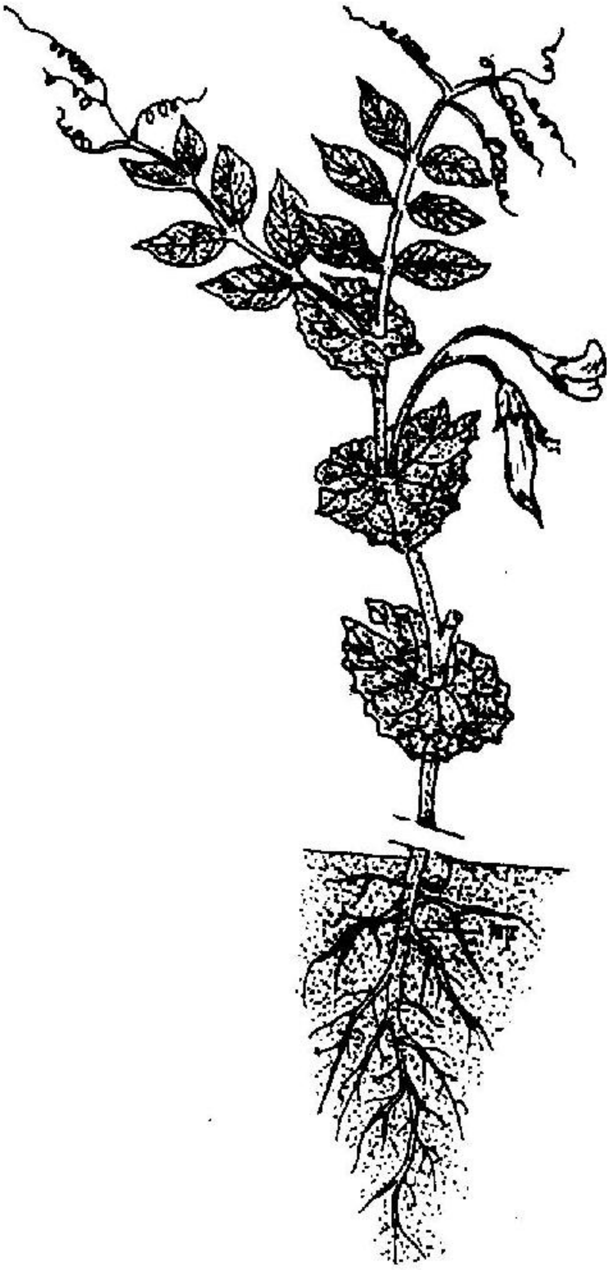

চিত্র ১২.১ : পূর্ণাঙ্গ মটরশুঁটি গাছ

ঙ. খোসা ও বীজ উভয়ই খাওয়া যায়।

চ. পরিপক্ব শুকনা বীজ দেশী মটরশুটি বীজের মতো খাওয়া যায়।

১২.৪. বারি ঝাড়শিম ১ (ফরাসী শিম)

বাংলাদেশে ফরাসি শিমের উদ্ভাবিত কোনো জাত নেই। এই শিম চট্টগ্রাম, সিলেট, অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ জাতটি ১৯৯৬ সালে 'বারি ঝাড়শিম ১' নামে উদ্ভাবন করা হয়।

(১) গাছ খাটো আকৃতির, ঝোপালো।

(২) শিম সবুজ রঙের তবে কিছুটা বাকা, ১০-১৩ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১.০-১.৫ সেন্টিমিটার চওড়া হয়।

(৩) প্রতি শিমের ওজন ৫-৬ গ্রাম।

(৪) এ জাতটির ফুল সাদা থোকায় থোকায় সবুজ শিম ধরে।

(৫) বীজ 'মুড়ির' মত সাদা রঙের।

(৬) মাচা বা বাউনি ছাড়া ঘন করে গাছ লাগিয়ে চাষ করা যায়।

(৭) উঁচু ফলনশীল, কিছুটা ভাইরাস প্রতিরোধী দ্রুত বর্ধনশীল সবজি।

(৮) বীজ বপন থেকে ফুল উত্তোলন সময় পর্যন্ত প্রায় ৫০-৬০ দিন লাগে।

(৯) উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি সবুজ শিমের ফলন ১৩-১৪ টন।

(১০) বাংলাদেশে শীত মৌসুমে দেশের সর্বত্র চাষাবাদযোগ্য। গাছ খাটো হওয়ায় মাচা বা বাউনি দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

(১১) বাংলাদেশে বর্তমানে সীমিত আকারে চাষ হলেও আস্তে আস্তে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জলবায়ু ও মাটি : বাংলাদেশে শীত মৌসুমে ঝাড়শিম ভালো হয়। উর্বর দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটিতে এর চাষাবাদ ভালো হয়

বপন পদ্ধতি : সরাসরি বীজতলায় বা জমিতে ১৫ সেমি. দূরত্বে লাইন করে বীজ বপন করতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি. রাখতে হয়।

সারের মাত্রা ও সার প্রয়োগ : ঝাড় শিমের জন্য হেক্টর প্রতি ১০-১৫ টন গোবর, ৫০ কেজি ইউরিয়া, ১৫০ কেজি টিএসপি এবং ১৫০ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করতে হয়। জমি তৈরির সময় সব গোবর, টিএসপি, এমপি এবং অর্ধেক ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হয়। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বপনের ৩০ দিন পরে উপরিপ্রয়োগ করতে হয়

বীজের হার : ৫-৬ কেজি/হেক্টর।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা : ফসলের নিবিড় যত্ন যেমন– সঠিকভাবে সার প্রয়োগ, আগাছা দমন, পানি সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে হয়

শিমের কাণ্ড মাছি : এ মাছির কীড়া গাছের যে নরম অংশে ছিদ্র করে ঢোকে এবং সে অংশটুকু খেয়ে নষ্ট করে দেয়।

রোগ দমন

এনথ্রাকনোজ রোগ দমন : এ রোগের আক্রমণের ফলে গাছের পাতা, কাণ্ড ও শিমে প্রথমে বাদামি রং এর পঁচা ক্ষত দেখা যায়। পরে তা বেড়ে গিয়ে গাছ ও ফল নষ্ট করে দেয়।

হলুদ মোজাইক ভাইরাস : এ রোগের ভাইরাস পাতা আক্রমণ করে। পাতায় হলুদ রং এর মোজাইক দেখা যায়।

মরিচা রোগ : মরিচা রোগ প্রথমে শিম গাছের কাণ্ডে ও পাতায় দেখা দেয়। পাতার নীচে দিকে এ রোগ বেশি হয়। রোগের শুরুতে ছোট ছোট উঁচু ধরনের সাদাব এবং পরে লালচে বাদামি রঙ ধারণ করে। পাতা সম্পূর্ণ আক্রান্ত হলে বেঁকে যায় এবং প্রথমে হলদে ও পরে বাদামি হয়ে শুকিয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আক্রান্ত পাতা ঝরে পড়ে।

ফসল সংগ্রহ : জাত ভেদে বীজ বপনের ৫০-৬০ দিন পর থেকে ফসল সংগ্রহ শুরু করা যায়। সপ্তাহে দু'বার শিম তোলা যায়।

ফলন : প্রতি আইলে ৪০-৫০ কেজি।

১২.৫. ফেঞ্চ মটর (French bean)

বপনের সময় : সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

মাটির অবস্থা : মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব উপাদান (জীবজন্তুর পচা মল, কম্পোস্ট ইত্যাদি) মেশানো। বেড থেকে পানি নিষ্কাশনের জন্য ভালোভাবে নালা করতে হয়।

দূরত্ব : সারি থেকে সারি ১০ ইঞ্চি থেকে ১৮ ইঞ্চি এবং চারা থেকে চারা ৬ ইঞ্চি থেকে ৮ ইঞ্চি।

বীজ বপনের গভীরতা : ১ ইঞ্চি

গজাতে সময় লাগে : ৩-৫ দিন।

বপনের নিয়ম : সারি করে বীজ বপন করা যায়। অথবা ছিটিয়ে বীজ বোনা যায়।

যত্ন : বেশি ভেজা মাটি ফ্রেঞ্চবিন পছন্দ করে না। মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা দমনের জন্য বীজতলায় মালচ দেওয়া হয়।

ফসল তোলা : লাগানোর ১০ সপ্তাহ পরে ফরাস খাবার উপযোগী হয়ে যায়। ঘন ঘন পাড়া হলে বেশিদিন ধরে ফসল পাওয়া যাবে। বীজ সংগ্রহ করা সহজ।

১২.৬. বুশ মটর (Bush bean)

বপনের সময় : অক্টোবর থেকে নভেম্বর।

মাটির অবস্থা : বীজতলায় প্রচুর পরিমাণে জৈব উপাদান থাকতে হয়।

দূরত্ব : সারি থেকে সারি ১৮ ইঞ্চি – ২৪ ইঞ্চি এবং চারা থেকে চারা ৬ ইঞ্চি – ৮ ইঞ্চি।

বীজ বপনের গভীরতা : ১ ইঞ্চি।

গজাতে সময় লাগে : ৬-১০ দিন।

বপনের নিয়ম : তৈরি বেডে সরাসরি বপন করতে হয়। বীজ সারি করে অথবা ছিটিয়ে বীজ বোনা যায়।

যত্ন : ভালো বৃদ্ধির জন্য মাটি খুবই আর্দ্র থাকা দরকার। অনেক বাগানি বীজতলায় মালচে দিতে হয়। প্রয়োজন হলে ছোট খুঁটি গেড়ে চারাকে দাঁড়াতে সাহায্য করা যেতে পারে। বাগানের বেড়াতে বেশ ভালোভাবে মটর ফলানো যায়।

ফসল সংগ্রহ : লাগানোর ৭-৮ সপ্তাহ পরই কচি শুঁটি খাবার উপযুক্ত হয়ে যায়। চার মাস পর শুঁটি শুকিয়ে গেলে দানা সংরক্ষণ করতে হয়।

১২.৭. মাঠ মটর (Field bean)

বপনের সময় : মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত।

মাটির অবস্থা : উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জৈব উপাদান (কম্পোস্ট জীবজন্তুর পচা মল ইত্যাদি) মিশ্রিত যে কোনো ধরনের মাটি।

দূরত্ব : প্রতি ঢিবিতে ২-৩টি চারা বপন করতে হয়, ঢিবি থেকে ঢিবির দূরত্ব সাধারণত ২ ফুট রাখতে হয়।

বীজ বপনের গভীরতা : $\frac{১}{২}$-১ ইঞ্চি।

গজাতে সময় লাগে : ৪-৫ দিন।

বপনের নিয়ম : প্রতি ঢিবিতে চার-পাঁচটি বীজ বপন করতে হয়। পরে সবচেয়ে সবল ২-৩নটি চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হয়। বীজ সারিতেও বপন করা যায় (চারা থেকে চারা ৬ ইঞ্চি; সারি থেকে সারি ২-৩ ফুট) অথবা বীজতলার উপর ছিটিয়ে বোনা যায়।

যত্ন : লতা বিস্তারের জন্য দীর্ঘ ডালপালা কিংবা মাচার ব্যবস্থা করে দিতে হয়। কচি শিমে ছোট কীট-পতঙ্গের আক্রমণ হচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রয়োজন হলে ছাই ব্যবহার করতে হয়।

ফসল সংগ্রহ : বপনের ৫-৮ সপ্তাহ মধ্যেই কচি শুঁটি খাবার উপযোগী হয়। সবুজ পাতা বরবটি খেতে খুবই ভালো এবং ভিটামিন ও খনিজ উপাদান সমৃদ্ধ বীজ সহজে সংগ্রহ করা হয়।

১২.৮. মাখন শিম (Sward bean)

বপনের সময় : জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

মাটির অবস্থা : জৈব উপাদান (কম্পোস্ট, জীবজন্তুর পচা মল ইত্যাদি) মিশ্রিত যে কোনো ধরনের মাটি।

দূরত্ব : প্রতিটি ঢিবিতে ১-২টি চারা বপন করতে হয় এবং ঢিবি থেকে ঢিবির দূরত্ব ৪-৬ ফুট রাখতে হয়।

বীজ বপনের গভীরতা : ১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

বীজ গজাতে সময় লাগে : ৩-৭ দিন।

ফসল সংগ্রহ : **ফসল সংগ্রহ :** লাগানোর ৫-৬ মাস পরই শিম সংগ্রহ করা যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পেঁপে, ঢেঁড়শ ও সজনা

১৩.১. পেঁপে

১৩.১.১. পেঁপের জাত

১) ব্লুস্টেম
২) কাশিমপুরি
৩) যশোরী
৪) রাচী
৫) নউন ইউ
৬) হানি ডিউ
৭) ছোট পেঁপে
৮) শাহী পেঁপে
৯) শঙ্কর জাত

১৩.১.২. মাটি

দোঁআশ ও বেলে দোঁআশ মাটি পেঁপে চাষের জন্য উত্তম।

১৩.১.৩. পেঁপে উৎপাদন পদ্ধতি

আইলের আকার : দৈর্ঘ্য-২২ মিটার ও প্রস্থ : ৪৫ সেন্টিমিটার

আইল নির্বাচন : পর্যাপ্ত সূর্যালোক সমৃদ্ধ, উঁচু, চওড়া আইল পেঁপে চাষের জন্য নির্বাচন করতে হয়

আইল তৈরি : আইলের আগাছা ভালোভাবে পরিষ্কার করার পর নির্দিষ্ট দূরত্বে মাদা তৈরি জমির চার কোনায় উঁচু জায়গা তৈরি করে অথবা আইলে উঁচু জায়গা তৈরি করে পেঁপে চাষ করা যায়।

সারের পরিমাণ এবং প্রয়োগ : মাদা প্রতি সারের পরিমাণ নিচে উল্লেখ করা হলো।

সার প্রয়োগের সময়	সারের নাম ও পরিমাণ				
	গোবর (কেজি)	খৈল (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)
আইল তৈরির সময় বীজ বপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	৩ কেজি	৫০ গ্রাম	-	৫০ গ্রাম	১৫
১ম উপরিপ্রয়োগ চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর	-	-	১০	-	-
২য় উপরিপ্রয়োগ চারা গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর	-	৫০	১০	-	৫
৩য় উপরিপ্রয়োগ : চারা রোপণের ৬০-৬৫ দিন পর	-	-	১০	-	৫

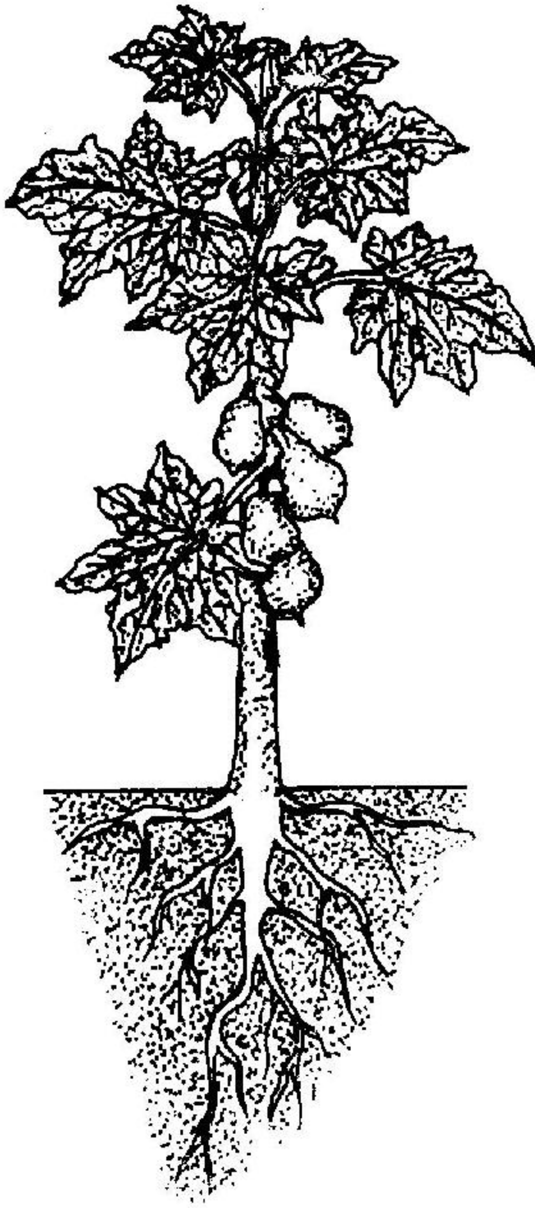

চিত্র ১৩.১ : পূর্ণাঙ্গ পেঁপে গাছ

চারা রোপণের দূরত্ব : মাদা থেকে মাদার দূরত্ব ২ মিটার।

মাদার আকার : ৩০x৩০x৩০ সেন্টিমিটার

উঁচু জায়গার আকার ৪৫x৪৫x৪৫x সেন্টিমিটার।

চারার পরিমাণ : প্রতি মাদায় ৩টি চারা ত্রিভুজাকারে রোপণ করতে হয়। তাহলে আইল প্রতি ৩৬টি চারা লাগাতে হয়।

চারা রোপণের সময় : মার্চ-এপ্রিল মাস পেপের চারা রোপনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। তবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসেও পেপের চারা রোপন করা যায়।

আগাছা পরিষ্কার : আইলে আগাছা দেখা দিলে সাথে সাথে তুলে ফেলতে হয়।

সারের উপরিপ্রয়োগ : সময়মতো সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হয়

সেচ প্রদান : শীতকালে প্রতি ১০-১২ দিন এবং গ্রীষ্মকালে ৬-৮ দিন পর পর সেচ দেয়া দরকার।

পুরুষ গাছ তুলে ফেলা এবং গাছ পাতলা করা : চারা রোপণের ২ মাসের মধ্যে পেঁপে গাছে ফুল আসা শুরু হয়। গাছে ফুল আসার সাথে সাথে প্রতি ১০-১৫টি স্ত্রী গাছের জন্য একটি মাত্র পুরুষ গাছ রেখে বাকি পুরুষ গাছগুলো তুলে ফেলতে হয়। প্রতি মাদায় উঁচু জায়গায় একটি করে স্ত্রী গাছ রাখতে হয়।

খুটি দেয়া : বেশি ফল ধরলে এবং ঝড়ের ক্ষতি থেকে গাছ রক্ষার জন্য বাঁশের খুটি পুতে দিতে হয়। গাছের কাণ্ডের সাথে রশি দিয়ে বেধে দিতে হয়। অবশ্য তরকারি হিসেবে ফল তুলতে থাকলে খুটি দেওয়ায় প্রয়োজন নাও হতে পারে।

কাণ্ড পচা রোগ : বীজে এ রোগ আক্রমণ করলে চারা গজাবার পূর্বেই বীজ পচে যায়। চারা গাছ আক্রান্ত হলে গাছের গোড়ায় বাদামি বর্ণের পানি ভেজা দাগের সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত চারা গাছ মরে যায় এবং ঢলে পড়ে। গাছের কাণ্ড আক্রান্ত হলে গাছের গোড়ায় পানি ভেজা নরম দাগের সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত অংশের আঁশ পচতে থাকে। আক্রান্ত গাছ সহজেই বাতাসে ভেঙে পড়ে।

মোজাইক রোগ : আক্রান্ত গাছের পাতায় সবুজ ও হলুদ রঙের দাগ দেখা যায়। পাতা খর্বাকৃতির হয়। অনেক সময় কচি পাতা সম্পূর্ণ কুঁকড়ে যায়।

পাতা কোঁকড়ানো রোগ : এ রোগের আক্রমণের ফলে পাতা কুঁকড়ে যায়। পাতার শিরাগুলো অপেক্ষাকৃত মোটা হয়। আক্রান্ত গাছ আকারে খুব ছোট হয়। ফলন খুব কম হয়। এ রোগের ভাইরাস সাদা মাছি দ্বারা আক্রান্ত গাছ থেকে সুস্থ গাছে ছড়ায়।

ফল সংগ্রহ : চারা রোপণের ৩ মাসের মধ্যেই পেঁপে গাছে ফুল ফল আসে। ফল ধরার ২-৩ মাসের মধ্যেই সবজি হিসাবে পেঁপে সংগ্রহ করা যায়।

ফলন : প্রতি আইলে ২০০-২২৫ কেজি

১৩.২. ঢেঁড়শ

বাংলাদেশে প্রায় ২-৩ হাজার হেক্টর জমিতে ঢেঁড়সের চাষ হয়। উৎপাদন ৭-৮ হাজার টন। কচি ঢেঁড়শ সিদ্ধ ও ভাজি করে এবং মাছ-মাংসের সাথে তরকারিতে ব্যবহৃত হয়

তুরস্কে কচি ঢেঁড়শ শুকিয়ে রাখা হয়। এদেশে ঢেঁড়শ উৎপাদনে বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, রংপুর ও কুষ্টিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

ঢেঁড়শ গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত ঋতুতে জন্মানো যায়। বীজ বপনের পর অল্প সময়ের মধ্যে ঢেঁড়শ সংগ্রহ শুরু করা যেতে পারে। ঢেঁড়শ গাছ একদিকে দীর্ঘ হতে থাকে, অপর দিকে পাতার কক্ষে একটি করে ঢেঁড়শ উৎপন্ন হতে থাকে।

১৩.২.১. ঢেঁড়শের উদ্ভিদতত্ত্ব

ঢেঁড়শের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Hibiscus esculentus*। Malvaceae গোত্রের অন্তর্গত। ইংল্যান্ডে Lady's Finger এবং আমেরিকায় Okra নামে পরিচিত। ঢেঁড়শ গাছ সাধারণত ১.২ থেকে ১.৮ মিটার উঁচু হয়ে থাকে এবং ১০ থেকে ২০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ হয়ে থাকে।

ঢেঁড়শ একটি পুষ্টিকর সবজি। ঢেঁড়সে ভিটামিন বি এবং সি ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ আয়োডিন বিভিন্ন পদার্থ রয়েছে। তবে খরিফ মৌসুমে চাষ করা অধিক লাভজনক।

১৩.২.২. ঢেঁড়শ চাষে জলবায়ু ও মাটি

দোঁআশ ও বেলে দোঁআশ মাটি ঢেঁড়শ চাষের উপযোগী। পানি নিষ্কাশনের সুবিধা থাকলে এঁটেল মাটিতেও এর চাষ করা যায়। ঢেঁড়শ উৎপাদনের জন্য উষ্ণ জলবায়ু প্রয়োজন। ইহা শুষ্ক এবং আর্দ্র উভয় অবস্থায় ভালো জন্মাতে পারে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় প্রায় সারা বছরই ঢেঁড়শ জন্মানো সম্ভব। তারা খরিফ মৌসুমেই এর ব্যাপক চাষাবাদ করা হয়।

১৩.২.১.১. বাংলাদেশে ঢেঁড়শের উন্নত জাত

বারি ঢেঁড়শ-১ : এ জাতটি ১৯৯৬ সালে অবমুক্ত করা হয়। বৈশিষ্টসমূহ নিম্নরূপ

ক. প্রায় সব পত্রকক্ষেই ফুল ও ফল ধরে।
খ. গাছ ২.০-২.৫ মিটার প্রায় লম্বা হয়।
গ. গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১০-১৫টি।
ঘ. ফল ২৫-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা।
ঙ. ফুল ফোটার ৫-৬ দিনের মধ্যেই ফল সংগ্রহ করতে হয়।
চ. পরবর্তীতে প্রতি ১ দিন অন্তর সংগ্রহ করা যায়।
ছ. হলুদ শিরা ভাইরাস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।
জ. পরিপক্ক বীজে বাদামি রোমশ আবরণ আছে।
ঝ. বীজের রঙ বাদামি
ঞ. বীজ বপন থেকে জীবনকাল প্রায় ৫ মাস।
ট. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ১৪-১৬ টন হয়।
ঠ. বাংলাদেশে সারা বছরই এ জাতের চাষ করা যায়।

চিত্র ১৩.২ : পূর্ণাঙ্গ ঢেঁড়শ গাছ

১৩.২.১.২. ঢেঁড়শের অন্যান্য জাত

ক. পেন্টাগ্রিন	ঘ. অনামিকা
খ. পুসা শাওনী	ঙ. পার্বনী কান্তি
গ. বর্ষাতি	চ. লাল ঢেঁড়শ

এছাড়া পুসা, সুলুকমাতি, টি ১, টি ২, টি ৩ ও টি ৪ জাত বিদ্যমান। বাংলাদেশের জাতের মধ্যে ok ০৯৮৫ লাইনটিতে মোজাইক ভাইরাস রোগ কম হয়।

১৩.২.৩. ঢেঁড়শ উৎপাদন পদ্ধতি

সচরাচর এপ্রিল-মে মাসে দু 'এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর বীজ বোনা হয়ে থাকে।

জমি তৈরি : ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়।

বীজ বপন : এক একটি স্থানে দুটি করে বীজ বপন করা উত্তম। তাতে চারা গজানোর পর দুর্বল চারাটি তুলে ফেলতে হয়। হেক্টরপ্রতি ২-৩ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। শীতকালে অথবা বসন্তকালে গজানো কাজ তরান্বিত করার জন্য বীজকে প্রায় ২৪ ঘন্টাকাল পানিতে ভিজিয়ে নিতে হয়। হেক্টরপ্রতি ৬-৭ হাজার গাছ রাখা যেতে পারে। বীজ রোপণ দূরত্ব ৫০×৫০ সেন্টিমিটার।

পানি সেচ : শুষ্ক ঋতুতে ঢেঁড়শের চাষ করলে বীজ বপনের পর থেকে নিয়মিত পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। গাছের বৃদ্ধি স্তিমিত হলে ঢেঁড়শের তরকারি দ্রুত শক্ত হয়ে যেতে পারে। নিয়মিত সেচ করা সম্ভব না হলে, খড়, ঘাস, কচুরিপানা, দিয়ে মাটি ঢেকে (মালচ) রাখতে হবে।

সার প্রয়োগ : চারা ২০-২৫ সেন্টিমিটার উঁচু হওয়ার পরে গাছের গোড়া থেকে ১২-১৫ সেন্টিমিটার দূরে বৃত্তাকারে খনন করে তাতে ইউরিয়া, ১০০-১২০ কেজি ট্রিপল সুপার ফসফেট ও ১০০-১২০ কেজি এমপি ব্যবহার করতে হয়।

পোকা দমন : এক প্রকারের শুয়াপোকা শুককীট কচি কাণ্ডে ছিদ্র করে ঢুকে পড়ে ও গাছের ক্ষতি সাধন করে। এর দমনের জন্য শতকরা ০.০২ ভাগ ডাইমেক্রন-১০০ বেশ কার্যকর। ব্যবহারের পরে অন্তত ১০ দিন পর্যন্ত গাছের ঢেঁড়শ ব্যবহার করা উচিত নয়।

ফসল সংগ্রহ : গাছের একমাস বয়সের মধ্যে ঢেঁড়শের ফুল দেখা দেয়। ফুল আসার ৩-৫ দিনের মধ্যেই ফল আহারের উপযোগী হয়ে উঠে। একবার বাগানের ঢেঁড়শ সংগ্রহ শুরু হয়ে গেলে প্রতিদিনই তোলার প্রয়োজন হয়।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা : গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার ও মাটির উপরিভাগ আলগা করে দিতে হবে। মাঝে মাঝে সেচ দেওয়ার পর জমিতে যো এলে কোদালের পাতলা কোপ দিয়ে মাটির উপরের চটা ভেঙে দিতে হয়।

গ্রীষ্ম মৌসুমে ঢেঁড়শ চাষ করলে পানি সেচ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। মাটির প্রকারভেদে ১০-১৫ দিন অন্তর সেচ দেওয়া প্রয়োজন হতে পারে। বর্ষাকালে গাছের বৃদ্ধি ও পানি জন্য ২৫-৩০ সেন্টিমিটার উঁচু করে বেড তৈরি করতে হবে।

১৩.২.৩.১. বারি ঢেঁড়শ-১ চাষ : এ জাতের গাছ ক্রমাগত খাড়াভাবে বাড়তেই থাকে এবং প্রায় দু থেকে আড়াই মিটার লম্বা হয়। প্রতিটি গাছের নিচের অংশ থেকে তিন চারটি করে ছোট শাখা বের হয়, যাতে প্রধান কাণ্ডের মতোই ফল ধরে থাকে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন প্রায় ১৫ গ্রাম।

মাটি : দোঁআশ মাটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

আইলের নির্বাচন : দৈর্ঘ্য - ২২ মিটার

প্রস্থ : ৪৫ সেন্টিমিটার।

আইল নির্বাচন : সুনিষ্কাশিত উঁচু এবং চওড়া আইল।

আইল তৈরি : আইল কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাটি নরম ও ঝুরঝুরে করতে হয়।

সারের পরিমাণ : প্রতি আইলে যে পরিমাণ সার প্রয়োজন তা নিচে উল্লেখ করা হলো -

সার ব্যবহারের সময়	সারের নাম ও পরিমাণ			
	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)
আইল তৈরির সময় : বীজ বপনের ৭-১০ দিন পূর্বে	১০	-	১২৫	-
১ম উপরিপ্রয়োগ : বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর	-	৫০	-	৫০
২য় উপরিপ্রয়োগ : বীজ গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর	-	৫০	-	৫০

বীজ বপনের হার : প্রতি আইলে ৮-১০ গ্রাম

বীজ বপন সময় : ফেব্রুয়ারি- মে মাস

দূরত্ব : গাছ থেকে গাছ ৪৫ সেন্টিমিটার

বীজ বপন : আইল তৈরি করার পর নির্দিষ্ট দূরত্বে মাদা তৈরি করে মাদায় বীজ বপন করতে হবে। প্রতি মাদায় ২-৩টি করে বীজ বপন করা দরকার। বপনের পূর্বে বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।

বীজ বপনের গভীরতা : ১-২ সেন্টিমিটার

অঙ্কুরোদগমের সময়কাল : ৪-৫ দিন।

পরিচর্যা : আইল সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হয়।

গাছ পাতলাকরণ : চারার বয়স ৮-১০ দিন হলে প্রতি মাদায় ১টি করে চারা রাখতে হয়।

সারের উপরিপ্রয়োগ : সময় মতো প্রয়োজনীয় সার উপরিপ্রয়োগ হিসাবে ব্যবহার করতে হয়।

পোকা দমন

জ্যাসিড পোকা : এ পোকা গাছের পাতার রস চুষে খায় এবং ভাইরাস রোগ ছড়ায়। পোকার আক্রমণে পাতায় ছোট ছোট হলদে বা সাদাটে দাগ পড়ে। ফলন অনেক কমে যায়।

পাতা মোড়ানো পোকা : পোকার কীড়া পাতা মুড়ে তার ভিতরে বাস করে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে নষ্ট করে ফেলে।

ডগার কাণ্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকা : প্রজাপতি গাছের কাণ্ড বা ফলের গায়ে ডিম পড়ে। ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে গাছে কচিকাণ্ড এবং ফল ছিদ্র করে ঢুকে পড়ে এবং সেইসব অংশ কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। এক সময় কচি ডগা শুকিয়ে যায়। ফলন কমে যায়।

রোগ দমন

মোজাইক ভাইরাস : এ রোগের ঢেঁড়সের পাতা হলুদ ও সবুজ মোজাইকের মতো দেখা যায়। পাতা কুঁকড়ে যায়। রোগাক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে না।

উইল্ট রোগ : ছত্রাকের আক্রমণে গাছ হলদে ও বামনাকৃতির হয় এবং পরে গাছ ঢলে পড়ে।

গোড়া ও কাণ্ড পঁচা রোগ : এ রোগের আক্রমণে মাটি সংলগ্ন গাছের নরম হয়ে পড়ে যায়। আক্রান্ত শিকড়ে এবং কাণ্ডে কালো বর্ণের দাগ পড়ে।

ফসল সংগ্রহ : গাছের বয়স ৪০-৪৫ দিন হলে সে সময় থেকে ঢেঁড়শ সংগ্রহ শুরু করা যায়। কচি অবস্থায় ঘন ঘন ফসল তুললে বেশি ফলন হয়। এক থেকে তিন দিন পরপর ফসল সংগ্রহ করা যায়।

ফলন : প্রতি আইলে ১৫-২০ কেজি।

১৩.৩. সজনা ও রাইখঞ্জন

সজনা ও রাইখঞ্জন বৃক্ষ শ্রেণীভুক্ত উদ্ভিদ। গাছ প্রায় পাচ মিটার উঁচু এবং ডালপালাযুক্ত হয়। এ গাছের পাতা, ফুল, ফল কচি অবস্থায় সবজি হিসাবে খাওয়া যায়। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, আমিষ, শর্করা এবং খনিজ লবণ থাকে।

মাটি : বেলে দোঁআশ থেকে এটেল দোঁআশ পর্যন্ত প্রায় সব ধরনের মাটিতে সাজনা চাষ করা যায়। এ ফসল দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না।

আইল তৈরি : নির্দিষ্ট দূরত্বে মাদা তৈরি করে মাদায় প্রয়োজনীয় সার মাটির সাথে মিশাতে হয়। ক্ষেতের আইলের চার কোণায় মাটি উঁচু করে মাদা তৈরি করেও সজনার শাখা কাটিং লাগানোর উপযোগী করা যায়।

দূরত্ব : মাদা থেকে মাদা দূরত্ব ৫ মিটার।

মাদার আকার : ৪৫×৪৫×৪৫ ঘন সেন্টিমিটার।

সার প্রয়োগ : মাদা প্রতি সারের পরিমাণ নিচে উল্লেখ করা হলো :

সারের নাম	পরিমাণ
গোবর	২ কেজি
টিএসপি	১০০ গ্রাম
এমপি	৫০ গ্রাম

কাটিং নির্বাচন : দেড় মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৫ সেন্টিমিটার বেড়াবিশিষ্ট পরিপক্ব ভালো কাটিং মূল গাছ থেকে কেটে সংগ্রহ করতে হয়।

কাটিং লাগানোর নিয়ম : ভালোভাবে মাদা তৈরি করার পর মাদা প্রতি একটি করে শাখা কাটিং রোপণ করতে হয়

কাটিং সংখ্যা : আইল প্রতি ৬টি কাটিংয়ের প্রয়োজন হয়।

কাটিং লাগানোর সময় : গাছের ডাল বা শাখা রোপণের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করতে হয় শাখা কলম এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত লাগানো যায়। বর্ষার শুরুতে গাছের ডাল বা কাণ্ড মাটিতে পুতে দিলে অল্প দিনের মধ্যেই কচি পাতাসহ গাছ গজিয়ে উঠে।

পরিচর্যা : ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের ডালপালা ভালো করে ছেটে দিতে হয়। যার ফলে পুনরায় অধিক সংখ্যক ডালপালা গজিয়ে গাছ বেশ ঝাঁকড়া হয়ে উঠে। এতে করে পরের বছর বেশি পরিমাণে সাজনা উৎপন্ন হয়।

কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা : গোবরেজাতীয় পোকার কীড়া বা গ্রাব কুঁড়ে কুঁড়ে কাণ্ডের মধ্যে ঢুকে আক্রান্ত কাণ্ডকে মেরে ফেলে।

শুয়াপোকা : এ পোকার কীড়া পাতা খেয়ে ক্ষতি করে থাকে। কীড়া সংগ্রহ করে ধ্বংস করার মাধ্যমে এ পোকার হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়।

ফসল সংগ্রহ : কাটিং লাগানোর দুই এক বছর পরেই ফল দেয়া শুরু করে। ফল কাঁচা অবস্থা ছেড়ে কিছু শক্ত হয়ে উঠলেই ব্যাঞ্জনে ব্যবহারের উপযোগী হয়। তবে কচি পাতা প্রায় সারা বছরই শাক হিসাবে খাওয়া যায়।

ফলন : যত্ন সহকারে চাষ করলে প্রতিটি গাছে ৫০-৬০ কেজি পর্যন্ত সবজি পাওয়া যেতে পারে।

চতুর্দশ অধ্যায়

সবজি ফসলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা

১৪.০. সবজি ফসলের প্রধান প্রধান পোকা

ক্ষতিকর পোকামাকড় ফসল উৎপাদনের এক বিরাট অন্তরায়। পোকার আক্রমণের ফলে ফসলের ফলন এবং গুণাগুণ হ্রাস পায়। কোনো কোনো সময় সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন ফসলে বিভিন্ন রকম পোকামাকড় এককভাবে অথবা একযোগে আক্রমণ করে থাকে। নিচে ফসলের কয়েকটি প্রধান প্রধান ক্ষতিকর পোকামাকড় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

- ক. জাবপোকা;
- খ. লাল কুমড়া পোকা ;
- গ. এপিলেকনা বিটল ;
- ঘ. থ্রিপস্ ;
- ঙ. জ্যাসিড ;
- চ. ফলের মাছি পোকা ;
- ছ. বিছা ও লেদাপোকা ;
- জ. কাটুই পোকা ;
- ঞ. ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা ;
- ট. ক্ষুদে মাকড়সা ;
- ঠ. লিফ মাইনার

ক. জাবপোকা

জাবপোকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকৃতির কোমল দেহি এবং গাঢ় সবুজ, ধূসর বা কালো বর্ণের। এটি শুষ্ক এবং উষ্ণ আবহাওয়ায় অতি দ্রুত বংশ বিস্তার করে। এ জন্য শীতের শেষে ও বসন্তকালে এ পোকার প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি হয়। এরা পাতার নিচের দিকে কলোনি করে থাকে। এরা সাধারণত পাখাবিহীন হয়ে থাকে। তবে মাঝে মধ্যে পাখাবিশিষ্ট পোকাও দেখা যায়। এগুলোর দেহ খুব নরম। হাতের সামান্য চাপে গলে যায়।

জাবপোকার বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতা অত্যধিক। এদের প্রজননকাল ৫-৮ দিন। এ সময়ে এরা ১৫ বার বাচ্চা (নিম্ফ) দেয় এবং এক একবার ১৫-২০টি নিম্ফ দেয়। নিম্ফ এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক পোকায় পরিণত হয় এবং অতি দ্রুত বংশবিস্তার শুরু করে। ফলে অল্প সময়েই এরা বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ফসলের মারাত্মক ক্ষতি

সাধন করে জাবপোকা বিভিন্ন ফসলের একটি প্রধান ক্ষতিকর পোকা। বিভিন্ন জাতের জাবপোকা বিভিন্ন ফসলে আক্রমণ করে থাকে। এ পোকা বেশি ক্ষতি করে থাকে শিমজাতীয় শাকসবজিতে। এ ছাড়া ঢেঁড়স, বেগুন, মরিচ, লাউ, করলা ইত্যাদি গাছেরও ক্ষতি করে থাকে।

ক্ষতির প্রকৃতি : জাবপোকা দলবদ্ধভাবে গাছের বিভিন্ন নরম অংশের যেমন– কচি ডগা, পাতা, ফুল ও ফল) রস চুষে খায়। ফলে আক্রান্ত গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে, পাতা কুঁকড়িয়ে যায়, ফুল-ফল শুকিয়ে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত অংশে ছত্রাক জন্মে এবং কালো কালো বিন্দুর মতো দাগ পড়ে। আক্রান্ত গাছে বিভিন্ন প্রকার পিঁপড়ার আনাগোনা দেখা যায়। গাছে পিঁপড়া দেখলে বুঝতে হয় যে, জাবপোকার আক্রমণ শুরু হয়েছে কারণ জাবপোকা তার শরীরের পিছন দিকে দুটি নল দ্বারা মধুর মতো এক প্রকার রস নিঃসৃত করে। সেই রস খাওয়ার জন্য পিঁপড়া আসে। পিঁপড়া গাছের অথবা জাবপোকার কোনো ক্ষতি করে না। গাছের রস শোষণ করা ছাড়াও জাবপোকা মোজাইক ভাইরাসের বাহক হিসেবে কাজ করে।

দমন পদ্ধতি

(১) হাত দিয়ে ;
(২) সাবান দিয়ে ;
(৩) কেরোসিন মিশ্রিত ছাই ছিটিয়ে ;
(৪) লেডি বার্ড বিটল নামক পরভোজী পোকা এবং এর শূককীট জাবপোকা খায় তাই আক্রান্ত ফসলে এই পরভোজী পোকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে জাবপোকা সাফল্যজনকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ;
(৫) পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করে ;
(৬) জৈব এবং উদ্ভিজ কীটনাশক ব্যবহার করে দমন করা যায়। মরিচ, রসুন, নিম, তামাক দ্বারা তৈরি কীটনাশক জাবপোকা দমন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে;
(৭) সুষম সার ব্যবহার। অধিক মাত্রায় ইউরিয়া সার ব্যবহার করলে জাবপোকার আক্রমণ বেড়ে যায়।

খ. রেড পাম্পকিন বিটল

পূর্ণবয়স্ক পোকা ৬ মি.মি. লম্বা এবং ২ মি.মি. চওড়া। এ পোকার রঙ লালচে কমলা। এ পোকা কুমড়াজাতীয় সবজির প্রধান শত্রু।

ক্ষতির প্রকৃতি : পূর্ণবয়স্ক পোকা গাছের পাতা খেয়ে গোলাকার ছিদ্র করে দেয়। সারা বছরই ক্ষতি করে থাকে। তবে চারা অবস্থায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। ফলে চারা গাছ মারা যেতে পারে। শূককীট অবস্থায় এ পোকা সবজির শিকড় ও কাণ্ডের ভূ-সংলগ্ন অংশ চিবিয়ে খেতলে দেয়। ফলে সেই জায়গায় ছত্রাকের আক্রমণ হয় এবং কাণ্ড পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দমন পদ্ধতি

(১) হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলা ;
(২) কেরোসিন মিশ্রিত কাঠের ছাই ব্যবহার করা ;

(৩) পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ ধ্বংস করা ;
(৪) আগাছা দমন করা ;
(৫) পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করা ;
(৬) জৈব এবং উদ্ভিদ কীটনাশক ব্যবহার করা।

গ. ইপিলাকনা বিটল

পূর্ণবয়স্ক পোকা আকারে ছোট, প্রায় গোলাকার, দৈর্ঘ্যে ৭ মি.মি. এবং প্রস্থে ৫.৫ মি.মি.। সামনের পাখার উপরে ১২-২৮টি পর্যন্ত কালো ফোঁটা থাকে। স্ত্রী পোকা পাতার নিচের দিকে একত্রে অনেকগুলো ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়া বের করে। কীড়ার রঙ হলুদ, দেহ নরম ও কাঁটাযুক্ত।

ক্ষতির প্রকৃতি : পূর্ণবয়স্ক পোকা এবং পোকার কীড় পাতার নিচের দিকে বসে পাতা খেয়ে পাতাকে জালের মতো ঝাঁঝরা করে ফেলে। ফলে পাতা শুকিয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে গাছ মারা যায়। আক্রান্ত গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ে এবং গাছ পাতাশূন্য হয়ে পড়ে। পূর্ণবয়স্ক পোকার চেয়ে কীড়ার আক্রমণই ব্যাপক। এদের আক্রমণে পাতার শুধু শিরা উপশিরাগুলো অবশিষ্ট থাকে এবং আক্রমণের ৫-৭ দিনের মধ্যেই গাছ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়।

দমন পদ্ধতি

(১) হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলা ;
(২) কেরোসিন মিশ্রিত কাঠের ছাই ব্যবহার করা ;
(৩) পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ ধ্বংস করা ;
(৪) আগাছা দমন করা ;
(৫) পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করা ;
(৬) জৈব এবং উদ্ভিজ্জ কীটনাশক ব্যবহার করা

ঘ. থ্রিপস্

এটি একটি ক্ষুদ্রাকার (দৈর্ঘ্য ১-২ সেন্টিমিটার) লম্বাটে ও বাদামি বর্ণের পোকা। শুকনো মৌসুমে এর আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। এর পাখনা পালকের ন্যায়। পূর্ণাঙ্গ পোকা পাতার ফাটলের ভিতর ডিম পাড়ে। ১০ দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে শূককীটে পরিণত হয় এবং এরপর পিউপা পর্যায় অতিক্রম করে। এ পোকার জীবনচক্র সম্পন্ন করতে ৩ সপ্তাহ সময় লাগে।

ক্ষতির প্রকৃতি : থ্রিপস্ পোকা ফুলের রস চুষে খেয়ে ফুলের ক্ষতি করে থাকে। আক্রমণের কারণে ফুল ঝরে যেতে পারে। এই পোকা নতুন এবং কচি পাতায়ও আক্রমণ করে, ফলে নতুন পাতা বিকৃত ও বিবর্ণ হয়। কিছু কিছু থ্রিপস্ ভাইরাস বহন করে থাকে। আক্রান্ত গাছের পাতায় কালো বিন্দুর মতো পোকার মল পড়ে থাকে।

দমন পদ্ধতি

(১) পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ ধ্বংস করা ;

(২) পোকার কীড়ার গাদা খুঁজে বের করে নষ্ট করে ফেলা ;
(৩) পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করা ;
(৪) আইলে কঞ্চি পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করা ;
(৫) সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করা ;

ঙ. জ্যাসিড

এটি শোষক শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকার পোকা। এ পোকা সাধারণত সবুজ রঙের হয়ে থাকে। এ পোকা গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়।

ক্ষতির প্রকৃতি : জ্যাসিড পোকা পাতার নিচের দিকে বসে পাতার রস চুষে খায় এবং ভাইরাস রোগ বিস্তার করে। দেহ নিঃসৃত লালার বিষক্রিয়ায় পত্রকোষের ক্ষতি সাধন করে থাকে। আক্রমণের ফলে গাছের পাতা কুঁকড়ে যায়, সাদা দাগ পড়ে বা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বেগুন, ঢেঁড়শ, বরবটি, টমেটো, শিম, আলু ইত্যাদি ফসল ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়

দমন পদ্ধতি

(১) পরিষ্কার পানি স্প্রে করা ;
(২) আগাছা দমন করা ;
(৩) পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করা ;
(৪) পাতার নিচের দিকে কেরোসিনমিশ্রিত ছাই ছিটানো ;
(৫) আর্দ্র পরিবেশ দূর করা ;
(৬) উদ্ভিজ্জ কীটনাশক ব্যবহার করা।

চ. ফলের মাছি পোকা

পূর্ণবয়স্ক পোকা দেখতে অনেকটা মাছির মতো। তবে এর পাখনা দুটি খাড়া থাকে এরা লালচে বাদামি বর্ণের এবং গলায় হলুদ দাগ আছে কুমড়া গোত্রের প্রায় সব সবজি ফলের মাছি পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। এছাড়া বরবটি, ঢেঁড়স, শিম ইত্যাদি ফসলেও এ পোকা আক্রমণ করে থাকে। বর্ষা মৌসুমে মাছি পোকার উপদ্রব বেশি হয়। মাছি পোকা ফলের অভ্যন্তরে ডিম দিয়েই চলে যায়। কীড়া ফলের ভিতরে থাকে বিধায় দমন করা খুবই অসুবিধাজনক

ক্ষতির প্রকৃতি : পূর্ণবয়স্ক মাছি পোকা হুলের সাহায্যে কচি ফলের অভ্যন্তরে ডিম পাড়ে ডিম থেকে কীড়া (ম্যাগোট) বের হয়ে ভিতরে শাস খেতে থাকে। হুল ফুটিয়ে ডিম পাড়ার কারণে ফলের গায়ে দাগ পড়ে। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের ফলে আক্রান্ত ফল পচে যায় পরে ফল ঝরে পড়ে, বাঁকা হয় বা বিকৃত হয়ে যাওয়ায় খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে যায়।

দমন পদ্ধতি

(১) আক্রান্ত ফল তুলে নষ্ট করে ফেলা এবং মাটির নিচে পুঁতে ফেলা ;

(২) আগাছা দমন করা ;
(৩) পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করা;
(৪) ফল কচি অবস্থায় কাগজ বা কাপড় দ্বারা ঢেকে দেয়া;
(৫) শূককীট ধ্বংস করা;
(৬) ধুঁয়া দেয়া;
(৭) বিষ টোপ ব্যবহার করা;
(৮) শস্য পর্যায় অবলম্বন করা;
(৯) জৈব বা উদ্ভিজ্জ কীটনাশক ব্যবহার করা।

ছ. বিছা ও লেদাপোকা

বিভিন্ন পোকার মথ ও প্রজাতির শূককীট অবস্থাকে বিছাপোকা ও লেদাপোকা বলে শূককীটের গায়ে লোম থাকলে তাকে বিছাপোকা আর লোম না থকলে তাকে লেদাপোকা বলা হয়।

ক্ষতির প্রকৃতি : এ পোকা দিনে মাটিতে বা পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এবং রাতে গাছের পাতা, কাণ্ড ও ফল চিবিয়ে খেয়ে ফসলের ক্ষতি করে থাকে। গাছের গোড়া কেটে দেয় এবং ডগা ও ফলের ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে পড়ে কখনো দেখা যায় যে অজস্র লেদাপোকা এক সঙ্গে পাতার নিচে জড়ো হয়ে থাকে।

দমন পদ্ধতি

(১) বিছাপোকার মথ হাত বা জাল দ্বারা ধরে মেরে ফেলা;
(২) পোকার কীড়ার গাদা খুঁজে বের করে নষ্ট করে ফেলা;
(৩) পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করা;
(৪) আইলে কঞ্চি পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করা;
(৫) সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করা।

জ. কাটুই পোকা

এ পোকা গাছের কাণ্ডে বা কাছাকাছি মাটিতে ডিম পাড়ে একটি প্রজাপতি ১০০০-১৫০০ ডিম পাড়ে এবং ১০-১৪ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে লার্ভাতে (ক্যাটারপিলার) পরিণত হয়। শূককীট ১-২ সপ্তাহ ধরে রাতে গাছের পাতা খেতে থাকে তারপর মাটিতে নেমে যায় এবং গাছের কাছাকাছি মাটিতে অবস্থান করে শূককীট ১০-৩০ দিনের মধ্যে পিউপাতে পরিণত হয় এবং এ সময়টুকু মাটিতে কাটায়।

ক্ষতির প্রকৃতি : এই পোকার কীড়া চারা অবস্থায় ফসলের কাণ্ড কেটে দিয়ে ক্ষতি করে থাকে। এটি দিনের বেলায় মাটিতে লুকিয়ে থাকে রাতে বাইরে এসে চারার গোড়া কেটে দেয়। ভোর বেলায় কর্তিত চারার গোড়ায় মাটি খুঁড়লে এদের সন্ধান পাওয়া যায়।

দমন পদ্ধতি

(১) ভালোভাবে আইলের মাটি কোপানো যাতে করে পোকার শূককীট মাটির উপরে উঠে আসে। এর ফলে শূককীট রোদের আলোয় কুঁকড়ে মরে যায় অথবা পাখিরা খেয়ে ফেলে;

(২) আইল আগাছা মুক্ত রাখা;
(৩) পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করা;
(৪) রাতে কাটুই পোকা হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলা;
(৫) পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়ে ফেলা;
(৬) চারার চারিদিকে ছাই, কেরোসিন মিশ্রণ প্রয়োগ করা;
(৭) আক্রান্ত গাছের নিকট মাটি থেকে কাটুই পোকা বের করে বিনষ্ট করা;
(৮) প্রতি বছর একই ফসল আবাদ না করা;
(৯) তামাক পাতার কীটনাশক ব্যবহার করা;
(১০) চারা থেকে ৬-৭ সেন্টিমিটার দূরে গোলাকার নালা তৈরি করা।

ঝ. ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা

প্রজাপতি দেখতে সাদা রঙের এবং পাখনায় বিচিত্র বর্ণের দাগ থাকে। প্রজাপতি সাধারণত রাতে উড়ে বেড়ায়। স্ত্রী প্রজাপতি একসাথে ৮০-১২০টি ঘিয়ে রঙের ডিম পাড়ে। ডিমগুলো পৃথকভাবে বা এক সাথে ৩-৪টি করে পাতার নিচে, কাণ্ডে, পুষ্প মুকুলে বা ফলের উপবৃন্তে থাকে। ডিম ৩-৬ দিনের মধ্যেই ফুটে এবং কীড়াগুলো নরম কাণ্ড, পুষ্পমুকুল বা উপবৃন্ত ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে। পূর্ণবয়স্ক কীড়া দেখতে হাল্কা গোলাপি রঙের। এ কীড়া গ্রীষ্মকালে ১২-১৫ দিন এবং শীতকালে ১৪-২২ দিন পর পুত্তলিতে পরিণত হয়। গ্রীষ্মকালে ৭-১০ দিন এবং শীতকালে ১৩-১৫ দিন পর পুত্তলি থেকে পূর্ণবয়স্ক পোকা বের হয়ে আসে। সারা বছরই এগুলোর আক্রমণ হয় তবে গ্রীষ্মকালে এগুলোর আক্রমণ বেশি হয়।

ক্ষতির প্রকৃতি : পোকার কীড়া কচি ডগা ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে এবং এ ডগা খেতে থাকে। ফলে ডগার কলা অতি শীঘ্রই নষ্ট হয় এবং স্বাভাবিকভাবে গাছের খাদ্য চলাচল পথ বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য দুপুরের রোদে আক্রান্ত ডগাগুলো নেতিয়ে বা ঢলে পড়তে দেখা যায়। কিছু দিনের মধ্যেই ডগা শুকিয়ে মারা যায়। যখন ফল ধরা শুরু হয় তখন কীড়াগুলো কচি ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে এবং ফলের ভিতরের কলা খেয়ে বড় হতে থাকে। কীড়ার মল ফলের ভিতরে জমা হতে থাকে। আক্রান্ত ফল পচে যায়, বিকৃত আকার ধারণ করে। অনেক সময় ফল ঝরে পড়ে।

ঞ. ক্ষুদে মাকড়সা

এ পোকা আকারে খুব ছোট, খালি চোখে খুব একটা নজরে আসে না। এগুলো লাল, সাদা ও ঘিয়ে বর্ণের হয়ে থাকে। গরম ও শুকনা অবস্থায় আক্রমণ বৃদ্ধি পায়। বেগুন, বরবটি, ভুট্টা, ঢেঁড়শ ইত্যাদি সবজি এ পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

ক্ষতির প্রকৃতি : ক্ষুদে মাকড়সা কচি পাতা এবং কাণ্ডের রস শোষণ করে থাকে। এটি যে স্থানের রস শোষণ করে সে স্থান হলুদ হয়ে যায়। যদি এরা সংখ্যায় বেশি হয় তবে সম্পূর্ণ গাছ হলুদ হয়ে যায়। আক্রান্ত পাতা কুঁকড়ে যায়। ক্রমে ক্রমে ছোট হতে থাকে এবং লতার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। আক্রান্ত লতার যে ফল হয় তা বিবর্ণ ও কুঁচকানো হয়। পাতার নিচে তাকালে মনে হয় যেন সেখানে লাল বা সাদা পাউডার ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। পাতার উপর মাকড়সার জালের মতো বস্তু দেখা যায়।

দমন পদ্ধতি

(১) পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করা;
(২) ভালোভাবে আইল তৈরি করা;
(৩) সঠিক দূরত্বে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা;
(৪) সুষম সারের ব্যবহার করা;
(৫) জৈব বা উদ্ভিজ্জ কীটনাশক ব্যবহার করা।

ঙ. লিফ মাইনার

পূর্ণবয়স্ক পোকা পাতার উপরে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতার উপরিভাগের সবুজ অংশ খেয়ে প্রথমে পাতার উপরে আঁকা-বাঁকা রেখার সৃষ্টি করে। ফলে পাতার ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে যায়। পাতা বিবর্ণ আকার ধারণ করে এবং পাতায় খাদ্য প্রস্তুত ব্যাহত হয়। প্রথমে চারা অবস্থায় গাছের নিচের দিকের পাতায় আক্রমণ করে পরবর্তী পর্যায়ে গাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রায় সব পাতাতেই এর আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। আক্রমণ খুব বেশি হলে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং গাছ মারা যায়।

দমন পদ্ধতি

(১) পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করা;
(২) ছাই ব্যবহার করা;
(৩) পরিষ্কার পানি স্প্রে করা;
(৪) আগাছা দমন করা;
(৫) সমন্বিত পদ্ধতি অবলম্বন করা।

১৪.১. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা

পোকামাকড় ও রোগবালাই কাঙ্ক্ষিত ফসল উৎপাদনের একটি প্রধান অন্তরায়। ভালো ফলন পেতে হলে এদেরকে সময়মতো দমন করা দরকার। সাধারণভাবে পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনের জন্য রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করা হয়। এতে লক্ষ্য করা যায় যে, ক্ষতিকর পোকামাকড় রাসায়নিক বিষের উপর সহনশীল হয়ে উঠে। ফলে এর পরে সেই পরিমাণ বিষ দিয়ে পোকামাকড় দমন করা যায় না। তাই আরও বেশি পরিমাণ বিষ ব্যবহার করতে হয়।

রাসায়নিক বিষ পরিবেশ, আবহাওয়া এবং ফসলকে বিষাক্ত করে তোলে। রাসায়নিক বিষ ব্যবহারের ফলে অনেক উপকারী পোকামাকড় মারা যায়, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাই ফসল সংরক্ষণ ও সঠিক ফলনের জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করা হয়। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি পদ্ধতি যার দ্বারা ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগবালাইকে অর্থনৈতিক ক্ষতি সীমার নিচে দমিয়ে বা নিয়ন্ত্রিত করে রাখা হয়।

ফসলে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণের পর সেগুলো দমনের চেয়ে যাতে ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগে আক্রান্ত হতে না পারে সে ব্যবস্থা অবলম্বন করা

সবচেয়ে বেশি যুক্তিসঙ্গত। সে জন্য ফসল চাষাবাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা উচিৎ যাতে করে সুস্থ-সবল গাছ উৎপাদন করা যায়। একটি সুস্থ সবল গাছে রোগ-বালাই ও নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা উচিত যাতে করে সুস্থ-সবল গাছ উৎপাদন করা যায়। একটি সুস্থ-সবল গাছে রোগ-বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না বললেই চলে। পক্ষান্তরে দুর্বল গাছে সহজেই বিভিন্ন ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ হয়।

ফসল চাষাবাদের সময় বিশেষ কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আছে যা অবলম্বন করলে পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়। আবার যদি ফসলে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দেয় তবে রাসায়নিক বিষ বা কীটনাশক ব্যবহার না করেও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলকে পোকামাকড় ও রোগবালাই থেকে রক্ষা করা যায়

বীজ বপন বা চারা রোপণের পর থেকে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত সময়মতো সঠিক পরিচর্যা করলে সুস্থ-সবল গাছ জন্মায়। তাই এ জন্য নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে আইলের কৃষি পরিবেশ বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। নিচে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১) **রোগজীবাণু ও পোকামাকড়মুক্ত, সুস্থ-সবল বীজ ও বংশবিস্তারের উপকরণের ব্যবহার :** রোগজীবাণু মুক্ত ও পোকা আক্রান্ত নয় এমন বীজ এবং বংশবিস্তারের উপকরণ ব্যবহার করলে ফসল রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। তাই ফসল চাষাবাদের সময় রোগবালাই মুক্ত, সুস্থ ও সবল বীজ ব্যবহার করা উচিত

২) **রোগ প্রতিরোধী জাতের ব্যবহার :** কিছু ফসল আছে যেগুলোর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে। সে ফসলগুলোতে সহজে রোগ জীবাণু আক্রমণ করতে পারে না। আক্রমণ করলেও ফসল ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছায় না। রোগবালাই দমনের ক্ষেত্রে এটা সহজ এবং স্বল্প ব্যয় ব্যবস্থা। টমেটোর 'মানিক' ও 'রতন' জাত পাতা কুঁকড়ানো এবং হলুদ মোজাইক ভাইরাস প্রতিরোধী।

৩) **সঠিক সময়ে চাষাবাদ :** সঠিক সময়ে বীজ বপন বা চারা রোপণ করে ফসলের রোগ এবং পোকা অনেকাংশে দমন করা যায়। এ ক্ষেত্রে রোগ ও পোকা আক্রমণের অনুকূল আবহাওয়াকে এড়িয়ে ফসল চাষাবাদ করা হয়।

৪) **সুস্থ-সবল গাছ জন্মানো :** উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্থ-সবল গাছ জন্মানো প্রয়োজন। কারণ, সুস্থ-সবল গাছে সঙ্গত কারণে পোকা ও রোগের আক্রমণ কম হয়। এতে জমিতে চাষকৃত ফসলকে ক্ষতিকর পোকা ও বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

৫) **উত্তমরূপে আইল তৈরি :** আইল তৈরির সময় মাটি কোপানোর ফলে মাটি উলট-পালটের কারণে মাটির নিচে বসবাসকারী পোকা, পোকার কীড় মাটির উপরে

চলে আসে যা পাখি খেয়ে ফেলে বা সূর্যের আলোতে মারা যায় ; যেমন– উরচুঙ্গা, উইপোকা, কাটুই পোকা ইত্যাদি।

৬) **রোগাক্রান্ত ও পোকাক্রান্ত গাছের অংশবিশেষ ধ্বংস সাধন** : রোগাক্রান্ত এবং পোকাক্রান্ত গাছ ধ্বংস করলে সেই রোগ পরবর্তী ফসলে আক্রমণ করতে পারে না ; তাই রোগাক্রান্ত এবং পোকাক্রান্ত গাছের ডাল, শাখা-প্রশাখা এবং ফল ধ্বংস করতে হয়। এসব ফসল থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে না। আক্রান্ত গাছ বা গাছের অংশ পুড়িয়ে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

৭) **পর্যায়ক্রমে ফসল চাষ** : প্রতি বছর একই ফসল একই আইলে চাষ করার ফলে সেই গাছের রোগ উৎপাদক জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ; পর্যায়ক্রমে চাষের মাধ্যমে এসব রোগ উৎপাদনকারী জীবাণুর সংখ্যা কমিয়ে সহজেই রোগ দমন করা যায়। একই ফসল বিশেষ করে একই গোত্রের ফসল প্রতি বছর একই আইলে চাষ না করে সুপরিকল্পিত উপায়ে অন্য ফসলের চাষ করা উচিত।

৮) **আইল পরিষ্কার-পরিছন্ন রাখা বা আগাছা দমন** : পরিষ্কার-পরিছন্ন চাষাবাদ কাঙ্ক্ষিত ফলনের নিশ্চয়তা দেয়। রোগবালাই পোকামাকড় আগাছার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে এবং বেঁচে থাকে। আগাছা অনেক রোগের বিকল্প পোষক হিসেবে কাজ করে। তাই আগাছা দমনসহ অন্যান্য পরিচর্যা সময়মতো করলে রোগবালাইয়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

৯) **হাত দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলা** : কিছু কিছু ক্ষতিকর পোকা রয়েছে যা আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়েই হাত দিয়ে ধরে দমন করা সম্ভব। এভাবে দমন করা হলে পোকার বংশবিস্তারের সুযোগ থাকে না। ফলে সহজেই ফসলকে ক্ষতিকর পোকার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে বিটল, জাব পোকা, বিছাপোকা দমন করা যায়।

১০) **ফসলের পরিত্যক্ত অংশ ধ্বংস করা** : অনেক সময় ফসলের পরিত্যক্ত অংশের মাধ্যমে রোগবালাই পোকামাকড় বিস্তার লাভ করে। ফসল সংগ্রহ করার পর পরই এগুলোর অংশবিশেষ ধ্বংস করতে হয়। তবেই পরবর্তী ফসলকে রোগ ও পোকা আক্রমণের উপদ্রব থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

১১) **সঠিক দূরত্বে বীজ বপন বা চারা রোপণ** : এর ফলে সঠিক দূরত্বে বীজ বপন বা চারা রোপণ করলে ফসলে রোগ ও পোকা আক্রমণের সুযোগ খুব কম থাকে। কারণ, রোগবালাইয়ের জন্ম, বৃদ্ধি এবং বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ থাকে না।

১২) **সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার** : সুষম সার ব্যবহারের ফলে পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করা যায়। সুষম সার সুস্থ-সবল গাছের জন্ম দেয়। সুস্থ-সবল গাছে পোকামাকড়ের আক্রমণ খুব কম থাকে। পক্ষান্তরে, সুষম সার ব্যবহার না করা হলে গাছ দুর্বল হয় যা সহজেই রোগ বা পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করলে এফিডের আক্রমণ বেড়ে যায়।

১৩) **আলো ফাঁদ ব্যবহার করা :** প্রজাপতি জাতীয় পোকাকে আকৃষ্ট করার জন্য রাতে আলো বা হারিকেন ঝুলিয়ে দিয়ে একটি পাত্রে কেরোসিনমিশ্রিত পানি আলোর নিচে রাখলে মথ বা প্রজাপতি পাত্রের পানিতে পড়ে মারা যায়।

১৪) **আঠার ফাঁদ ব্যবহার করা :** কাঠালের আঠা একটি পাটকাঠির মাথায় লাগিয়ে পুঁতে রাখলে কুমড়জাতীয় ফলের মাছি পোকা আঠায় আটকিয়ে মারা যায়।

১৫) **প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা :** কুমড়া পরিবারের কিছু সবজির ক্ষেত্রে পাতলা কাপড় বা কাগজ দিয়ে মোড়ায়ে বেঁধে দিলে মাছি পোকার আক্রমণ কম হয়।

১৬) **গাছের চারদিকে গোলাকার নালা তৈরি করা :** লাউ, কুমড়া ইত্যাদি সবজির চারা লাগিয়ে চারার গোড়া থেকে ১৫ সেন্টিমিটার দূরে আঙুল দিয়ে একটি গোলাকার নালা করে দিলে কাটুই পোকার আক্রমণ কম হয়।

১৭) **বীজ শোধন করা :** বীজ বপনের পূর্বে বীজ শোধন করলে রোগের আক্রমণ কম হয়। গরম পানি দ্বারা বীজ শোধন করা যায়। ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বীজ ১৫-২০ মিনিট গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। ফলে বীজবাহিত রোগ অনেকাংশে দমন করা সম্ভব।

১৮) **সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা :** সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের সঠিক বৃদ্ধি ছাড়াও পোকা দমন করা যায়। উইপোকা, পিঁপড়া, কাটুই পোকা ইত্যাদির মাটির নিচে থাকে। সেচের মাধ্যমে এ সব পোকা সহজেই দমন করা যায়। তাছাড়া ফসলের বৃদ্ধি সঠিকভাবে হলে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়ে যায়।

১৯) **বিতৃষ্ণাজাতীয় ফসল চাষ কার :** কিছু কিছু ফসল আছে, যেমন পেঁয়াজ, রসুন, গাদা ফুল ইত্যাদি আন্তঃফসল হিসেবে বা বহুবিধ ফসল হিসেবে চাষ করলে এসব ফসলের গন্ধে মূল ফসলে ক্ষতিকর পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়।

২০) **গাছের ক্ষত চিকিৎসা :** গাছে রোগ সৃষ্টিকারী অনেক জীবাণু, যেমন– ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি গাছের ক্ষতের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে। ঝড়ে বা কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যার সময় যদি গাছে কোনো ক্ষত সৃষ্টি হয়, তবে তা সাথে সাথে নিরাময় করতে হয়। যার ফলে আর কোনো রোগ জীবাণু দ্বারা গাছ আক্রান্ত হয় না।

২১) **রোগের বাহক দমন :** বিভিন্ন রোগ যেমন ভাইরাস বিভিন্ন প্রকার শোষক পোকা (জাবপোকা, জ্যাসিড) ও মাটিতে বিদ্যমান ছত্রাক ও কৃমি দ্বারা বিস্তার লাভ করে। রোগের এসব বাহক দমন করতে পারলে গাছ রোগাক্রান্ত হতে পারে না।

২২) **আন্তঃফসল চাষ :** যেসব ফসল একই পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয় না সেসব ফসলগুলোকে আন্তঃফসল চাষের আওতায় আনা হলে পোকা উপদ্রব কম হয়।

২৩) **বপন সময় এগিয়ে বা পিছিয়ে নেয়া :** ফসল চাষাবাদের ক্ষেত্রে বীজ বপন বা চারা রোপণের সময় এগিয়ে বা পিছিয়ে নিয়ে কোনো কোনো রোগ ও পোকামাকড় থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়।

২৪) **জৈব প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা :** প্রকৃতিতে অনেক পোকামাকড় আছে যেগুলো ফসলের অনিষ্টকারী পোকামাকড় দমনে সাহায্য করে এগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক. **পরভোজী পোকা :** এরা অনিষ্টকারী পোকামাকড়কে খেয়ে বা দেহ থেকে রস শুষে দমন করে। একই পরভোজী পোকা বেশ কয়েক জাতের পোকা খেয়ে থাকে। পরভোজী পোকামাকড় এ সব অনিষ্টকর পোকামাকড়ের সঙ্গে থাকে এবং এদের খেয়ে ফেলে। যেমন– ব্যাঙ, পাখি, মাকড়সা, লেডিবার্ড বিটল, প্রেয়িং মেনটিড। আইলে বাঁশ পুঁতে দিলে পাখি বসে বিভিন্ন রকম পোকা ও কীড়া খেয়ে পোকা দমনে সাহায্য করে।

খ. **পরজীবী পোকার কীড়া :** একটি পরজীবী পোকা একটি জাতের পোকামাকড় দমন করে। পরজীবী কীড়াই এসব কাজ করে। এসব পোকার মধ্যে বোলতা একটি। এসব উপকারী পোকার যাতে কোনো ক্ষতি না হয় তার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়। এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয় যাতে এসব পোকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে।

২৫) **গাছ পাতলাকরণের মাধ্যমে :** বীজ বপনের পর যদি ঘন হয়ে গাছ জন্মে তবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চারা রেখে অতিরিক্ত চারা উঠিয়ে গাছ পাতলা করে দিতে হয়। এতে গাছ প্রচুর আলো, বাতাস পেয়ে সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠবে এবং রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতাও।

২৬) **পানি প্রয়োগের মাধ্যম :** স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে গাছে পানি প্রয়োগ করে এফিড, জেসিড সফলতার সাথে দমন করা যায়।

২৭) **উদ্ভিজ্জ কীটনাশক ব্যবহার মাধ্যমে**

ক. **আতা পাতার দ্রবণ :** ১ ভাগ ওজনের আতা পাতা ভালোভাবে পিষে ৫ ভাগ ওজনের পানির সাথে মিশিয়ে কিছুক্ষণ রেখে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ছাঁকার পর সে তরল পাওয়া যায় তাই আতা পাতার দ্রবণ। এ দ্রবণ জাবপোকা, পামকিন বিটল, ডায়মন্ড ব্যাক মথ এবং অন্যান্য পোকা দমনের ক্ষেত্রে কার্যকর

খ. **মরিচ দ্রবণ :** ১০০ গ্রাম মরিচের গুঁড়া ১ লিটার পানির সাথে এক রাত রেখে দেয়ার পর ছেকে নিতে হয়। সেই দ্রবণ আরও ৫ লিটার সাবানের ফেনাযুক্ত পানির সাথে মিশিয়ে পোকা দমনের জন্য ফসলে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। এর দ্বারা জাবপোকা, পিঁপড়া বিভিন্ন কীড়া এবং শসার মোজাইক ভাইরাস দমন করা যায়

১৪.২. কীটনাশকের ব্যবহার

১৪.২.১. নিম কীটনাশক তৈরির পদ্ধতি : এ পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো

১) পাকা হলুদাভ নিমের বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

২) সলুনের উপর হাতের সাহায্যে ঘষে বীজ আলাদা করতে হয়

(৩) ছায়ায় বীজ শুকিয়ে ঝুড়িতে রাখতে হয়।
(৪) এক কেজি ব্যবহারযোগ্য নিম কীটনাশকের জন্য ২৫০ গ্রাম শুকনো নিম বীজের দরকার।
(৫) বীজ শিল পাটায় পিষতে হয়।
(৬) পিষনকৃত নিম বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হয়।
(৭) কাপড়ের সাহায্যে ছেকে রস আলাদা করতে হয়। এই রসই নিম কীটনাশক বা নিম পেস্টিসাইড।

১৪.২.২. নিম কীটনাশক দিয়ে পোকা দমন : এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

ক. পাতা খাওয়া বিছা ও লেদাপোকা এবং লাউ, কুমড়া করলার বিটল (লার্ভা)
খ. জাবপোকা এবং অন্যান্য পোকা যা সরাসরি পাতা খায় না কিন্তু গাছের রস চুষে খায় তবে উদ্ভিজ্জ কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার দরকার আছে।

১৪.২.৩. বোর্দো-মিক্সার প্রয়োগের মাধ্যমে : ছত্রাকজাতীয় রোগ দমনে বোর্দো মিক্সার কার্যকর ভূমিকা রাখে। এ মিশ্রণ তৈরি করতে তুত, চুন এবং পানির প্রয়োজন হয় বিভিন্ন অনুপাতে এই মিশ্রণ তৈরি করা যায় তবে ৪:৪:৫০ অনুপাতটি বেশি কার্যকর এ অনুপাতে ৪০০ গ্রাম পাথুরে চুন এবং ৫০ লিটার পানি দরকার :

প্রথমে ২৫ লিটার পানি একটি মাটির পাত্রে নিতে হয়। তারপর সেই পানি পাত্রে তুত গুলাতে হয় এবং অপর পাত্রে পাথুরে চুন অল্প অল্প পানি দ্বারা ফুটিয়ে চুনের পানির সাথে মেশাতে হয়। তুতের পানির সাথে চুনের পানি মেশানোর সময় পরিষ্কার চাকু মিশ্রণে ডুবিয়ে দেখতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত চাকু তামাটে রঙ ধারণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত পানির সাথে চুনের পানি মিশাতে হয়। এই বোর্দোমিশ্রণ স্প্রে মেশিনের সাহায্যে প্রয়োগ করা যায়।

ফসল সংরক্ষণ এবং কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা একটি সময় উপযোগী গ্রহণযোগ্য কলাকৌশল এই কৌশলের মাধ্যমে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে ফসলকে রোগ-বালাই মুক্ত রাখা হয় এবং পাশাপাশি পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় তার ব্যবস্থা করা হয়। সমন্বিত বালাই দমনের সবগুলো ব্যবস্থা অবলম্বনের পরও যদি ফসলে ক্ষতিকর পোকা ও রোগের আক্রমণ বেশি হয়ে ফসল অত্যধিক ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছে একমাত্র তখনই রাসায়নিক বালাইনাশক ওষুধ প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪.৩. শাকসবজির ভালো বীজ উৎপাদন

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ হচ্ছে ভালো ফসল উৎপাদনের পূর্বশর্ত ফসলের জাত যতই ভালো হউক না কেন সজীব ও সতেজ বীজ ব্যবহার না করলে কাঙ্ক্ষিত ফলন আশা করা যায় না। সুতরাং সবজির ফলন বৃদ্ধির জন্য উন্নত মানের বীজের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

নিচে সবজি বীজ উৎপাদনের সহায়ক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কলাকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১) **সবজি ও সবজির জাত নির্বাচন :** স্থানীয় পরিবেশে বীজ উৎপাদন করা যায় এমন সবজি এবং সেই সবজির ভালো জাত নির্বাচন করা উচিত।

২) **ভিত্তি বীজ সংগ্রহ :** নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে ভিত্তি বীজ সংগ্রহ করে বীজ উৎপাদন করতে হয়। ভিত্তি বীজ ব্যতীত অন্য কোনো ধরনের বীজ দিয়ে বীজ উৎপাদন করলে বীজের গুণগত মান বজায় থাকে না।

৩) **জমি নির্বাচন :** সবজি বীজ উৎপাদনের জন্য জমি নির্বাচনের সময় নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়।

ক. পর্যাপ্ত আলো বাতাস পায় এমন জমি;
খ. প্রচুর জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ উর্বর দোআঁশ মাটি এবং
গ. সেচ নিষ্কাশনের সুবিধা আছে এমন জমি।

৪) **আবাদ মৌসুম নির্ধারণ :** বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আবাদ মৌসুম এমনভাবে নির্ধারণ করতে হয় যাতে করে সেই সময় উপযুক্ত আবহাওয়া বিরাজ করে

৫) **জমি তৈরিকরণ :** ভালোভাবে কয়েকটি চাষ দিয়ে জমি সম্পূর্ণ আগাছ মুক্ত করতে হয়। তারপর ঢেলা ভেঙে মাটি নরম ও ঝুরঝুরে করে নিতে হয়। শেষ চাষের সময় মৌল সার মেশাতে হয়।

৬) **সার প্রয়োগ :** বীজ গঠন, পরিপুষ্ট ও ফলন বৃদ্ধি জন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্যোৎপাদনের প্রয়োজন হয় ফসলের বিভিন্ন পর্যায়ে। কাজেই সময়মতো সারের উপরি-প্রয়োগ করতে হয়। বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফসফরাস এবং পটাশিয়াম সার খুবই কার্যকর।

৭) **আবাদ পদ্ধতি :** বীজ ফসল অবশ্য সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে লাই করে চাষাবাদ করতে হয়

৮) **আগাছা দমন :** আগাছা ফসলের সাথে আলো-বাতাস এবং খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করে এবং রোগ ও পোকার আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে তাই সময়মতো আগাছা দমন করতে হয় জমিতে আগাছা থাকলে পরপরাগায়ন ঘটে বীজের চারিত্রিক গুণাবলী নষ্ট করে দিতে পারে।

৯) **সেচ নিষ্কাশন ব্যবস্থা :** সেচ নিষ্কাশন ব্যবস্থা বীজ ফসলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাটিতে পর্যাপ্ত রসের অভাব হলে গাছ ও বীজের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি বিঘ্নিত হয় ফুলের পরাগরেণু শুকিয়ে যায়, বীজ অকালে শুকিয়ে পক্কতা লাভ করে এবং ফলন কমে যায়।

আর অন্যদিকে মাটিতে জলাবদ্ধতা থাকলে বায়ু চলাচল বন্ধ হয়ে গাছের শ্বসন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়, গাছ মরে যায় বীজ চিটা হয় এবং ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের আক্রমণ হয়, তাই সময়মতো সেচ নিকাশ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১০) **রোগ ও পোকার আক্রমণ :** রোগ ও পোকার আক্রমণে বীজে সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হয়। তাই রোগ ও পোকার আক্রমণ রোধকল্পে বিভিন্ন প্রকার প্রতিরোধ এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

১১) রোগিং : বীজ ফসলের জমিতে অন্য সবজি, অন্য জাত এবং একই জাতের দুর্বল, লিকলিকে, রোগাক্রান্ত গাছ জন্মালে সেগুলোকে উঠিয়ে ফেলাকে রোগিং বলে। এগুলো বীজের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করে। তাই সময়মতো বিশেষ করে পরাগায়নের পূর্বেই এগুলোকে উঠায়ে ফেলতে হয়।

১২) **স্বতন্ত্রীকরণ** : বীজের বংশগত বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ কল্পে পরাগায়ণ রোধ করার জন্য বীজ ফসল একটি নির্ধারিত দূরত্বে চাষাবাদ করা হয়। একেই স্বতন্ত্রীকরণ বলে। স্বতন্ত্রীকরণের ফলে বিভিন্ন জাতের মধ্যে পরাগায়ন ঘটে না, ফসল সংগ্রহ কালে বিভিন্ন জাতের মিশ্রণ ঘটে না এবং স্ব-জাতীয় অন্যান্য ফসল থেকে বীজ ফসলে পোকামাকড় ও রোগজীবাণুর বিস্তার ঘটে না। সে কারণে বীজের স্বাস্থ্য ও বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে বীজ ফসলে স্বতন্ত্রীকরণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। দূরত্ব কিংবা সময়ের ব্যবধানে বীজ ফসলে স্বতন্ত্রীকরণ করা যেতে পারে। দূরত্বের ব্যবধানে স্বতন্ত্রীকরণ করার সময় বিবেচনা করতে হয় যে, ফসলটি স্ব-পরাগায়িত না পরপরাগায়িত ফসল। যে সব ফসলে প্রধানত পরপরাগায়ন ঘটে সেগুলোর ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রীকরণ দূরত্ব অধিক হওয়া প্রয়োজন।

বীজ ফসলের মাঝে বাঁধা প্রদানকারী ফসল, দালান-কোঠা অথবা অন্য কোনো বাঁধা থাকলে এ দূরত্ব কিছুটা কমানো যায়। ভুট্টা, সূর্যমুখী কিংবা অন্য কোনো লম্বা ও ঘন ফসলকে বাঁধা প্রদানকারী ফসল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বীজ ফসলে সময়ের ব্যবধানেও স্বতন্ত্রীকরণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ বীজ ফসল রোপণের বেশ পূর্বে অথবা পরে সে জমির আশপাশে অন্য ফসল এমনভাবে উৎপাদন করা উচিৎ যাতে করে বীজ ফসলের সাথে পরপরাগায়ন ঘটার কোনো সুযোগ না থাকে না। আবার অল্প পরিমাণ বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরাগায়নের সময় গ্রিন হাউজ বা এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা করে স্বাতন্ত্রীকরণ করা যেতে পারে। সবজি ফসলের বেলায় সাধারণত ৫০ মিটার থেকে ১০০০ মিটার বা তারও অধিক দূরত্ব পর্যন্ত স্বতন্ত্রীকরণ করা হয়ে থাকে।

১৩) **ছাঁটাইকরণ** : বীজ ফসল চাষাবাদ করার ক্ষেত্রে কিছু অবাঞ্ছিত ডালপালা, শাখা-প্রশাখা সময়মতো কেটে দিলে গাছ সুদৃঢ় ও মজবুত এবং সুস্থ-সবল হয়। এই ধরনের গাছ থেকে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ পাওয়া যায়। শসা, কুমড়া, লাউ ইত্যাদির ক্ষেত্রে গাছের প্রধান ৩-৪টি শাখা রেখে অন্যান্য শাখা-প্রশাখা ছাঁটাই করলে ফল ও বীজের গুণাবলী উন্নত হয়।

১৪) ফল পাতলাকরণ : সাধারণত গাছের গোড়া এবং আগার দিকে ফল রোগা ও ক্ষুদ্রাকৃতির হয়। তাই এগুলোকে উঠায়ে ফেললে মাঝখানের ফলগুলো সঠিক আকার-আকৃতি এবং রঙের হয়। এতে ফলগুলো পরিপুষ্ট হয় এবং ভালো বীজ পাওয়া যায়।

১৫) **বীজ ফসল কর্তন এবং সংগ্রহ** : বীজের গুণাগুণ এবং ফলন নিশ্চিত করতে হলে সঠিকভাবে পরিপক্বতার পর ফসল কর্তন করে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। অপরিপক্ব

অথবা অতি পরিপক্ব ফসল সংগ্রহ করলে বীজের ফলন ও গুণাগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধিকাংশ সবজিতেই সব ফসল বা একই গাছের সব বীজ বা ফল একত্রে পরিপক্বতা লাভ করে না। বিভিন্ন ফসলে বীজের পরিপক্বতার ধরন ও লক্ষণ বিভিন্ন। তাই সঠিকভাবে পরিপক্বতা লাভের বীজ ফসল সংগ্রহ করতে হয়।

১৪.৪. বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বলতে বোঝায় বীজকে খড়কুটা, ধুলাবালি, জড় পদার্থ এবং অন্যান্য বীজের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত করে বীজের মান উন্নয়নের জন্য সংরক্ষণ ও ব্যবহার উপযোগী করা।

প্রথমে বীজকে মৃদু বাতাসে উড়িয়ে বা কুলার সাহায্যে ঝেড়ে ও হাতে বেছে বীজের মধ্যে অবস্থিত খড়কুটা ও ধুলাবালি, কাঁকড়, মাটির ঢেলা এবং অন্যান্য বীজের সংমিশ্রণ দূর করা। পরে বীজকে বিভিন্ন আকার-আকৃতির ছিদ্রযুক্ত চালুনি ও কুলার সাহায্যে চেলে ও ঝেড়ে সঠিক আকার আকৃতির বীজ বের করা হয়।

এরপর বীজকে রোদে শুকাতে হয়। বীজ শুকিয়ে এর জলীয় অংশ একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় নামিয়ে আনতে হয়। কারণ বীজে জলীয় অংশ বেশি থাকলে বীজের মান দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এবং বীজ বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না। বীজ বিভিন্ন প্রকার রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। বীজে জলীয় অংশ ৬-৮% এ কমিয়ে আনতে হয়। সবজি বীজ সরাসরি শুকনো মাটির উপরে চাটাই, মাদুর, চট ও পলিথিনের উপরে বা পাকা মেঝেতে ছড়িয়ে রোদে শুকানো যেতে পারে। প্রখর রোদে বীজ শুকানো ঠিক নয়। শুকানোর সময় বীজ মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করলে সমভাবে শুকায়। ভালোভাবে শুকানোর পরে বীজ ঠাণ্ডা করতে হয়। বীজ শুকালো কি-না তা দাঁত দিয়ে চাপ দিয়ে দেখতে হয়। যদি কটকট শব্দ হয়, তবে বোঝা যাবে যে ভালোভাবে শুকিয়েছে। শুকানো বীজ যে কোনো ধরনের টিনের পাত্রে বা ড্রামে রাখলে ভালো থাকবে।

এছাড়া মোটা পলিথিন ব্যাগে, রঙিন কাচের বোয়েমে বীজ রেখে ভালোভাবে মুখ বন্ধ করে দিতে হয়। বীজ রাখার সময় শুকনো নিমপাতা, বিষকাটালি পাতার গুঁড়া দিলে রোগ ও পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয় না। সংরক্ষিত বীজ মাঝে মাঝে রোদে শুকিয়ে রাখলে তা পরবর্তী মৌসুম পর্যন্ত ভালো থাকে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শাকজাতীয় ফসল

১৫.০. শাকজাতীয় ফসল

বাংলাদেশে নিম্নলিখিত শাকজাতীয় ফসল চাষ করা হয়।

১৫.১. কলমিশাক

কলমিশাক পাতাজাতীয় পুষ্টিকর সবজি। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' রয়েছে। গ্রীষ্মকালে এ সবজি চাষ করে সবজির চাহিদা পূরণ করা যায়।

জাত : কলমিশাকের জাত দু'প্রকার, যথা-

(ক) স্থানীয় কলমি
(খ) গিমা কলমি

জাতের বৈশিষ্ট্য : গিমা কলমি উঁচু জমিতে চাষ করা যায়। সবজি হিসেবে ফসল সংগ্রহের সময় পর্যন্ত গাছ খাড়া থাকে। পাতা পাতার বোঁটা ও কাণ্ড সবুজ ও রসালো হয়। পাতা ৬-৯ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৫-৮ সেন্টিমিটার প্রশস্থ হয়ে থাকে। পাতার বোঁটা ৭-৮ সেন্টিমিটার লম্বা ও ফাঁপা হয়।

মাটি : অধিকাংশ মাটিতে কলমিশাক চাষ করা যায়। তবে দোঁআশ মাটি কলমি চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

আইলের আকার : দৈর্ঘ্যে-২২ মিটার এবং প্রস্থে -৪৫ সেন্টিমিটার।

আইল নির্বাচন : প্রশস্ত আইল। কলমিশাক সামান্য জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

আইল তৈরি : আইলের মাটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাটি ঝুরঝুরে করে সার প্রয়োগ করতে হয়।

সার প্রয়োগের মাত্রা

সার প্রয়োগ সময়	সারের নাম ও পরিমাণ			
	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)
আইল তৈরির সময় বীজ বপনের ৭-১০ দিন পূর্বে	১০	-	৫০	২৫
১ম উপরিপ্রয়োগ চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর	-	৫০	-	-
২য় উপরিপ্রয়োগ চারা গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর	-	৫০	-	-

বীজ হার : প্রতি আইলে ৪০-৫০ গ্রাম।

বীজ বপনের সময় : সারা বছর কলমিশাক চাষ করা যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল এ ফসল চাষের জন্য উপযুক্ত সময়। ফাল্গুন থেকে শুরু করে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত এ ফসল লাগানো হয়।

বীজ বপন : বীজ বপনের আগে বীজ ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। সারিতে প্রতি গর্তে ২-৩টি করে বীজ বপন করতে হয়।

দূরত্ব : গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সেন্টিমিটার।

বীজ বপন গভীরতা : বীজ বপনের গভীরতা ১ থেকে ২ সেন্টিমিটারের মধ্যে রাখা হলে ভালো হয়।

অঙ্কুরোদ্গমের সময় : অঙ্কুরোদ্গমে ৫ থেকে ৬ দিন সময় লাগে।

পরিচর্যা : আইলে আগাছা জন্ম নেয়ার সাথে সাথে তা নিড়ানি দিয়ে দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

সেচ : বর্ষাকালে পানি সেচের প্রয়োজন পড়ে না। তবে অনেক দিন এক নাগাড়ে বৃষ্টি না হলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হয়।

গাছ পাতলাকরণ : চারা গজানোর পর প্রতি মাদায় দুটি চারা রাখতে হয়।

সারের উপরি প্রয়োগ : বীজ গজানোর পর থেকে শুরু করে সবজি কেটে নেয়ার পর নিয়মমতো ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

মাটি আলগাকরণ : সার প্রয়োগের পর তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। এ ছাড়া আইলের মাটির উপরে চটা লেগে গেলে তা ভেঙে দিতে হয়।

ক্ষতিকর পোকা : ইপিলাকনা বিটল এবং বিছাপোকার আক্রমণ দেখা দিলে তা তুলে ফেলে দিতে হয়।

ফসল সংগ্রহ : বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ শুরু করা যায়। এ সময় গাছ উচ্চতায় ৩০-৩৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। প্রথম ফসল সংগ্রহের পর পরই মূল কাণ্ড থেকে একাধিক শাখা বের হয়।

অনুকূল পরিবেশ এবং উপযুক্ত পরিচর্যার সবজি প্রথম সংগ্রহের দিন থেকে পরবর্তীতে প্রতি ১০-১৫ দিন পর পর ফসল সংগ্রহ করা যায়। একবার বীজ বপন করলে এমনিভাবে কমপক্ষে ৪-৫ বার সবজি সংগ্রহ করা যায়। সবজি আহরণের সময় গাছগুলো মাটি থেকে ২-৩ সেন্টিমিটার কাটতে হয়।

ফলন : প্রতি আইলে ২০-২৫ কেজি ফলন পাওয়া যায়।

১৫.২. পালংশাক

পালংশাক অধিক ভিটামিনসমৃদ্ধ পাতা সবজি। বাংলাদেশে শীতকালে এর চাষ করা হয়।

পালংশাকের জাত

ক. পুষা জয়ন্তী
খ. কপি পালংক

গ. গ্রিন
ঘ. সবুজ বাংলা
ঙ. টক পালংক

মাটি : দোআঁশ উর্বর মাটি বেশি উপযোগী।

আইলের আকার : দৈর্ঘ্যে ২২ মিটার এবং প্রস্থে ৪৫ সেন্টিমিটার।

আইল নির্বাচন : উঁচু আইল পালংশাক চাষের জন্য নির্বাচন করতে হয়। এতে কিছুটা আগাম পালংশাক বপন করা যায়।

আইল তৈরি : কোদাল দিয়ে আইলের মাটি কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাটি তৈরি করতে হয়।

সার প্রয়োগ : প্রতি আইলে (২২×০.৪৫ মিটার) সারের পরিমাণ

সার প্রয়োগ সময়	সারের নাম ও পরিমাণ			
	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)
আইল তৈরির সময় বীজ বপনের ৭-১০ দিন পূর্বে	১০	-	৫০	৩০
১ম উপরিপ্রয়োগ চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর	-	১০০	-	-
২য় উপরিপ্রয়োগ চারা গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর	-	১০০	-	-

বীজ বপনের হার : প্রতি আইলে ৩৫-৪০ গ্রাম।

বীজ বপনের সময় : সেপ্টেম্বর-জানুয়ারি মাস।

দূরত্ব : গাছ থেকে গাছ ১০ সেন্টিমিটার দূরে বপন করতে হয়।

বীজ বপন : বীজ বপনের পূর্বে বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে নিতে হয়। ছিটিয়ে বীজ বোনা যায়।

অঙ্কুরোদ্গমের সময় : বীজ বপনের পর অঙ্কুরোদগমে প্রায় ৭-৮ দিন সময় লাগে।

বীজ বপন বা চারা রোপণ : আইলে সরাসরি বীজ ছিটিয়ে বা গর্ত তৈরি করে মাদায় বীজ বপন করা যায় অথবা বীজতলায় চারা তৈরি করে চারা রোপণ করে পুঁইশাক চাষ করা যায়। বীজ বপনের পূর্বে বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত তৈরি করে প্রতি মাদায় ২-৩টি করে বীজ বপন করতে হয়

পরিচর্যা : আইলে আগাছা দেখা দিলেই তা তুলে ফেলতে হয়।

সার উপরিপ্রয়োগ : সময়মতো সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

সেচ প্রয়োগ : এ শাকের জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। সারের উপরিপ্রয়োগের আগে মাটির 'জো' অবস্থা বুঝে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। চারা রোপণের পর হালকা সেচ দেয়া প্রয়োজন।

শূন্যস্থান পূরণ : কোনো স্থানের চারা মরে গেলে অথবা বীজ না গজালে সেখানে ৭-১০ দিনের মধ্যে পুনরায় চারা রোপণ করতে হয়।

মাটি আলগাকরণ : গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য মাটিতে বেশি দিন রস ধরে রাখা এবং মাটিতে যাতে আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেজন্য প্রতিবার পানি সেচের পর মাইলের উপরের স্তরের মাটি আলগা করে দিতে হয়।

গাছ পাতলাকরণ : বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় ২টি করে চারা রেখে অতিরিক্ত চারা উঠিয়ে ফেলতে হয় বা অতিরিক্ত চারা ফাঁকা জায়গায় রোপণ করতে হয়

ক্ষতিকর পোকামাকড় : মাঝে মাঝে পিঁপড়া উরচুঙ্গা উইপোকা এবং পাতা ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়। আক্রমন হলে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হয়

রোগ দমন : পুঁইশাকের প্রধান রোগের মধ্যে রয়েছে–

(১) গোড়া পচা রোগ
(২) পাতার দাগ রোগ
(৩) পাতা ধসা রোগ

এসব রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ বা পাতা তুলে ফেলতে হয় এবং সেখানে গাছ পুনরায় রোপণ করতে হয়।

ডাউনি মিলডিউ : পাতার উপরিভাগে হলদে দাগ দেখা দেয়। পরে পাতার উল্টা দিকে দাগের নিচে ধূসর ছত্রাক জন্মে। দাগ আকারে বাড়তে থাকে এবং পাতা কালচে হয়ে মরে যায়।

পাতায় দাগ : পাতায় খুব ছোট ধূসর বাদামি দাগ পড়ে। এই দাগের কিনারা লালচে বাদামি রঙের হয়। ধীরে ধীরে এ রোগ পাতা থেকে পাতার বোঁটায় এবং ডাঁটায় সংক্রমিত হয়ে থাকে।

ফসল সংগ্রহ : বীজ বপনের এক মাস পর থেকে পালং শাক সংগ্রহ শুরু করা যায় এবং গাছে ফুল না আসা পর্যন্ত যে কোনো সময় সংগ্রহ করা যায়।

ফলন : প্রতি আইলে ৮-১০ কেজি।

১৫.৩. পুঁইশাক

পুঁইশাক এ দেশের জনপ্রিয় পুষ্টিকর শাক। পুঁইশাকের পাতা ও ডাটা পুষ্টিকর। এটি একটি গ্রীষ্মকালীন পাতাজাতীয় সবজি। এতে ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে।

পুঁইশাকের জাত : আমাদের দেশে সাধারণত পুঁইশাকের দু'ধরনের জাত দেখতে পাওয়া যায়। যথা–

ক. সবুজ পুঁইশাক : পাতা ও কাণ্ড সবুজ।
খ. লাল পুঁইশাক : পাতা ও কাণ্ড লালচে।

মাটি : উর্বর দোআঁশ মাটি ও বেলে দোঁআশ মাটি পুঁইশাক চাষের জন্য উপযোগী।

আইলের আকার : দৈর্ঘ্যে ২২ মিটার এবং প্রস্থে ৪৫ সেন্টিমিটার।

আইল নির্বাচন : উঁচু ধরনের আইল যেখানে জলাবদ্ধতা দেখা যায় না এমন আইল উপযোগী।

আইল তৈরি : আইলের মাটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাটি নরম ও ঝুরঝুরে করতে হয়। আইলের ধরন যদি উঁচু হয়, তবে নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত তৈরি করে মাদায় বীজ বপন করে অথবা চারা রোপণ করে পুঁইশাক চাষ করা যায়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ : আইল প্রতি নিম্নবর্ণিত হারে সার প্রয়োগ করতে হয়

সার প্রয়োগ সময়	সারের নাম ও পরিমাণ			
	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)
আইল তৈরির সময় বীজ বপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	১০	-	৫০	২৫
১ম উপরিপ্রয়োগ চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর	-	৫০	-	-
২য় উপরিপ্রয়োগ চারা গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর	-	৫০	-	-

বীজ বপনের হার : প্রতি আইলে ১০-১৫ গ্রাম।

বীজ বপনের সময় : ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস

দূরত্ব : গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০ সেন্টিমিটার।

বীজ বপনের গভীরতা : ২-৩ সেন্টিমিটার।

অঙ্কুরোদ্গমের সময় : ৫-৬ দিন।

বীজ বপন পদ্ধতি : পুঁইশাকের ডাঁটা বীজ আইলে ছিটিয়ে বপন করা হয়। বীজ বপনের সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেন বীজ মাটির বেশি নিচে না পড়ে। ডাঁটার বীজের আকার ছোট বলে, বীজ বপনের পূর্বে মাটি গুঁড়া অথবা বালি ১ঃ৯ অনুপাতে বীজের সাথে মিশিয়ে নিলে ভালো হয়। সারি বা লাইনে বীজ বুনলে ২০-২৫ সেন্টিমিটার দূরে কাঠির সাহায্যে ১-১.৫ সেন্টিমিটার গভীর সারি টানতে হয়। তারপর উক্ত লাইনে বীজ বুনে কাঠি বা হাত দিয়ে নালা বন্ধ করে দিতে হয়।

বীজ বপনের হার : বীজকালের পর অঙ্কুরোদ্গমে ৪-৫ দিন সময় লাগে।

বীজ বপনের সময় : রবি মৌসুমে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস) খরিফ মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস)

অঙ্কুরোদ্গমের সময় : ৪-৫ দিন

বীজ বপনের গভীরতা : ১-২ সেন্টিমিটার গভীরতায় বীজ বপন করতে হয়।

পরিচর্যা : আইলে চারা গাছের বয়স ১৫-২০ দিন হলে আইল আগাছামুক্ত রাখতে হয়। বৃষ্টিপাত বা পানি সেচের পর আইলের উপরের মাটি শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। এজন্য উপরের শক্ত মাটি নিড়ানির মাধ্যমে ভেঙে ঝুরঝুরে করে দিতে হয়।

সেচ : বীজ গজানোর সময় মাটিতে রসের পরিমাণ কম হলে হালকা সেচ দিতে হয়। এছাড়া আইলের মাটি জো অবস্থা বুঝে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হয়।

গাছ পাতলাকরণ : বীজ গজানোর পর চারা গাছের বয়স ১০-১৫ দিন হলে ১৫ সেন্টিমিটার দূরে একটি করে গাছ রেখে বাকি শাক হিসেবে তুলে পাতলা করে দিতে হয়। প্রথমবার গাছ পাতলাকরণ করার পর আবার ১০-১৫ দিন পর আরেকবার ডাঁটাশাক তুলে পাতলা করে দিতে হয়। এভাবে তুলে শাক বাজারে বিক্রি করা যায় এবং রান্না করে খাওয়া যায়।

ক্ষতিকর পোকামাকড় : পুঁইশাকের ক্ষতিকর পোকার মধ্যে শুঁয়াপোকা উল্লেখযোগ্য। এ পোকা ডাঁটা গাছের পাতা ও কচি ডগা খেয়ে ক্ষতি করে থাকে।

ফসল সংগ্রহ : বীজ বপনের ৫০-৬০ দিন পর থেকে পুঁইশাক সংগ্রহ শুরু করা যায়। মাটির উপরে ১২-১৫ সেন্টিমিটার রেখে বাকি অংশে ফসল হিসেবে সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে শাখা-প্রশাখাসমূহ ৫-১১টি পাতা গজালে পালংশাক সংগ্রহের উপযোগী হয়।

ফলন : প্রতি আইলে ২০-২৫ কেজি।

১৫.৪. ডাঁটা

ডাঁটা বাংলাদেশের একটি প্রধান পাতা সবজি এটি বর্ষজীবী উদ্ভিদ। সারা বছরই বিশেষ করে বর্ষাকালে সবজির চাহিদা মিটাতে এর অবদান যথেষ্ট। এর কাণ্ড শাখা-প্রশাখা ও পাতা সবজিরূপে ব্যবহৃত হয়। ডাঁটায় ক্যারোটিন, ভিটামিন 'সি' আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও পটাসিয়াম রয়েছে।

ডাঁটার জাত : ডাঁটার জাতসমূহের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো।

(১) প্রেয়সী (২) বাসপাতা
(৩) কাটুয়া (৪) আম্রনী
(৫) সুরেশ্বরী (৬) ছত্রভোগ
(৭) রূপসী

জাতের বৈশিষ্ট্য : বাঁশপাতা ডাঁটায় কোনো শাখা প্রশাখা হয় না। অন্যদিকে কাটুয়া ডাঁটায় বেশ কাটি ডালপালা হয়ে থাকে।

মাটি : বেলে দোঁআশ থেকে এঁটেল দোঁআশ মাটি ডাঁটা চাষের জন্য উপযোগী।

আইলের আকার : দৈর্ঘ্য ২২ মিটার এবং প্রস্থ ৪৫ সেন্টিমিটার

আইল নির্বাচন : মধ্যম চওড়া ধরনের উঁচু আইল বেশি উপযোগী

আইল তৈরি : আইল কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাটি নরম করতে হয়। আইলে কোনো ঢেলা রাখা যাবে না। কারণ বীজ ক্ষুদ্র বিধায় ঢেলার নিচে পড়লে বীজ গজাতে পারে না।

সারের পরিমাণ : আইল প্রতি নিচে উল্লেখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	পরিমাণ
গোবর	১০ কেজি
ইউরিয়া	১৫০ কেজি
টিএসপি	৭৫ গ্রাম
এমপি	১০০ গ্রাম

সার ব্যবহারের নিয়ম : আইল তৈরির সময় সব গোবার, টিএসপি এবং এমপি সার আইলের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। সার বীজ বপনের ১০-১৫ দিন পরপর দুই কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের পর মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয় এবং পানি সেচ দিতে হয়।

বীজ বপন হার : প্রতি আইলে ৫ গ্রাম বীজ বপন করতে হয়।

বীজ বপন সময় : সারা বছরই ডাঁটাশাক চাষ করা যায়। তবে শীতকালে ভালো জন্মে। বীজ একবারে না বুনে ৩-৪ সপ্তাহ পরপর আইলে কয়েক দফায় বুনলে সব সময় তাজা শাক উৎপাদনের সুযোগ থাকে।

বপন পদ্ধতি : বীজ আইলের মাটির উপরিভাগে ছিটিয়ে বপনের পর হালকা করে মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয়। ডাঁটাশাকের বীজ আকারে ছোট ও পিচ্ছিল বলে বপনের পূর্বে বীজের সাথে শুকনো গুঁড়া মাটি ১:৯ মিশিয়ে নিতে হয়।

অঙ্কুরোদ্গমের সময় : ৪-৫ দিন

বীজ বপনের গভীরতা : বীজ বপনের গভীরতা ১-২ সেন্টিমিটার।

আগাছা দমন : লালশাকের বীজ গজানোর সাথে সাথে আগাছাও জন্মে। তাই শাকের ২-৩টি পাতা গজানোর পর হাত দিয়ে ছোট ছোট আগাছা তুলে ফেলতে হয়।

সেচ : আইলের মাটি জো অবস্থা ধরে রাখার জন্য পানি সেচ দিতে হয়। বীজ গজানোর সময় পর্যন্ত মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকতে হয়।

মাটি আলগাকরণ : সেচ প্রয়োগের ফলে বা বৃষ্টির কারণে মাটির উপরিভাগ শক্ত করে চটা বাধতে পারে। এতে শাকের গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এজন্য মাঝে মাঝে চটা ভেঙে দিয়ে মাটি আলগা করতে হয়।

গাছ পাতলাকরণ : অতিরিক্ত ঘন হয়ে চারা গজালে ২-৪টি পাতা অবস্থাতেই কিছু চারা উঠিয়ে ফেলতে হয়। এরপর চারা যত বড় হতে থাকে শাক হিসেবে মাঝে মাঝে তা উঠিয়ে পাতলা করে দিতে হয়।

মরিচা রোগ : এ রোগ ডাঁটা গাছের শিকড় ব্যতীত আর সকল অংশেই আক্রমণ করে। এ রোগের আক্রমণের ফলে পাতার নিচে সাদা অথবা হলুদ দাগ দেখা যায়। পরে দাগগুলো লালচে বা মরিচা রঙ ধারণ করে ও পাতা মরে যায়।

গোড়া পচা ও শিকড় পচা রোগ : এ রোগের আক্রমণে ডাঁটা গাছের মাটির সংলগ্ন কাণ্ড ও শিকড় পচে যায়। ফলে গাছ মরে যায়।

ফসল সংগ্রহ : বীজ বোনার ২০-২৫ দিন পর শাক খাওয়া যায়। শাক হিসেবে এক থেকে দেড়মাস পর খাওয়া যায়। তবে গাছে ফুল বা আঁশ হওয়ার আগেই ডাঁটা সংগ্রহ করা দরকার।

ফলন : প্রতি আইলে ২৫-৩০ কেজি ফলন পাওয়া যায়।

১৫.৫. লালশাক

লালশাক একটি নরম বর্ষজীবী উদ্ভিদ। এটি পাতা জাতীয় একটি সবজি, পুষ্টিকর, রঙ লাল রঞ্জক ক্লোরোফিলের উপস্থিতির জন্য এর কাণ্ড ও পাতা লাল বর্ণের হয়ে থাকে। লালশাকে ভিটামিন এ,বি,সি এবং ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ও পটাসিয়াম রয়েছে।

লালশাকের জাত

(১) আলতা
(২) বারি লালশাক-১
(৩) পিংকি কুইন
(৪) রক্তলাল

(১) বারি লালশাক-১ : পাতা ও কাণ্ড উজ্জ্বল লাল কাণ্ড নরম। প্রতি গাছে ১৫-২০টি পাতা থাকে। গাছের ওজন ১০-১৫ গ্রাম।

মাটি : অধিকাংশ মাটিতে লালশাক চাষ করা যায়। বেলে দোঁআশ থেকে দোঁআশ মাটি বেশি উপযোগী।

আইলের আকার : দৈর্ঘ্য ২২ মিটার এবং প্রস্থ ৪৫ সেন্টিমিটার।

আইল স্থান নির্বাচন : মধ্যম চওড়া ধরনের আইল বেশি উপযোগী। পানিতে ডুবে না এবং মাটি স্যাঁতসেঁতে থাকে না এমন আইলে লালশাক চাষ করা লাভজনক।

আইল তৈরি : কোদাল দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাটি ঝুরঝুরে করতে হয়। বীজের আকার ছোট বলে মাটি খুব ভালোভাবে তৈরি করতে হয়।

সারের পরিমাণ : আইল প্রতি নিচে উল্লেখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হয়

সারের নাম	পরিমাণ
সুষম কমপোস্ট	১০ কেজি
ইউরিয়া	৮০ কেজি
টিএসপি	৪০ গ্রাম
এমপি	৪০ গ্রাম

সার ব্যবহারের নিয়ম : আইল তৈরির সময় সব কমপোস্ট, টিএসপি এবং এমপি সার আইলের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। চারার বয়স ১০-১২ দিন পর থেকে দু'সপ্তাহ

পর পর ইউরিয়া সার দুই কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হয়। সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। এছাড়াও এক লিটার পানিতে ১০ গ্রাম করে ইউরিয়া মিশিয়ে তরল আকারে স্প্রে করা যায়।

মরিচা রোগ : এ রোগ শাক গাছের শিকড় ছাড়া আর সকল অংশকেই আক্রমণ করে এ রোগের আক্রমণের ফলে সাদা অথবা হলুদ দাগ পাতার নিচে দেখা যায়। পরে দাগগুলো মরিচা রঙ ধরে পাতা মরে যায়। এ রোগ ব্যাপক আকারে দেখা দিলে সম্পূর্ণ শাক গাছ তুলে ফেলাই ভালো।

ফসল সংগ্রহ : বীজ বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে শাক সংগ্রহ শুরু করা যায়। দীর্ঘ সময় অর্থাৎ ফুল আসার আগ পর্যন্ত ফসল সংগ্রহ করা চলে।

ফলন : প্রতি আইলে ৫-৭ কেজি ফলন পাওয়া যায়।

ষোড়শ অধ্যায়

মসলাজাতীয় ফসল

১৬.০. মসলাজাতীয় ফসল

মসলাজাতীয় ফসলের মধ্যে যেগুলো আমাদের দেশে চাষ করা হয়ে থাকে সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১৬.১. মরিচ

মোট উৎপাদন বিবেচনায় মরিচ বিশ্বের একটি শীর্ষস্থানীয় মসলা ফসল। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মরিচের চাষ হয়, তবে গ্রীষ্মপ্রধান এলাকাতেই এর চাষ ও ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশি। মরিচ বাংলাদেশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় মসলা। দৈনন্দিন খাদ্য তৈরিতে মরিচ ছাড়া আমাদের চলেই না। আন্তর্জাতিক বাজারে মরিচের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। মরিচ রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও সম্ভব, কিন্তু আমাদের দেশ এদিক দিয়ে এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যদিও বাংলাদেশ থেকে কিছু মরিচ রপ্তানি হয়, আবার কিছু মরিচ আমদানিও করা হয়।

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই কম-বেশি মরিচের চাষ হয়, তবে বগুড়া, চাঁদপুর ও খুলনা জেলা মরিচ চাষের জন্য বিখ্যাত। বাংলাদেশে প্রায় ৬৬ হাজার হেক্টর জমি থেকে গড়ে বার্ষিক ৫২,০০০ টন শুকনা মরিচ উৎপাদন হয়। সারণি-১ এ বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে মরিচ চাষাবাদের পরিসংখ্যান উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণি ১ : বাংলাদেশে মরিচ চাষাবাদের পরিসংখ্যান

বছর	মরিচ চাষের আওতায় জমির পরিমাণ (হেক্টর)	মোট উৎপাদন (শুকনা) (টন)
১৯৮৯-৯০	৭১,৬৬০	৫১,০০০
১৯৯১-৯২	৬৭,২০৭	৫১,০০০
১৯৯৪-৯৫	৬৬,৩৯৬	৫৩,০০০
১৯৯৫-৯৬	৬৫,৯৯২	৫২,০০০

সূত্র : বিবিএস-১৯৯৭

মরিচ উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যানে মরিচের আওতায় জমির পরিমাণ একদিকে যেমন কমে যেতে দেখা যাচ্ছে অপরদিকে উৎপাদনেও স্থবিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। পুরাতন জাতের আবাদ ধরে রাখার প্রবণতা, পক্ষান্তরে আধুনিক জাতের সম্প্রসারণ না হওয়া, প্রতিকূল আবহাওয়া, ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি মরিচ চাষের আধুনিক কলাকৌশল সম্পর্কে চাষীদের

উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব থাকায় মরিচ চাষে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে যা উৎপাদনের উপর ক্রমশ বিরূপ প্রতিক্রিয়া রাখছে।

মরিচ অধিকাংশ ব্যঞ্জনের একটি উপাদান এবং অর্থকরী ফসলের অন্যতম। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এটি দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মায়। আমেরিকা আবিষ্কারের পরে কলম্বাস ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মরিচের বীজ স্পেনে আনেন। বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান, পূর্ব আফ্রিকা, জাঞ্জিবার, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, স্পেন, চীন, মায়ানমার ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, ফিলিপাইন, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোতে প্রচুর মরিচ উৎপাদিত হয়।

মরিচের উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ আমেরিকা হলেও মরিচের ব্যবহার এই উপমহাদেশের সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। উন্নত বিশ্বে মরিচ কাঁচা সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হলেও আমাদের দেশে এর প্রধান ব্যবহার হয় মসলা হিসেবে। তবে কিছু পরিমাণ মরিচ আচার, চাটনি এবং সবুজ সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও কোনো কোনো অঞ্চলে মরিচ গাছের পাতা শাক হিসেবে খাওয়া হয়। সবুজ ও লাল মরিচ ভিটামিনের একটি ভালো উৎস এবং একটি অর্থকরী ফসল।

১৬.১.১. মরিচের উদ্ভিদতত্ত্ব, গোত্র ও প্রজাতি

মরিচ Solanaceae বা বেগুন গোত্রের সদস্য। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Capsicum* spp.। ইংরেজি নাম Chilli বা Pepper। অঞ্চলভেদে এর বিভিন্ন নামও রয়েছে যেমন- লঙ্কা, পোড়্যা, ঝাল, মিরচি, ধানী ইত্যাদি। মরিচের উদ্ভিদতাত্ত্বিক ভিন্নতা এত বেশি যে, বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এ বিষয়ে এখনও মতদ্বৈততা রয়েছে। তবে ১৯৫৩ সালে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী Heiser and Smith মরিচের সব কয়টি জাতকে যে ৬টি প্রজাতিতে ভাগ করেন, অধিকাংশ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী তা সমর্থন করেছেন। নিচে প্রজাতিগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো।

Capsicum annum : ফুলের পাঁপড়ি সাদা, ফলের দৈর্ঘ্য আধ ইঞ্চি হতে ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। শীত প্রধান অঞ্চলে উৎপাদিত বৃহদাকার ফলধারী ঝাল ও ঝালবিহীন সকল জাতই এই প্রজাতিতে পড়ে। জাতের সংখ্যা ও উৎপাদন বিবেচনায় এটি বৃহত্তম প্রজাতি এবং এর সব জাতই বর্ষজীবী।

Capsicum frutescens : ফুলের পাঁপড়ি হলুদাভ সাদা, ফলের দৈর্ঘ্য ২-৩ সেন্টিমিটার এবং উর্ধ্বমুখী, মরিচ অত্যন্ত ঝাল। গাছ সাধারনত দীর্ঘজীবী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই প্রজাতির চাষ বেশি হয়। আমাদের দেশে ধানী মরিচ বলে পরিচিত জাত এই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত।

Capsicum pendulum : ফুলের পাঁপড়ি সাদা তবে গলার দিকে হলুদ বা বাদামি দাগ থাকে। পুংকেশর উজ্জ্বল হলুদ। কাঁচা অবস্থায় মরিচের রঙ সাদা অথবা হলুদ হয়ে থাকে এবং এরা অত্যন্ত উচ্চ ফলনশীল। দক্ষিণ আমেরিকা এবং পেরুতে এই প্রজাতির চাষ বেশি জনপ্রিয়।

Capsicum pubescence : এই প্রজাতির পাতা কোঁকড়ানো এবং লোমশ, ফুল নীলাভ বেগুনি, ফলের ত্বক বেশ পুরু। উঁচু পার্বত্য এলাকায় এর চাষাবাদ সীমাবদ্ধ

Capsicum chinense : মরিচটি অত্যধিক ঝাল, প্রধানত দক্ষিণ আমেরিকায় চাষ হয়। আমাদের দেশের কামরাঙ্গা মরিচ এই প্রজাতির অন্তর্ভূক্ত।

Capsicum cardenasi : মরিচ ক্ষুদ্র গোলাকার, অত্যন্ত ঝাল, বলিভিয়াতে এই প্রজাতি বেশি দেখা যায়। আমাদের দেশের বিন্দি মরিচ এ প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত।

১৬.১.২. মরিচের ব্যবহারিক শ্রেণিবিভাগ

ব্যবহারিক কিংবা ঝালের দিক হতে মরিচকে দুই ভাগে করা যায়। যথা–

ক. ঝাল মরিচ : বিভিন্ন প্রাচ্য দেশ এবং দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার ঝাল মরিচের যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে. বাংলাদেশী ঝাল মরিচের মধ্যে ছোট মরিচ, বড় মরিচ, পাটনাই, ধানী মরিচ, কামরাঙা মরিচ, কালো মরিচ, সূর্যমুখী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদ্রাকৃতির ঝাল মরিচকে গুড়া করে বাণিজ্যিকভাবে রেড পিপার তৈরি হয়. ঝাল মরিচকে লবণ গোলা পানি কিংবা কড়া ভিনেগার দ্বারা সংরক্ষণ করলে পিপার সস তৈরি হয়। প্রায় ঝালবিহীন হাংগেরিয়ান প্যাপরিকা ও স্পেনিশ প্যাপরিকাজাতীয় (paprika) মরিচ গুড়া করে গুড়া মশলা তৈরি করা হয়. মরিচে ক্যাপসিসিন নামক পদার্থের উপস্থিতি একে ঝাল করে।

খ. মিষ্টি মরিচ : মিষ্টি মরিচ সচরাচর আকারে বড়, মোটা-সোটা পুরু শাঁসবিশিষ্ট হয়। এই মরিচ কামরাঙা মরিচ (Bell-Pepper) নামে অভিহিত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মিষ্টি মরিচ জাত হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া ওয়ান্ডার, ওয়ার্ল্ড বিটার, চাইনিজ, জায়েন্ট, নেপোলিটান (Neapolitan) এবং রুবি কিং খুবই পুরু শাঁসবিশিষ্ট পিমিয়েন্টো (Pimiento) বা স্পেনিশ পিপার, এর প্রধান উপজাত পর্টোকেশার ও যুক্তরাষ্ট্রের মরিচের অধিকাংশই মিষ্টি মরিচ। মিষ্টি মরিচ প্রধানত সালাদরূপে ব্যবহৃত হয়।

মিষ্টি মরিচ আসলে মিষ্টি নয়, বরং ক্যাপসেইসিনের অনুপস্থিতির কারণে ঝালবিহীন পুরুত্বকবিশিষ্ট প্রায় গোলাকার ও লম্বাটে সবজি মরিচ। মিষ্টি মরিচ সাধারণত রোপণ পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। ক্যাপসিকাম, চাইনিজ জায়েন্ট, বেলবয় ইত্যাদি প্রায় গোলাকার জাত এবং স্লিমপিস, হাংগেরিয়ান ইয়েলো ওয়াক্স ইত্যাদি লম্বাটে জাতের মিষ্টি মরিচ বাংলাদেশে চাষ হয়।

ফলন : কাঁচা ২০-২৫.০ টন/হেক্টর।

গ. হাইব্রিড মরিচ : বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু হাইব্রিড জাতের মরিচের প্রচলন হয়েছে যদিও তা প্রাথমিক পর্যায়েই রয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হাইব্রিড জাতের মরিচের পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

গ.১. ম্যারাথন : উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড মরিচ, কাঁচা অবস্থায় চকচকে, গাঢ় সবুজ রঙের মরিচ আকারে প্রায় ১০ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমেই চাষ করা যায়। রোপণের ৫০-৬০ দিনের মধ্যে কাঁচা মরিচ সংগ্রহ করা যায়।

ফলন : কাঁচা ১৫.০-১৮.০ টন/হেক্টর ও শুকনা : ২.০-৩.০ টন/হেক্টর।

গ.২. পেলিটা : উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড মরিচের জাত, বারোমাস চাষযোগ্য, আকার ছোট, প্রায় ৪ সেন্টিমিটার লম্বা, ফল ধারণ উর্ধ্বমুখী প্রকৃতির, প্রচণ্ড ঝাল। হালকা

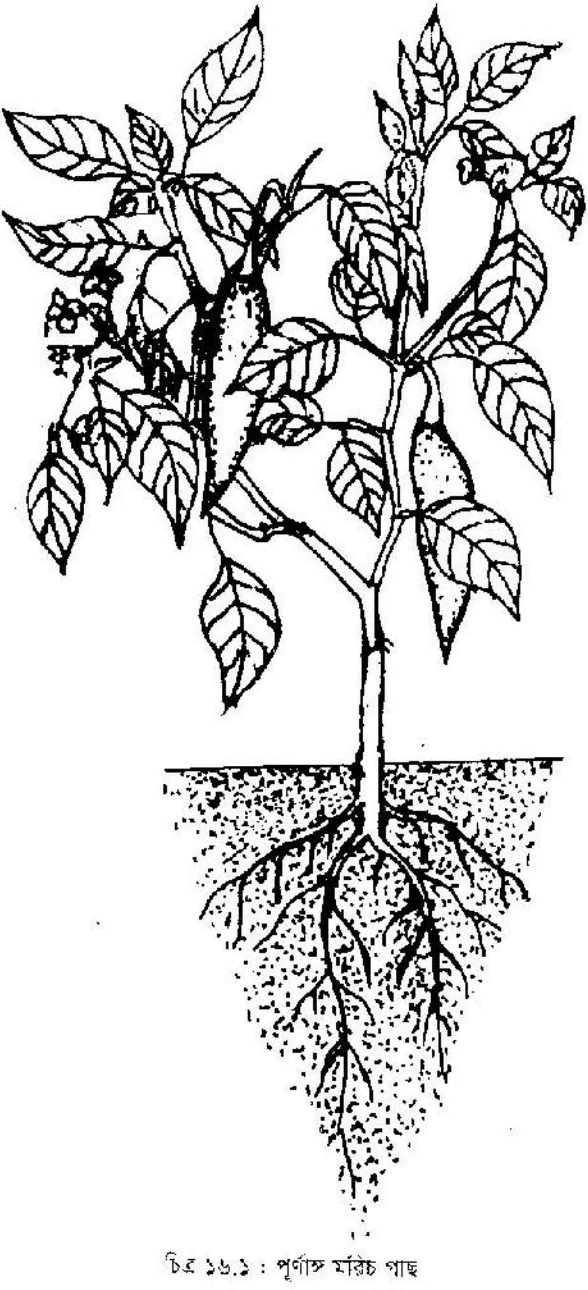

চিত্র ১৬.১ : পূর্ণাঙ্গ মরিচ গাছ

সবুজ, চকচকে মসৃণ মরিচ। শীতকালে রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর এবং গ্রীষ্মকালে ৪০-৪৫ দিন পর কাঁচা মরিচ সংগ্রহ করা যায়।

ফলন : কাঁচা ১২.০-১৪.০ টন/হেক্টর ও শুকনা : ২.০-২.২ টন/হেক্টর।

গ.৩. **যমুনা :** মরিচের হাইব্রিড জাত। মরিচ লম্বায় ১৩-১৫ সেন্টিমিটার দেখতে আকর্ষণীয়, বাজারে বেশ চাহিদা রয়েছে, কাঁচা ও শুকনা উভয় মরিচই ঝাল। সারা বছরই চাষ করা যায়। রোপণের ৭০ দিন পর থেকে কাঁচা মরিচ সংগ্রহ করা যায়। একবার মরিচ উঠানোর পর আবার পূর্ণমাত্রায় মরিচ আসে।

ফলন : কাঁচা ১২.০-১৫.০ টন/হেক্টর ও শুকনা : ২.৫-৩.০ টন/হেক্টর।

গ.৪. **বি.এস.এস-১৪১** : সারা বছর আবাদযোগ্য হাইব্রিড জাত। মরিচ ১৪-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা। লাল টকটকে রঙের কারণে বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে কাঁচা ও শুকনা উভয় অবস্থায় প্রচণ্ড ঝাল। বহু শাখাবিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেন্টিমিটার। ফল ধারণ নিম্নমুখী। ৮-৯ বার মরিচ তোলা যায়

ফলন : কাঁচা ১৫.০-১৮.০ টন/হেক্টর ও শুকনা : ২.০-৩.০ টন/হেক্টর।

এস.এইচ.পি.এইচ (৬১ ও ১২০) : দীর্ঘ আকৃতির মরিচের দুটি হাইব্রিড জাত। কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ এবং পাকা অবস্থায় টকটকে লাল রঙ ধারণ করে। মরিচের দৈর্ঘ্য ১২-১৩ সেন্টিমিটার। তীব্র ঝাল এ মরিচ ৮-৯ বার তোলা যায়।

ফলন : কাঁচা ১৫.০-১৮.০ টন/হেক্টর ও শুকনা : ২.৫-৩.০ টন/হেক্টর।

অগ্নিকন্যা : নামেই যার পরিচয়। তীব্র ঝাল স্বাদের হাইব্রিড মরিচের জাত গাছ বেশ বড় হয়। ফল ১২-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা, চকচকে সবুজ রঙ এবং ঝালের কারণে বাজারে এর চাহিদা প্রচুর দীর্ঘদিন একটানা মরিচ পাওয়া যায়

ফলন : কাঁচা ১১.০-১৪.০ টন/হেক্টর ও শুকনা : ২.০-২.২টন/হেক্টর।

১৬.১.৩ মরিচের পুষ্টিমান

মরিচে যথেষ্ট পরিমাণ আমিষ, শর্করা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন রয়েছে। অনেক জাতে 'ক্যাপসিসিন' ($C_{18} H_{27} O_3 N$) নামক উপাদান প্লাসেন্টাল টিস্যুতে বিদ্যমান থাকায় মরিচ ঝাল হয়ে থাকে। ঝাল মরিচ কাঁচা ও পাকা অবস্থায় প্রধানত মসলা হিসেবে ব্যবহার হয় এছাড়া মিষ্টি ও ঝাল উভয় শ্রেণীর মরিচ কাঁচা অবস্থায় সালাদ ও সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। মরিচ ও মরিচের নির্যাস থেকে শক্তিশালী ভিনেগার, রিয়ার, রেডপেপার, পোলট্রি খাদ্য, ওষুধ ইত্যাদি তৈরি হয় একটি গবেষণার ফলাফলে জানা যায় যে, মরিচ থেকে তৈরি এক ধরনের ক্রিম ক্যান্সার ব্যাথা নিরাময়ে ফলদায়ক হয়েছে। মরিচের প্রতি ১০০ গ্রাম হিসেবে খাদ্যের গ্রহণীয় অংশে পুষ্টির বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ সারণি-২ এ দেয়া হলো।

সারণি ২ : মরিচের পুষ্টিমান

পুষ্টি উপাদান	একক	কাঁচা মরিচ	পাকা মরিচ
পানি	গ্রাম	৮৩	১০
প্রোটিন	গ্রাম	৩	১৫
শ্বেতসার	গ্রাম	৬	৩৩
আঁশ	গ্রাম	৭	৩০
স্নেহ	গ্রাম	০.৬	১১
থায়ামিন	মিলি গ্রাম	০.০৬	০.৬
রাইবোফ্ল্যাভিন	মিলি গ্রাম	০.০৮	০.৫
নিয়াসিন	মিলি গ্রাম	১.০	১২.০
ক্যারোটিন (সিদ্ধপূর্ব)	মিলি গ্রাম	২.৩৪	-
ভিটামিন এ	আইঃ ইউঃ	২০,০০০	২০,০০০
ভিটামিন সি	মিলি গ্রাম	২৮০	৫০

সূত্র : রশীদ, এম. এম.। বাংলাদেশের সবজি চাষ

১৬.১.৪. মরিচ গাছের উদ্ভিদতাত্ত্বিক গঠন

মরিচ একটি দীর্ঘজীবি ঝোপালো উদ্ভিদ। যদিও জলবায়ুগত কারণে অধিকাংশ স্থানেই বর্ষজীবী হিসেবে মরিচের চাষ হয়।

শিকড় : মরিচের শিকড় প্রণালী সম্প্রসারণশীল এবং জাতভেদে মাটির তিন-চার ফুট জায়গা জুড়ে বিস্তৃত থাকে।

কাণ্ড : মরিচের কাণ্ড খাড়া, ঊর্ধ্বমুখী এবং শাখা প্রশাখা ছড়ানো। কচি অবস্থায় কাণ্ড মসৃণ, সবুজ ও কোমল থাকে, কিন্তু পরবর্তীকালে কালচে রঙ ধারণ করে। মরিচের শাখা বিস্তার প্রণালী ডাইকটোমাস (dichotomous) ধরনের। জাত ও বয়স অনুযায়ী এক একটি গাছ পাঁচ-ছয় ফুট পর্যন্ত উচ্চতা অর্জন করতে পারে।

পাতা : মরিচের পাতা ছোট ছোট সরল। পত্রফলক কোণাকৃতি, পাতাগুলো কাণ্ডের উপর বিপরীতভাবে সাজানো থাকে।

ফুল ও পরাগায়ন : মরিচের ফুল সম্পূর্ণ অর্থাৎ উভয়লিঙ্গ। ফুলে সাধারণত পাঁচটি স্থায়ী বৃত্যাংশ এবং হালকা বেগুনি, হলুদ অথবা সাদা রং এর পাঁচটি দল বা পাঁপড়ি আছে। মরিচ স্বাভাবিকভাবে স্ব-পরাগায়িত উদ্ভিদ। মরিচের ফুল ফোটার সময় প্রধানত দিনের আলো, তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে।

ফুল ফোটার ২/১ দিনের মধ্যে ফুলের প্রস্ফুটন (anthesis) এবং পরাগধানী বিদারণ (dehiscence) ঘটে। ফুল ফোটার সময় গর্ভমুণ্ড পরাগগ্রাহী (receptive) অবস্থায় থাকে। এ সময়ে পোকার আক্রমণের মরিচের শতকরা ৩২ ভাগ পরপরাগায়নের উল্লেখ

রয়েছে। বিজ্ঞানী Murthy and Murthy (1992) এর মতে, ভারত উপমহাদেশে মরিচের পরপরাগায়নের মাত্রা শতকরা ৬৮ ভাগ। মরিচ ফুলে পরাগের সজীবতার স্থায়িত্বকাল নির্ভর করে পরিবেশের উপর। ২৫° সে তাপমাত্রা এবং ৬৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় পরাগ কয়েকদিন সজীব থাকে এবং এ সময় গর্ভমুণ্ড পরাগ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত থাকে। সাধারণত ৪০-৫০% ফুল ফল ধারণ করে।

ফল : মরিচ ফল একটি অবিদারণশীল (indehiscent) বেরি; শাখার সংযোগস্থলে একাকি অথবা গুচ্ছে উৎপন্ন হয়। ফল লম্বাটে, গোলাকার, খর্বাকৃতি প্রভৃতি নানা রকমের হয়ে থাকে। ফলের প্রকার পার্থেনোকার্পিক, ফলত্বক অমরার কোষ ও বীজের সমন্বয়ে ফল গঠিত। ফলের ভিতরের প্রায় সবটুকুই অমরার কোষ দ্বারা পূর্ণ থাকে।

বীজ : মরিচের বীজ দেখতে অনেকটা টমেটো বীজের মতো, তবে বীজের রঙ হলুদাভ এবং আকৃতিতে বৃক্কাকার। বীজত্বক, ভ্রূণ এবং সামান্য পরিমাণ শস্য সমন্বয়ে বীজ গঠিত। একটি ফলে অনেকগুলো বীজ থাকে।

১৬.১.৫. মরিচ উৎপাদন পদ্ধতি

মরিচের জন্য উচ্চ, উন্মুক্ত ও রোদ-বাতাস যুক্ত স্থান উপযোগী। অবশ্য যখন মাঠে বর্ষার পানি থাকে না তখন নিচু জমিও উপযোগী। মাটি অতিরিক্ত অম্লভাবাপন্ন হলে মাটিতে চুন মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

মাটি : বেলে দোঁআশ থেকে এঁটেল দোঁআশ মাটি অর্থাৎ প্রায় সব ধরনের মাটিতেই মরিচের চাষ করা যায়, তবে এঁটেল মাটিতে মরিচ ভালো হয় না। মাটির pH মান ৫.০-৬.৫ মরিচের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। মরিচ চাষের জন্য নির্বাচিত মাটি সুগভীর, জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ উর্বর এবং সুনিষ্কাশিত হওয়া প্রয়োজন। মরিচের জন্য জলবদ্ধতা খুবই ক্ষতিকর। গাছের গোড়ায় অল্প সময়ের জন্য পানি জমে থাকলেও পাতা ঝড়তে শুরু করে, যা শেষ পর্যন্ত ফলনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। বন্যা বিধৌত পলি এলাকায় মাঝারি ও উঁচু জমিতে যেখানে বর্ষার পর ভাদ্র (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) মাসে জো-অবস্থা আসে সে ধরনের জমিতে মরিচ খুব ভালো হয়। মরিচের জমিতে নিষ্কাশন ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা থাকা একান্ত জরুরি। এজন্য সেচ এলাকায় অথবা নদী, নালা, খাল বা দীঘির আশে পাশে মরিচ চাষ করা উচিৎ। এছাড়া চুরির হাত থেকে রেহাই পেতে হলে নিজস্ব তত্ত্বাবধান এলাকায় মরিচ চাষ করা যুক্তি সঙ্গত।

জলবায়ু : মরিচ গ্রীষ্ম প্রধান জলবায়ু উপযোগী ফসল। দৈনিক গড় তাপমাত্রা ১৩-২৫° সে মরিচের স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি ও ভালো ফলনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়ায় মরিচ ভালো হয়। সর্বোপরি আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ৬৫ ভাগ এবং তাপমাত্রা ২০-২৫° সে ফল ধারণের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তাপমাত্রা খুব বেশি (৩০° সে এর উপর) এবং বাতাসের আর্দ্রতা কম হলে মরিচ গাছ পানি শোষণ ও

প্রস্বেদনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না ফলে অ্যাবসেশন স্তর ভেঙে যায় এবং ফুল ও কচি ফল ঝরে পড়ে। অত্যাধিক উচ্চ বা নিম্ন তাপমাত্রায় ফল ক্ষুদ্রাকার ও বীজবিহীন হতে পারে। বৃষ্টিপাতের আধিক্য এবং মেঘলা আকাশ ফুল ধারণের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। অপেক্ষাকৃত খাটো দিবসে মরিচের গাছ দ্রুত ফুল উৎপাদন করে। মনে রাখা প্রয়োজন, সব জাতের মরিচের পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা এক নয়। *Capsicum fruitescence* এর জাতসমূহ অধিক মাত্রায় উষ্ণতা ও আর্দ্রতা সহ্য করতে সক্ষম।

উৎপাদন মৌসুম : বাংলাদেশে জলবায়ুতে সারা বছরই মরিচ জন্মে। অবশ্য এখানে উৎপাদিত মরিচ শতকরা ৭৫ ভাগই রবি মৌসুমে জন্মানো হয়। রবি মৌসুমের মরিচের বীজ ভাদ্র মাসে মাঝামাঝি হতে কার্তিকের মাঝামাঝি পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) এবং খরিফ মৌসুমে মাঘ মাসের মাঝামাঝি হতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি (ফেব্রুয়ারি-মে) বপন করতে হয়। বারমাসী জাতের মরিচ লাগাবার কোনো নির্দিষ্ট সময় নাই। খরিফ মৌসুমের জন্য সঠিক জাত নির্বাচন করা একান্ত প্রয়োজন, বিশেষত বিদেশী মিষ্টি মরিচ বাংলাদেশের খরিফ মৌসুমের আদ্র পরিবেশে গজায় না, ফলধারণ করে না এবং সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

যেসব জমি বন্যার পানিতে ডুবে যাবার সম্ভাবনা থাকে সে সব জমিতে শুধু রবি মৌসুমে মরিচ চাষ করা যায়। এক্ষেত্রে যথাসম্ভব আগাম লাগাতে হবে যাতে বন্যা আসার আগেই ফসল তোলা সম্ভব হয়। ভাদ্র (১৫ আগস্ট-১৪ সেপ্টেম্বর) মাসে বপন করলে গাছ আকারে বেশ বড় হয়। সেই সাথে ডালপালা ও ফুল-ফল বেশি হয়। এছাড়া আগাম কাঁচা মরিচও পাওয়া যায় যার বাজার মূল্য বেশ ভালো থাকে। অপর দিকে কার্তিকে (১৫ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর) লাগানো গাছ ছোট হয়, পাতা কুঁকড়ে যায় এবং রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে উৎপাদন কম হয়। এজন্য ভাদ্র-আশ্বিনের মধ্যেই মরিচ বপন করা উচিৎ।

বীজতলা : বাংলাদেশের মরিচ চাষের জন্য সরাসরি বীজ বপন ও চারা রোপণ উভয় পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। তবে বীজতলায় চারা উত্তোলন করে সময়মত রোপণ করাই লাগসই প্রযুক্তি। এ পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত কম বীজ লাগে এবং ফলন বেশি পাওয়া যায়। সরাসরি ছিটিয়ে বপন করলে হেক্টর প্রতি প্রায় ২.৫-৩.০ কেজি বীজ লাগে অথচ রোপণ পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি মাত্র ১০-৮৫০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

স্থান নির্বাচন : মরিচের বীজতলার জন্য ছায়ামুক্ত, সবসময় আলো-বাতাস পায় এবং সেচ সুবিধাসহ সুনিষ্কাশিত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি শোধন : বীজতলা থেকে রোগমুক্ত, সবল চারা পাওয়ার জন্য বীজতলার মাটি শোধন করে নেয়া বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকেরা মাটি শোধনের ব্যাপারে খুব একটা অগ্রাহী হয় না। বিনা ব্যয়ে বা অতি সামান্য ব্যয়ে এ কাজটি করা হলে উৎপাদনে নিশ্চিতভাবে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং তাতে কৃষকেরাই উপকৃত হবে। মাটি শোধনের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতি (যেমন- ফরমালিন প্রয়োগ) ছড়াও গ্রামীণ প্রযুক্তি রয়েছে। এখানে গ্রামীণ দুটি প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল।

পোকা ও রোগ দমন : নির্বাচিত বীজতলার উপর শুকনা খড়কুটা বিছিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে আগুনের তাপে মাটির অভ্যন্তরে বসবাসকারী পোকা ও রোগ জীবাণু মারা যাবে।

পলিথিন দিয়ে ঢাকা : বীজতলার মাটি ভালোভাবে চাষ ও পরিষ্কার করে একটি হালকা সেচ দিতে হয়। এরপর পলিথিন শিট দিয়ে দুই সপ্তাহ ভালোভাবে ঢেকে রাখতে হয়। এর ফলে মাটিতে যে গ্যাস ও তাপ উৎপন্ন হয় তা রোগবালাই ধ্বংস করে ফেলে।

বীজতলা তৈরি : উঁচু করে বীজতলা তৈরি করতে হয় যেন পানি না দাঁড়ায়। প্রতি বর্গমিটার বীজতলার জন্য ১৫ কেজি পচা গোবরসার ভালো করে মাটিতে মিশিয়ে বীজতলার মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হয়। প্রায় ৬০ বর্গমিটার বীজতলার চারা এক হেক্টর জমিতে লাগানো যায়।

বীজ সংগ্রহ : ভালো বীজে ভালো ফসল কথাটি সকল ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বীজ খারাপ হলে কৃষকের সব প্রচেষ্টাই বিফলে যায়। এজন্য বীজ নির্বাচনে বিশেষ সতর্ক হওয়া জরুরি।

অজানা-অচেনা উৎস থেকে কখনই বীজ সংগ্রহ করা উচিৎ নয়। নিজের ভালো ফসল থেকে আগাম পাকা মরিচ সংগ্রহের পর শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। এছাড়া বিশ্বস্ত দোকান থেকে লেবেলযুক্ত প্যাকেটকৃত উন্নত জাতের বীজ ও হাইব্রিড বীজ ভালো ফলনের নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

মনে রাখতে হয়, হাইব্রিড বীজ শুধু একবার ব্যবহার উপযোগী এবং হাইব্রিড বীজ ব্যবহার-করে উৎপাদিত ফসল থেকে পরবর্তী মৌসুমের জন্য বীজ রাখা যাবে না। মরিচের বীজ খুব হালকা, প্রতি ১০০ গ্রামে ২০০-২৫০টি বীজ থাকে এবং শতকরা ৮০ ভাগ সুস্থ সবল চারা গজালে তাকে ভালো বীজ বলা যায়।

বীজ শোধন : বিভিন্ন ধরনের রোগ দ্বারা মরিচ ফসল আক্রান্ত হয়ে থাকে। এসবের অধিকাংশই বীজবাহিত রোগ। তাই বীজ শোধন করে মরিচ চাষ করা হলে রোগ থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়। এর জন্য স্বল্প ব্যয়ে সহজ পদ্ধতিটি হচ্ছে– একটি ঢাকনাযুক্ত প্লাস্টিকের কৌটায় বীজ ও প্রতি কেজি বীজের জন্য ২.৫ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ এবং সামান্য চিটাগুড়, অথবা পানি নিয়ে এমনভাবে ঝাঁকাতে হয় যেন বীজের গায়ে ছত্রাকনাশকটি ভালোভাবে লেগে যায়। শোধিত বীজ পাত্র থেকে বের করে ছায়াতে কিছুক্ষণ শুকিয়ে নিতে হয়। বীজ বপনের ৬ ঘণ্টা আগে বীজ শোধন করা ভালো।

বীজ বপন : বীজতলায় বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করা যেতে পারে। আমাদের দেশের কৃষকেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বীজ ছিটিয়ে বপন করেন। এ ক্ষেত্রে ১ ভাগ বীজের ২ ভাগ শুকনা ছাই অথবা ঝুরঝুরে মাটি মিশিয়ে বপন করলে তা সমভাবে পড়বে। এরপর মই দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয়। সারি পদ্ধতিতে রোপণের জন্য ১ সেন্টিমিটার গভীর করে ১০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে কাঠির সাহায্যে সারি টেনে সারিতে বীজ বপন করে গোবর মেশানো ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে হালকাভাবে বীজ ঢেকে দিতে হয়।

বীজ অঙ্কুরোন : বীজ ভিজিয়ে সামান্য অঙ্কুরিত অবস্থায় বোনা ভালো। তবে বপনকালে আবহাওয়া এবং মাটি ভেজা থাকলে শুকনা বীজই বুনতে হয়। শুকনা বীজ

গজাতে ১০ দিন পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে এবং এর মধ্যে লাগাতার বৃষ্টিপাত হলে বীজ গজানোর সম্ভাবনা কমে যায়। তাই পারতপক্ষে ভিজা বীজ ব্যবহার করাই শ্রেয়। বীজ অঙ্কুরণের জন্য একটি কাপড়ে প্রয়োজনীয় বীজ বেঁধে ১০-১৫ মিনিট পানিতে ভিজানোর পর ২৪ ঘণ্টা ছায়ায় ঝুলিয়ে রাখতে হয়। এর ফলে বীজে অঙ্কুরোদ্গম ঘটবে। পূর্ব অঙ্কুরিত এই বীজ তখন পূর্বের নিয়মে বীজতলায় ছিটিয়ে অথবা সারিতে বপন করতে হয় এবং হালকা মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

চারার যত্ন : বীজতলায় বীজ বপনের ৬-১০ দিনের মধ্যে চারা গজাবে। ভালো সুস্থ ও সবল চারা পেতে হলে বীজতলার নিম্নবর্ণিত যত্ন নেয়া দরকার–

(১) প্রতিদিন সকাল-বিকাল বাগান ঝর্ণা দিয়ে হালকা সেচ দিতে হয়।

(২) অত্যধিক বৃষ্টি, বাতাস বা রোদের হাত থেকে চারাগুলোকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বীজতলা ঢাকার ব্যবস্থা করতে হয়। নারিকেলের পাতা বা পলিথিন শিট দিয়ে অস্থায়ীভাবে ঢাকার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

(৩) পোকার হাত থেকে বীজতলাকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন, আক্রান্ত হলে সঠিকমাত্রায় অনুমোদিত কীটনাশক স্প্রে করতে হয়।

(৪) বীজতলায় আগাছা হতে দেয়া যাবে না।

জমি তৈরি : মরিচ ফসল থেকে ভালো ফলন পেতে হলে জমি সমতল ও মসৃণ করে তৈরি করতে হয়। জমি পতিত রেখে মরিচ চাষ করলে অপেক্ষাকৃত বেশি ফলন পাওয়া যায়। একই জমিতে বারবার মরিচ আবাদ না করাই ভালো। মরিচের জমির উর্বরতা বাড়াতে জমিতে সবুজসার ফসল হিসেবে ধৈঞ্চা, শনপাট ইত্যাদি চাষ করে কচি অবস্থায় চাষ দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। মরিচের জমিতে আবাদ বা পতিত অবস্থায় কখনই ঘাস জন্মাতে দেয়া যাবে না। সেজন্য পতিত অবস্থায় মাঝে মাঝে মই দিয়ে ঘাসকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। জমির নিকটবর্তী নিচু এলাকা থেকে পলিযুক্ত মাটি এনে মরিচ লাগানোর অন্তত একমাস আগে জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়। গ্রামাঞ্চলে এই মাটিকে পাগার মাটিও বলা হয়ে থাকে। এর ফলে জমির উর্বরতা বেড়ে যায় এবং মরিচের ফলনও বেশি হয়।

দো-ফসলা জমিতে মরিচ চাষ করতে হলে পাট বা আউশ ধান কাটার পরপরই জমিতে চাষ দেয়া ভালো। উচু জমি বা পতিত জমিতে ভাদ্র মাসের শুরুতেই (মধ্য আগস্ট) চাষ দিয়ে আগাম মরিচ আবাদ করা যায়।

প্রাথমিকভাবে মরিচের জমিতে ৬-৭টি চাষ ও মই দিয়ে মাটিকে ঝুরঝুরে করে নিতে হয়। জমিতে একদম ঢিল থাকা চলবে না। বীজ বপনের ৩ সপ্তাহ পূর্বে হেক্টর প্রতি ১০-১৫ টন জৈব সার ছিটিয়ে চাষ দিতে হয়। এতে সার ভালোভাবে মাটিতে মিশে যাবে। সেই সাথে হেক্টর প্রতি ১৫০ কেজি সরিষা বা সূর্যমুখী খইল ভালোভাবে শুকিয়ে ও গুড়া করে বীজ বপনের ১০ দিন আগে চাষের সাথে মাটিতে মিশিয়ে দিতে

ভালো ফল পাওয়া যায়। বীজ বপনের ২-৩ দিন আগে জমিতে অনুমোদিত মাত্রায় রাসায়নিক সারসমূহ ছিটিয়ে দু'বার আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি চূড়ান্ত করতে হয়।

রোপণ : চারা বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে অথবা ১৫-২০ সেন্টিমিটার লম্বা হলে চারা রোপণের উপযোগী হয়। বীজতলা থেকে চারা তোলার সময় যেন শিকড় নষ্ট না হয়, সেজন্য ২ ঘণ্টা আগে বীজতলা পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয়।

রোপণের দূরত্ব জাত, মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন মৌসুমের উপর নির্ভর করে। তৈরিকৃত জমিতে ৩০ সেন্টিমিটার পরপর ১০০ সেন্টিমিটার চওড়া বীজতলা তৈরি করতে হয়। দুই বীজতলার মাঝখানের এই ৩০ সেন্টিমিটার জায়গায় সেচ নালা তৈরি করতে হয়। নালা থেকে বীজতলার উচ্চতা হয় ২০ সেন্টিমিটার। বীজতলা সারি থেকে সারি ৩০ সেন্টিমিটার এবং চারা থেকে চারা ৩০ সেন্টিমিটার দূরত্ব বজায় রেখে ৩ সেন্টিমিটার গভীরে চারা রোপণ করতে হয়।

হাইব্রিড জাতের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব যথাক্রমে ৭৫ ও ৬০ সেন্টিমিটার রাখতে হয়। এ ক্ষেত্রে বীজতলার আকারও সুবিধাজনকভাবে পরিবর্তন করে নিতে হয়।

জমিতে চারা রোপণের পর চারা যাতে শুকিয়ে না যায় সেজন্য বিকালের দিকে চারা রোপণ করাই ভালো। রোগাক্রান্ত ও শিকড় ছেড়া চারা রোপণ করা উচিৎ নয়। চারা রোপণের পর চারার গোড়ার চারদিকে ৭.৫ সেন্টিমিটার দূর দিয়ে কাঠির সাহায্যে গোলাকার নালা তৈরি করে দিলে কাটুই পোকার আক্রমণ কম হয়।

কড়া রোদ হলে চারা লাগানোর পর কয়েকদিন বড় পাতা ও কলাগাছের খোল কেটে চারায় ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা করতে হয়। চারা লাগানোর পরপরই একটি হালকা সেচ দিলে চারা তাড়াতাড়ি লেগে যাবে। কোথাও চারা মরে গেলে চারা লাগানোর ৫-৭ দিনের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় নতুন চারা লাগাতে হয়।

বপন সরাসরি মাঠে বীজ বপনের জন্য একই আকারে বীজতলা ও নালা তৈরি করতে হয়। এরপর বীজ শুকনা মাটি বা ছাইয়ের সাথে মিশিয়ে ছিটিয়ে বুনে একটি হালকা চাষ ও মই দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত দূরত্বে কাঠি দিয়ে ১ সেন্টিমিটার গভীরে সারি টেনে বীজ বপন করতে হয় এবং ঝুরঝুরা মাটি দিয়ে বীজগুলি ঢেকে নিতে হয়। চারা গজানোর ১০ দিন পর চারা পাতলা করে দিতে হয়।

রাসায়নিক সার প্রয়োগ : মরিচ মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উপাদান শোষণ করে। এ জন্য মরিচের সন্তোষজনক উৎপাদন সার ছাড়া সম্ভব নয়।

সারের পরিমাণ মাটির উর্বরতার উপর নির্ভর করে। সেজন্য কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের (AEZ) ভিত্তিতে সুপারিশকৃত মাত্রা অনুযায়ী সার ব্যবহার করা উচিত। নিচের সারণিতে কম থেকে মধ্যম উর্বর জমির জন্য একটি সাধারণ মাত্রার সুপারিশ করা হলো :

মরিচ গাছ খুব নরম ও নাজুক হওয়ায় মরিচ ফসলে সার দেওয়ার সময় খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। উপরি প্রয়োগের ক্ষেত্রে খুব সকালে যখন গাছের পাতা ভেজা থাকে সে সময় সার প্রয়োগ করা যাবে না। বিকালে সার ছিটালে সার অনেক সময় পাতায় আটকে থাকে এবং রাতের শিশিরে তা গলে গিয়ে পাতা পোড়া ধরায়। তাই ভালো দিন দেখে দুপুর বেলা উপরি সার প্রয়োগ করা উচিত। সার ছিটিয়ে দেওয়ার পর খড়ের তৈরি ঝাড়ু দিয়ে গাছকে নাড়া দিতে হয় যাতে পাতায় আটকে থাকা সার মাটিতে পড়ে যায়। উপরি সার প্রয়োগের পর যথাশীঘ্র সম্ভব সেচ দিতে হয়। সুপারিশকৃত পরিমাণের বেশি সার বিশেষত ইউরিয়া কখনই প্রয়োগ করা উচিত নয়। এতে গাছ মরে যেতে পারে। বেশি সার দেওয়া হলে প্রচুর পরিমাণ পানি দিয়ে মাটির সার বাড়িয়ে দিতে হয়।

সারণি ৩ : মরিচ ফসলের জন্য রাসায়নিক সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ

সারের নাম	প্রয়োগের সময়	সারের পরিমাণ	
		(কেজি/বিঘা)	(কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর	১৩	১০০
	চারা রোপণের ৪০-৫৫ দিন পর	১৩	১০০
টিএসপি	জমি তৈরির সময় (সম্পূর্ণ)	২৬	২০০
এমপি	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর	১৩	১০০
	চারা রোপণের ৪০-৫৫ দিন পর	১৩	১০০
জিপসাম	জমি তৈরির সময় (সম্পূর্ণ)	১৩	১০০
জিঙ্ক সালফেট	জমি তৈরির সময় (সম্পূর্ণ)	১.৩	১০

সূত্র : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

১৬.১.৬. মরিচের সেচ ব্যবস্থাপনা

মরিচ ফসলের বাড়বাড়তি এবং ভালো ফলনের জন্য সেচ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। মরিচের শিকড় খুব বেশি গভীরে যায় না বলে বেশ কয়েকটি সেচের প্রয়োজন হয়। গভীর, অগভীর বা হস্তচালিত নলকূপ দিয়ে মরিচের জমিতে সেচ দেয়া যায়। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী নদী, নালা, খাল পুকুর হতেও সেউতি দিয়ে সেচ দেওয়া যায়। বীজতলার দু'পাশের নালা দিয়ে সেচের পানির নিয়ন্ত্রিত চলাচল নিশ্চিত করা যায়। মনে রাখা দরকার যে, মরিচের জমিতে সবসময়ই পরিমিত সেচ প্রয়োজন। জমিতে যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়, কারণ মরিচ গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে খুব দ্রুত শিকড় পচে গাছ মরে যায়। মরিচ চাষের ক্ষেত্রে তাই সেচ ব্যবস্থার পাশাপাশি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যাবশ্যকীয়। বেলে দোঁআশ জমিতে ৩-৪ বার এবং দোঁআশ জমিতে ২-৩ বার সেচ দিতে হয়। প্রতিবার ১ থেকে ১.৫ ইঞ্চির বেশি

পানি না দেওয়াই ভালো। মরিচ উৎপাদনের জন্য নিচে উল্লেখিত সেচ সূচি অনুসরণ করা যেতে পারে :

সারণি ৪ : মরিচ ফসলের সেচসূচি

সূচি	ফসলের অবস্থা	রোপণের পর (দিন)
১ম	চারা	চারা রোপণের পর ৭ দিন পর্যন্ত নিয়মিত হালকা সেচ দেওয়া প্রয়োজন
২য়	চারা	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর প্রথম উপরি প্রয়োগ অনুসরণে।
৩য়	ফুল আসার আগে	চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগের অনুসরণে
৪র্থ	ফল বৃদ্ধির সময়	চারা রোপণের ৬০-৭০ দিন পর।

সূত্র : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে জমিতে বীজ গজানোর জন্য পর্যাপ্ত রস না থাকলে জমি তৈরির আগেই একটি হালকা সেচ দিয়ে জমি তৈরি করে বীজ বপন করতে হয়।

আগাছা দমন : আগাছা খাদ্য, পানি ও আলোর জন্য ফসলের সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং পোকামাকড় ও রোগজীবাণুর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। এজন্য জমিতে আগাছা দেখা দিলেই দমন করতে হয়। সেচ দেওয়ার পর জমির মাটি শক্ত হয়ে চটা বেঁধে গেলে হালকাভাবে নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে দিলে গাছের শিকড় ভালোভাবে বৃদ্ধি পায়। বীজ বপনের পর থেকে ফসল পাকা পর্যন্ত অন্তত ৩-৪ বার নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার ও মাটি আলগা করে দিতে হয়। প্রথমবার নিড়ানির সময় শুধু ঘাস তুলে ফেলতে হয়। গাছ ঘন থাকলে দ্বিতীয় নিড়ানির সময় পাতলা করে দিতে হয়। তৃতীয়বার নিড়ানির ক্ষেত্রে মাটি আলগা ও ভালোভাবে ঝুরঝুরে করে গাছের গোড়ায় দিতে হয়। এ সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে গাছের ডগা ভেঙে না যায় এবং শিকড় না কাটে। ডগা ভেঙে গেলে বা শিকড় কেটে গেলে মরিচ গাছের বেশ ক্ষতি হয়ে থাকে।

১৬.১.৭. মরিচের বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন

মরিচ একটি লাভজনক ফসল, কিন্তু এর শত্রুর অভাব নেই। বাংলাদেশে মরিচ চাষের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ। পোকার কারণে প্রতি বছর মরিচের উৎপাদন ব্যাহত হয়। মাঠ পর্যায়ে পোকামাকড় দমনে ব্যাপকভাবে কীটনাশক ব্যবহার হয়ে থাকে। ফলে অধিকাংশ ক্ষতিকর পোকাই কীটনাশকের প্রতি প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করছে এবং শুধু কীটনাশক প্রয়োগ করে আর তাদের দমন করা যাচ্ছে না। পাশাপাশি রোগের আক্রমণও মরিচ চাষকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। কোন রোগে কি ক্ষতি হচ্ছে তা নিরূপণ করা না হলেও বলা যায় বিভিন্ন রোগের আক্রমণে মরিচের

ফলন গড়ে ২৫-৩৫% কম হচ্ছে। এ অবস্থায় মরিচ ফসলকে পোকা ও রোগ থেকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। প্রধান কয়েকটি ক্ষতিকারক পোকা ও রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এছাড়া পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ক. কাটুই পোকা

ক্ষতির ধরন : কাটুই পোকার কীড়া মরিচের চারার গোড়া কেটে দেয়। প্রায় সব মৌসুমেই এগুলোর আক্রমণ কম বেশি লক্ষ্য করা যায়। তবে অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে রোপণ করা চারা এ পোকা দ্বারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ পোকা মূলত রাতেই বেশি উপদ্রব করে। মেঘলা রাতে এগুলোর উপদ্রব বেড়ে যায়। সকালে ক্ষেতের মধ্যে কাটা চারা পড়ে থাকতে দেখা যায় অথবা আংশিক কাটা চারাকে নিস্তেজ হয়ে যেতে দেখা যায়। একটি পোকা একরাতে অনেকগুলো চারা কেটে দিতে পারে। পূর্ণবর্ধিত কীড়াকে কাটা গাছের গোড়ায় মাটির নিচে লুকিয়ে থাকতে দেখা যায়। এ পোকার কীড়াকে হাত দিয়ে নাড়লেই হাঁটা বা খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে পুটলি পাকিয়ে চুপ করে থাকে; কিছু সময় পরেই আবার তার কার্যক্রম শুরু করে।

দমন ব্যবস্থা

১) সকালে মরিচের ক্ষেতে পরিদর্শনকালে মাটি বরাবর কাটা অবস্থায় কোনো চারা পড়ে থাকতে দেখলে গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়ে পোকার আক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। আক্রমণ কম হলে পোকা তুলে পিষে মেরে ফেলতে হয়।

২) চারা রোপণের পর আক্রমণ লক্ষ্য করলে জমিতে সেচ দিয়ে কিংবা গাছের গোড়ার চারপাশে প্রতি ১০ লিটার পানির সাথে ৩০ মিলিলিটার হারে ডারসবান ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

৩) জমিতে ডাল পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা করে সেচ দিলে কাটুই পোকার কীড়া মাটির উপর উঠে আসে এবং পাখি কীড়াগুলো খেয়ে ফেলে।

৪) চারা রোপণের পূর্বে জমি গভীর করে চাষ দিয়ে কয়েকদিন ফেলে রাখলে পোকার কীড়া পাখিরা খেয়ে ফেলে এবং রোদেও মরে যায়।

৫) বিষটোপ দিয়েও এই পোকা দমন করা যায়। বিষটোপ তৈরি করতে ৯০০ গ্রাম ধানের কুঁড়া, ১০০ গ্রাম ঝোলাগুড় এবং ২০০ গ্রাম পাদান ৫০ এসপি একত্রে মিশিয়ে পানি দিয়ে মণ্ড তৈরি করতে হয়। সন্ধ্যায় এই বিষটোপ সারা ক্ষেতে ছিটিয়ে দিলে রাতে পোকা বেরিয়ে এই বিষটোপে আকর্ষিত হয় এবং তা খেয়ে মারা যায়।

৬) জমিতে লাগানো চারা গাছের শতকরা ১০ ভাগের কম কাটুই পোকার আক্রমণে নষ্ট হলে কোনো রাসায়নিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

৭) শতকরা ১০ ভাগের বেশি চারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ডারসবান ২০ ইসি বা পাইরিফস ২০ ইসি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩০ মিলিলিটার মিশিয়ে গাছ ও গোড়ার মাটিতে স্প্রে করতে হয়।

খ. উরচুঙ্গা

ক্ষতির ধরন : উরচুঙ্গা মরিচের একটি অন্যতম ক্ষতিকারক পোকা। অনেকে এই পোকাকে স্থানীয় ভাষায় ঘুগড়া পোকা বলে। সন্ধ্যায় ঝিঁঝিঁ পোকার মতো তীব্র ও তীক্ষ্ণ শব্দে ক্ষেতে এগুলোর উপস্থিতি বোঝা যায়।

অনেক ফসলের শত্রুর মতো মরিচের চারারও এটি একটি অন্যতম প্রধান শত্রু পোকা। ক্ষেতে চারা রোপণের দুই এক সপ্তাহের মধ্যে এগুলোর আক্রমণ শুরু হয়। এই পোকা চারা কেটে দেয় অথবা মাটি ঠেলে দিয়ে চারা উপড়ে ফেলে। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত এগুলো খুবই সক্রিয় থাকে। সারা শীতকাল এরা নিষ্ক্রিয় থাকে। এই পোকা মাটি খুড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে দিনে সেখানে লুকিয়ে থাকে; সন্ধ্যায় অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে কচি চারার গোড়া ও ডগা কাটে এবং কাটা অংশগুলো খাওয়ার জন্য সুড়ঙ্গের মধ্যে জমা করে।

দমন ব্যবস্থা

১) যে সব জমিতে প্রতিবছর উড়চুঙ্গার আক্রমণ দেখা যায় সে সব জমিতে শস্য পর্যায় অনুসরণ করা প্রয়োজন।

২) আক্রমণ প্রবণ জমিতে স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক হারে চারা রোপণ করা যেতে পারে। সারের শেষ উপরি-প্রয়োগের পূর্ব পর্যন্ত এসব চারা উরচুঙ্গা দ্বারা যদি তেমন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তবে কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক চারা রেখে বাকি চারাগুলো তুলে সার প্রয়োগ করতে হয়।

৩) আক্রান্ত জমিতে সেচ দেবার পূর্বে পাদান ১০ জি বা ফুরাডান ১০ জি ছিটিয়ে সেচ দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

৪) প্রতি বছর নিয়মিত উরচুঙ্গার আক্রমণ হয় এমন জমিতে চাষের সময় অনুমোদিত মাত্রায় ডারসবান ২০ ইসি ব্যবহারে উরচুঙ্গার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৫) মরিচ ক্ষেতে উরচুঙ্গার সুড়ঙ্গ দেখা গেলে ডারসবান ২০ ইসি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলিলিটার মিশিয়ে সুড়ঙ্গে ঢালতে হয়।

৬) বিষটোপ দিয়ে উরচুঙ্গা দমন করা যায়। বিষটোপ তৈরির কৌশল কাটুই পোকার দমন ব্যবস্থাপনায় আলোচনা করা হয়েছে।

গ. জাবপোকা

ক্ষতির ধরন : জাবপোকা একটি বহুভোজী ক্ষতিকর পোকা। এগুলো দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে এবং পাতা ও কচি ডগার রস চুষে খায়। ফলে আক্রান্ত অংশ বিবর্ণ হয়ে

যায়, পাতা কুঁকড়ে যায়, নরম ডালপালা বেঁকে যায় এবং ফলন কমে যায়। গাছে পিপড়ার আনাগোনা দেখলেই বুঝতে হয় মরিচ গাছে জাবপোকা লেগেছে। জাবপোকা দ্বারা প্রত্যক্ষ ক্ষতির চেয়ে পরোক্ষ ক্ষতির পরিমাণ বেশি। কারণ জাবপোকা অনেক ধরনের ভাইরাস রোগজীবাণুর বাহক হিসেবে কাজ করে।

দমন ব্যবস্থা

১) সুষম সার ব্যবহার, সঠিক সেচ ব্যবস্থাপনা এবং আগাম চারা রোপণ জাব-পোকার আক্রমণ কমাতে সহায়তা করে।

২) প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত ক্ষেতের একপাশে প্রতিদিন উজ্জ্বল হলুদ কাপড় ঝুলিয়ে রাখলে তাতে প্রচুর জাবপোকা আকৃষ্ট হয়ে বসে। কাপড় ধুয়ে পুনরায় পরের দিন একইভাবে ঝুলিয়ে রাখলে এটি জাবপোকার ফাঁদ হিসেবে কাজ করে। এছাড়া হলুদ রঙের প্লাস্টিকের গামলায় সামান্য কীটনাশক মিশ্রিত পানি রেখে দিলে তাতেও জাবপোকা আকৃষ্ট হয়।

৩) যেহেতু জাবপোকা মারাত্মক ভাইরাসের বাহক, সেহেতু জাবপোকা উপরে বর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণের মাধ্যমে দমন করতে ব্যর্থ হলে রাসায়নিক দমন কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। এজন্য প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলিলিটার ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি, মেটাসিস্ট ২৫ ইসি ইত্যাদি যে কোনো একটি মিশিয়ে পাতা ও গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হয়। এছাড়া জোলন ও পিরিমর জাবপোকা দমনে অত্যন্ত কার্যকর দুটি কীটনাশক।

ঘ. জ্যাসিড

ক্ষতির ধরন : জ্যাসিড বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে মরিচের একটি প্রধান ক্ষতিকর পোকা। চারা রোপণের পর থেকে এরা পাতা ও ডগার রস চুষে খায়। এর ফলে আক্রান্ত পাতা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং কচি পাতা কুঁচকে যায়। আক্রমণ হলে পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে। পাতা থেকে রস চুষে খাওয়ার সময় এই পোকা পাতায় এক রকম বিষাক্ত পদার্থ ঢুকিয়ে দেয়। এতে আক্রান্ত পাতা প্রথমে নিচের দিকে কুঁকড়ে যায় এবং পরে পাতার কিনারা হলুদ এবং পাতা লালচে রঙ ধারণ করে। জ্যাসিড দেখতে খুব ছোট এবং হালকা সবুজ রঙের। সাধারণত পাতার নিচে লুকিয়ে থাকে। গাছ ধরে ঝাকালে জ্যাসিড চারদিকে লাফিয়ে উড়ে যায়। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর এগুলোর আক্রমণ বেশি হতে দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থা

১) মরিচের জমিতে নিয়মিত জরিপ করে জ্যাসিডের উপস্থিতির হার নির্ণয় করতে হয়। প্রতি পাতায় গড়ে ১টি জ্যাসিডের উপস্থিতি দেখা গেলে বুঝতে হবে তা ফসলের অর্থনৈতিক ক্ষতি ঘটাবে যদি সময় মতো দমন ব্যবস্থা নেয়া না হয়।

২) মসৃণ কাপড়ের তৈরি হাত জাল দিয়ে জ্যাসিড ধরে কমানো যায়।

৩) সঠিক দূরত্বে রেখে চারা রোপণ করতে হয়; এতে উপদ্রব কম হয়।

৪) মরিচের জমিতে জ্যাসিডের আক্রমণ কমাতে ঢেঁড়শ একটি উত্তম ফাঁদ হিসেবে কাজ করে। এজন্য ক্ষেতের চারপাশে ২/৪টি ঢেঁড়শের গাছ লাগালে জ্যাসিড মরিচ অপেক্ষা ঢেঁড়শে বেশি আক্রমণ করে।

(৫) এসব ব্যবস্থায় জ্যাসিড দমন না হলে ৭ দিন পরপর নুভাক্রন ৪০ ডব্লিউএসসি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩০-৫০ মিলিলিটার মিশিয়ে স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

৬. ক্ষুদে মাকড়

ক্ষতির ধরন : এই মাকড় অত্যন্ত ক্ষুদ্র রঙ হালকা বাদামি। বাংলাদেশে মরিচের এটি একটি অন্যতম শত্রু। পাতার নিচে সুক্ষ্ম জাল বুনে এরা অবস্থান করে এবং দলবদ্ধভাবে মরিচের পাতার নিচ থেকে রস চুষে খেতে থাকে; ফলে পাতার নিচের পিঠে মরিচা পড়ার মতো দাগ দেখা যায়। এছাড়া এগুলোর বোনা জালে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয় ও ফলন কমে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১। জমি জরিপ করে মাকড় আক্রান্ত পাতা পলিব্যাগে তুলে মাঠের বাইরে এনে ধ্বংস করতে হয়।

২। মাকড়ের আক্রমণ বেশি হলে যে কোনো সালফার যেমন থিয়োভিট ৮০ ডব্লিউপি মাত্রানুযায়ী ব্যবহার করতে হয়।

৩) সাধারণত প্রচলিত কীটনাশক যেমন রিপকর্ড, সিমবুশ, ডায়াজিনন ইত্যাদি আক্রান্ত গাছে দিলে তা মাকড়ের আক্রমণকে আরো বাড়িয়ে দেয়। এজন্য সঠিক মাকড়নাশক ছাড়া অন্য কোনো কীটনাশক মাকড় দমনের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। ক্যালথেন ৪২.৫ ইসি, ইথিয়ন ৪৬ ইসি বা টর্ক ৫৫ ইসি ১০ লিটার পানি ১০ মিলিলিটার মিশিয়ে ভালোভাবে পাতার নিচের পাশসহ সম্পূর্ণ গাছ স্প্রে করে দিলে মাকড়ের আক্রমণ কমে যায়।

১৬.১.৮. মরিচের বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দমন

ক. কাণ্ডপচা রোগ

লক্ষণ : মরিচের এটি একটি মারাত্মক রোগ। সাধারণত ফুল আসার সময় মরিচ গাছে এ রোগ হয়। এ রোগ হলে প্রথম দিকে দুই একটি করে গাছ ঢলে পড়ে যেতে দেখা যায়। ঢলে পড়া গাছ টান দিয়ে শিকড়সহ উপড়ালে দেখা যায় মাটির সংযোগস্থলে কাণ্ড হঠাৎ সরু হয়ে গেছে এবং কাণ্ডের ছাল শুকিয়ে ভেতরের কাঠ বেরিয়ে পড়েছে। আক্রান্ত স্থানে গাঢ় বাদামি থেকে কালো ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পাতা মরে যেতে থাকে; এমনকি পাতা এ রোগে আক্রান্ত হলে পাতায় চক্রাকার দাগ দেখা যায়। ধূসর বা বাদামি রঙের এরূপ দাগের কেন্দ্রস্থল হালকা রঙের হয়ে থাকে এবং অসম একটি কালো রেখা দ্বারা বেষ্টিত থাকে। আক্রান্ত পাতা ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে মরে যায়। পাতা থেকে বৃন্তে, সেখান থেকে কাণ্ডে ও শেষে ফলে আক্রমণ করে। ফলে কালো ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং ফল পচে যায়। এক প্রকার ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। মাটি, আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ, বীজ প্রভৃতির মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে।

রোগ নিয়ন্ত্রণ

১) সুস্থ, রোগ মুক্ত ও ভালো বীজ ব্যবহার করতে হয়।
২) প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ এবং অল্প পানি মিশিয়ে বপনের আগে বীজ শোধন করে নিতে হয়।
৩) পানির নিষ্কাশন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হয়।
৪) আক্রান্ত হলে জমিতে নিয়মিতভাবে ১৫ দিন পরপর গাছের গোড়াসহ সম্পূর্ণ গাছে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল বা প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলিলিটার টিল্ট মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়।
৫) শস্য পর্যায় অনুসরণ করতে হয়।
৬) ফসল সংগ্রহের পর আগুন লাগিয়ে গাছ পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

খ. ঢলেপড়া রোগ

লক্ষণ : এ রোগে আক্রান্ত হলে গাছের কচি পাতা প্রথমে ঢলে পড়ে। শিকড়ের মাধ্যমে আক্রমণ হলেও পরে তা কাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। গাছ খাটো হয়ে যায়। এ রোগের জীবাণু মাটি থেকে টেনে তোলা পানি সঞ্চালনে বাধা দেয়। ফলে গাছ ঢলে পড়ে ও শেষে মরে যায়। *Pseudomonas* নামক ব্যাকটেরিয়া এবং *Fusarium* নামক ছত্রাক জীবাণু দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে সম্পূর্ণ গাছ হঠাৎ ঢলে পড়ে। আক্রান্ত গাছের ডাল কেটে পানিতে রাখলে সাদা কসের মতো বস্তু দেখা যায়, পক্ষান্তরে ছত্রাক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রথমে গাছের অংশবিশেষ এবং কয়েকদিন পর সম্পূর্ণ গাছ ঢলে পড়ে। আক্রান্ত কাণ্ডের ভিতর বাদামি রঙ ধারণ করে। গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় মাটি যদি ভেজা থাকে তাহলে এ রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। যদিও সব বয়সের গাছই আক্রান্ত হয় তবে ফল ধরার সময় এ রোগ দ্বারা গাছের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। রোগাক্রান্ত গাছ ও সেচের পানির মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু বিস্তার লাভ করে।

রোগ নিয়ন্ত্রণ

১) এ রোগের প্রতি সংবেদনশীল নয় এমন জাত চাষ করতে হয়।
২) ঢলে পড়া চারা দেখা মাত্রই তুলে তা ধ্বংস করতে হয়।
৩) পর্যাপ্ত জৈব সার ও পরিমিত নাইট্রোজেন ব্যবহার করা উচিত।
৪) জমি সব সময় ভেজা রাখা চলবে না।
৫) ছত্রাক দ্বারা সংক্রমিত হলে ২ গ্রাম ডায়াথেন-এম ৪৫ প্রতি ১০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ৫-৭ দিন পরপর ৩ বার স্প্রে করতে হয়।

গ. মড়কা বা ফটকা রোগ

লক্ষণ : মরিচ গাছে যখন মরিচ ধরতে শুরু করে তখন এই রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। মরিচ গাছে এই রোগ হলে গাছের গা ও ডালপালা মটমটে হয়ে কুঁকড়ে যায় বা ভেঙে যায়। ফুলসহ মরিচ ঝড়ে পড়ে

রোগ নিয়ন্ত্রণ

১) এটি একটি বীজবাহিত রোগ; তাই রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হয়।
২) প্রতি কেজি বীজ ২ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ দিয়ে শোধন করে নিতে হয়।

ঘ. পাতায় দাগ পড়া রোগ

লক্ষণ : মরিচ গাছের পাতায় অনেক সময় নানা ধরনের দাগ দেখা যায়। প্রধানত ফুল আসার আগেই এসব দাগ বেশি দেখা যায়। *Alternaria* ও *Cercospora* ছত্রাক দ্বারা এ রোগের সংক্রমন হয়ে থাকে অলটারনারিয়া দ্বারা আক্রান্ত পাতায় বাদামি রঙের চক্রাকার দাগ পড়ে। দাগগুলো অসম আকারের হয়। অনেকগুলো দাগ একত্রিত হয়ে অনেক সময় পাতার অনেকটা অংশ নষ্ট করে ফেলে। অধিক আক্রমণে পাতা শুকিয়ে যায় অনেক সময় এই দাগ ফলেও বিস্তৃত হয় এবং ফল পূর্ণভাবে গঠিত হওয়ার আগেই হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে। কিন্তু সারকোস্পোরা জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট দাগ ছোট বড় ধুসর রঙের কোণাকৃতির হয়ে থাকে; দাগের মধ্যস্থল সাদা ও চারদিকে হলুদ আভা থাকে। অধিক আক্রমণে পাতা ঝরে যায় এবং ফলন কমে যায়।

রোগ নিয়ন্ত্রণ

১) সুষম সার ও সেচের ব্যবস্থা করতে হয়।
২) রোগমুক্ত বীজ বা চারা ব্যবহার করতে হয়
৩) রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম রোভরাল বা ১০ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে ১০ দিন পরপর স্প্রে করতে হয়।
৪) শস্য পর্যায় অনুসরণ করতে হয়।

ঙ. মরিচ পচা রোগ

লক্ষণ : প্রথমে মরিচে কালো কালো দাগ দেখা যায়। পরে এই দাগগুলো বড় হয় এবং মরিচ পচে যায়

রোগ নিয়ন্ত্রণ

১) বেনলেট বা ভিটাভেক্স-২০০ দিয়ে বীজ শোধন করতে হয়।
২) আক্রান্ত হলে ডায়াথেন-এম ৪৫ বা অন্য কোনো কপারজাতীয় ছত্রাকনাশক নিয়মিত স্প্রে করতে হয়।

চ. হলুদ মোজাইক ভাইরাস

রোগের **লক্ষণ** : আক্রান্ত গাছের পাতা সবুজ ও হলুদ মোজাইক আকৃতির ধারণ করে প্রধানত জাবপোকা দিয়ে এ রোগ সংক্রমিত হয়।

রোগ নিয়ন্ত্রণ

১) জাবপোকা দমন করতে হয়।
২) আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়

১৬.১.৯. সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা

রোগবালাই, পোকামাকড়, আগাছা ও ইঁদুর প্রভৃতি ফসলের চরম শত্রু। এসব শত্রুকে সময়মতো দমন না করা গেলে ফসলের সুষ্ঠু বাড়-বাড়তি ও ফলন কম হয়। শুধু একটি শত্রুকে দমন করে ভালো ফসল আশা করা যায় না। ভালো ফসল পেতে হলে সম্মিলিতভাবে সবগুলো শত্রু অর্থাৎ পোকামাকড়, রোগবালাই, আগাছা এবং ইঁদুর প্রভৃতি দমন করতে হয়। সাধারণভাবে রোগবালাই বা পোকামাকড় দমনের জন্য কৃষকগণ বিষাক্ত রাসায়নিক ওষুধের উপর নির্ভরশীল। এসব ওষুধ যেমন তেমনভাবে ব্যবহার করে কৃষকগণ যদিও তাৎক্ষণিক কিছুটা ফল পান, তথাপি ওষুধের অপপ্রয়োগের কারণে অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গগুলোতে সেসব ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়। ফলে এসব পোকামাকড় আর ওষুধ দিয়ে দমন করা যায় না। ফলে নতুন ও বিষাক্ত ওষুধ আরও বেশি ব্যবহার করতে হয়। এতে আবহাওয়া ও ফসলের মধ্যে বিষাক্ত ওষুধ থেকে যায়, যা মানুষ ও গৃহপালিত পশুর ক্ষতি করে। তাছাড়া এ রকম ঢালাওভাবে বিষাক্ত ওষুধ ব্যবহারের ফলে মানুষ ও ফসলের অনেক উপকারী পোকামাকড় ধ্বংস হয় এবং ফসলের ফলন কম হয়। অন্যদিকে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বালাইনাশক ওষুধ ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণ এত বেশি হয় যে, মানুষ বা অন্যান্য জীবকুলের বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়ছে। এসব বিষয়ে বিবেচনা করেই সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করা হয়েছে। ফসল সংরক্ষণ ও ভালো ফলনের জন্য এটি একটি আধুনিক ও উপকারী কলাকৌশল। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো অবস্থাভেদে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে ফসলের বালাই দমন করা এবং একই সময় পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় তার ব্যবস্থা করা। বিষাক্ত ওষুধ কম ব্যবহার করার ফলে ফল-মূলে বিষাক্ত ওষুধ থাকতে পারে না এবং ক্ষতিও হয় না। এ ব্যবস্থাপনায় রোগ, পোকামাকড় ও অন্যান্য বালাই যেমন- আগাছা, ইঁদুর প্রভৃতি দমন করার জন্য রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহারের উপর শুধু জোর না দিয়ে অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে একটা সার্বিক বালাই দমন ব্যবস্থা নেয়া হয়। এসব ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরও যদি পোকা বা রোগবালাইয়ের আক্রমণ বেশি হয়ে আর্থিক ক্ষতির পর্যায়ে পৌছার উপক্রম হয় তখনই রাসায়নিক ওষুধের ব্যবস্থা করতে হয়। এতে করে ক্ষতিকারক ওষুধের ব্যবহার সীমিত হয়, পরিবেশ নির্মল থাকে, উপকারী পোকামাকড় ও জীবজন্তুর জীবন ঝুঁকিমুক্ত থাকে এবং কৃষকের আর্থিক সাশ্রয় হয়। সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা কয়েকটি ধাপে পরিচালিত হয়।

ক. প্রাকৃতিক দমন পদ্ধতি : ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধি এবং ভালো ফলনের জন্য পদ্ধতিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিকভাবে স্বাভাবিক আবহাওয়ায় পোকামাকড় ও রোগজীবাণু বেচে থাকে এবং বংশবিস্তার করে। স্বাভাবিক আবহাওয়ার তারতম্য হলে এসবের বংশ বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। যেমন- গ্রীষ্মকালে যখন আবহাওয়া উষ্ণ থাকে তখন পোকামাকড়ের উপদ্রব বেশি দেখা যায়। শীতকালে তাপমাত্রা কমার ফলে এসবের আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়। আবার স্যাঁতসেঁতে, কম আলোবাতাস ও ছায়াযুক্ত

স্থানে এ সবের আক্রমণ বেশি হয়। বেশি বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা প্রভৃতি ইঁদুর এবং অন্যান্য অনিষ্টকারী পোকার সময়মতো ফসল লাগানো, প্রচুর আলো-বাতাস আছে এমন জায়গায় ফসলের চাষ করা, স্যাঁতসেঁতে ও ছায়াযুক্ত স্থানে ফসলের আবাদ এড়িয়ে চলা প্রভৃতি মেনে চলা উচিত। যেসব জাত রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে সেসব জাতের চাষ করা উচিত। যেসব জাত পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে সে সব জাতে রোগবালাই কম হয়। কারণ পোকার আক্রমণে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় সে ক্ষত দিয়ে অনেক রোগের জীবাণু রোগ সংক্রমণ ঘটায়।

খ. যান্ত্রিক দমন পদ্ধতি : পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় যান্ত্রিক দমন পদ্ধতি খুব কার্যকর। তবে এ পদ্ধতিটি সময়সাপেক্ষ এবং এর জন্য প্রত্যহ ফসল পরীক্ষা করা দরকার। নিচে উল্লেখিত উপায়ে এ পদ্ধতিতে ফসরের বালাই দমন করা যায়।

(১) হাতজাল নিয়ে পোকা ধরা– আক্রান্ত ফসলের উপর দিয়ে হাত জাল টেনে পোকা ধরে মেরে ফেলা যায়।

(২) হাত দিয়ে পোকা সংগ্রহ করা– সাধারণত যেসব পোকা বা পোকার ডিম এক জায়গায় গাদা হয়ে থাকে সেসব পোকা বা ডিম হাত দিয়ে সংগ্রহ করে মেরে ফেলা যায়।

(৩) আক্রান্ত গাছ বা গাছের অংশ পুড়িয়ে ফেলা– রোগাক্রান্ত গাছ বা গাছের অংশ বিশেষ পুড়িয়ে রোগের আক্রমণ ঠেকানো যায়।

(৪) আলো ফাঁদ দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলা – আলোর ফাঁদ পাতলে আলোতে আকৃষ্ট হয়ে পোকা ফাঁদে পড়বে ও মারা যাবে। এজন্য ফাঁদের ভিতর পানির সাথে বিষ বা কেরোসিন তেল রাখতে হয়।

(৫) জমিতে সেচ দিয়ে মাটির অনেক পোকা দমন করা যায়।

(৬) চারা লাগিয়ে চারার গোড়া থেকে ছয় ইঞ্চি বা ১৫ সেন্টিমিটার দূরে আঙ্গুল দিয়ে একটা গোলাকার নালা করে দিয়ে কাটুই পোকার আক্রমণ থেকে মরিচের চারা রক্ষা করা যায়।

গ. জৈব দমন পদ্ধতি : প্রকৃতিতে অনেক উপকারী প্রাণী ও পোকামাকড় রয়েছে যেগুলো ফসলের অনিষ্টকারী পোকামাকড় দমনে সাহায্য করে। যেমন– ব্যাঙ, পাখি, কিছু উপকারী ছত্রাক ও ভাইরাস, বোলতা, লেডিবার্ড বিটল ইত্যাদ। জমিতে বাঁশের অংশ বিশেষ বা কঞ্চি বা গাছের ছোট ছোট ডাল পুঁতে দিলে পাখি এসে তাতে বসে এবং বিভিন্ন রকম পোকা বা কীড়া খেয়ে পোকা দমনে সাহায্য করে। লেডিবার্ড বিটল্স জাব পোকাকে দমন করে। তাই এসব উপকারী প্রাণী ও পোকার যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয় যাতে এসব পোকা ও প্রাণীর বংশবিস্তার সহজে ঘটে।

ঘ. কৃষিতাত্ত্বিক দমন পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়। যথা–

(১) **সময়মতো জমি ভালোভাবে চাষ করা :** জমি যথাসময়ে ভালোভাবে চাষ করা দরকার। এতে করে আগাছা শিকড়সহ উঠে আসবে এবং এমন অবস্থায় কয়েকদিন রেখে দিলেই আগাছা মারা যায়। তাছাড়া ভালোভাবে চাষ করলে রোগজীবাণু ও পোকার কীড়া মাটির নীচে চাপা পড়ে মারা যায়। উরচুঙ্গা, উইপোকা ও কাটুই পোকা প্রভৃতি চাষের ফলে উপরে উঠে আসে এবং পাখি এসব পোকা ধরে খেয়ে ফেলে। জমিতে ভালোভাবে চাষ করলে মাঠের জঞ্জাল মাটির নিচে যায় এবং তা পচে সার হয়। এতে করে পরবর্তী ফসলে পোকা ও রোগবালাইয়ের আক্রমণের সুযোগ অনেকাংশে কমে যায়। কারণ জঞ্জাল পোকামাকড় ও রোগজীবাণুর একটি প্রকৃত আশ্রয়স্থল।

(২) **সঠিক দূরত্বে চারা লাগানো বা বীজ বপন :** সঠিক দূরত্বে চারা লাগালে বা বীজ বোনা হলে ফসল সঠিকভাবে আলোবাতাস ও খাদ্য পেয়ে বেড়ে উঠে। এতে করে ফসল সুস্থ ও সবল হয় এবং রোগ ও পোকামাকড় তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে না। ঘন করে চারা লাগালে বা বীজ বোনা হলে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি হতে দেখা যায়।

(৩) **আগাছা দমন :** আগাছা ফসলের খাদ্য ও আলোবাতাসে ভাগ বসিয়ে আসল ফসলকে সেই সব দরকারি জিনিস থেকে বঞ্চিত করে। তাছাড়া আগাছা ফসলের অনিষ্টকারী পোকামাকড় ও রোগ জীবাণুকে আশ্রয় দেয় ও এদের বংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আগাছার বীজ ফসলের বীজের সাথে মিশে যায় ও পরবর্তীতে সেই বীজ জমিতে ব্যবহার করলে নতুন করে আগাছা দেখা দেয়। এসবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জমি এবং জমির আইল আগাছামুক্ত রাখা দরকার। তাছাড়া আগাছা ছোট অবস্থায় দমন করা দরকার। জমিতে আগাছা থাকা মানেই পোকামাকড় ও রোগজীবাণু এবং ইঁদুরের আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

(৪) **সার ব্যবস্থাপনা :** সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার ভালো ফলনের জন্য একটি পূর্বশর্ত। গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও ভালো ফলনের জন্য গাছের বিভিন্ন রকমের খাদ্য দরকার। এসব খাদ্যের যে কোনো একটির কম বা বেশি হলে ফসলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি হয়। নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগের ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হয়। কারণ নাইট্রোজেন সার একবারে প্রয়োজনের বেশি দিলে ফসলের দৈহিক বৃদ্ধি খুব বেশি হয় এবং রোগ ও পোকার আক্রমণ বেশি হয়। নাইট্রোজেন সার দেয়ার আগে জমি থেকে সব আগাছা তুলে ফেলতে হয়। এই সার একবারে না দিয়ে ২-৩ বারে দেওয়া উচিত। এতে করে ফসলের বৃদ্ধি সঠিক মাত্রায় হয় এবং বিভিন্ন রকম বালাই

কম হয়। ফসলে ফসফরাসের ঘাটতি হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। পটাশের অভাব হলে রোগ প্রতিরোধ শক্তি এবং শিকড়ের বৃদ্ধি কম হয়। দস্তা বা জিঙ্কের পরিমাণ কম হলে নেমাটোডের আক্রমণ বেশি হয়, সুতরাং ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও ভালো ফলনের জন্য সঠিক পরিমাণে ও সময়মতো সার প্রয়োগ অবশ্যই দরকার।

(৫) **পানি ব্যবস্থাপনা** : পানি গাছের প্রাণ। মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। অন্যদিকে জমিতে জলাবদ্ধতা হলে (ধান ছাড়া) ফসলের ভীষণ ক্ষতি হয়। জলাবদ্ধ হলে গাছ মারা যায়। সুতরাং ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও ভালো ফলনের জন্য সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা থাকা আবশ্যক। সেচ দিয়ে ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ছাড়াও পোকা দমন করা যায়। যেমন- উইপোকা, পিঁপড়া, কাটুই পোকা মাটির নিচে থাকে। জমিতে সেচ দিলে এসব পোকা সহজেই দমন করা যায়। তাছাড়া ফসলের বৃদ্ধি সঠিকভাবে হলে রোগবালাই ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে।

(৬) **পর্যায়ক্রমে ফসলের চাষ** : ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধি, ভালো ফলন, রোগবালাই, পোকামাকড় এবং আগাছা দমনের জন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের চাষ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। একই জমিতে একই ফসল পরপর চাষ করা উচিত নয়। এজন্য ২-৩ বছরের শস্য পর্যায় ঠিক করে নেয়া দরকার। সাধারণভাবে একই ধরনের পোকা নির্দিষ্ট কোনো একটি ফসলে আক্রমণ করে, অন্য ফসলে আক্রমণ করে না। সুতরাং একই জমিতে যদি একই ফসল পরপর করা হয় তাহলে সেই সব পোকার আক্রমণ বেশি হয়। এসব সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো একই জমিতে বারবার একই ধরনের ফসলের চাষ না করে বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাষ করা।

(৭) **আগাম জাতের চাষ** : আগাম ফসলের চাষ করে পোকার আক্রমণ অনেক সময় এড়ানো যায়। সাধারণভাবে দেরিতে ফসলের আবাদ করলে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব বেশি হয়।

(৮) **সুস্থ বীজ বা চারা ব্যবহার করা** : রোগ ও পোকা মুক্ত বীজ ব্যবহার করে ভালো ফসল আশা করা যায়। এজন্য আক্রান্ত ফসল থেকে কোনো ভাবেই বীজ রাখা ঠিক নয়। তাছাড়া বীজ শোধন করে বুনলে ফসলে বালাইয়ের আক্রমণ অনেকাংশেই কমে যায়।

৩. **রাসায়নিক দমন পদ্ধতি** : রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহার করার আগে নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর ব্যবহারকারীর জ্ঞান থাকা দরকার।

১) রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহারের আগে ফসল কি ধরনের রোগ জীবাণু বা পোকার আক্রমণ হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখতে হয়।

২) ওষুধ ছাড়া আর যেসব পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা দমন করা সম্ভব কি-না তা যাচাই করতে হয়।

৩) ঝড় বৃষ্টির দ্বারা ফসলের ক্ষতির লক্ষণকে অনেকেই পোকার আক্রমণ বলে ধরে নেয়। এ অবস্থায় ওষুধের ব্যবহার এড়িয়ে চলতে হয়।

৪) আক্রমণের হার ফসলের 'আর্থিক ক্ষতির ন্যূনতম পর্যায়' অতিক্রম করেছে কি-না তা পূর্বে পরীক্ষা করতে হয়। এরপর ঠিক করতে হয় কোন ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করা দরকার।

৫) উপকারী পোকমাকড় ও পাখির কোনো ক্ষতি যেন না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হয়।

৬) ওষুধ অনুমোদিত মাত্রার কম বা বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। কম ব্যবহার করলে বালাই দমন হয় না। অন্যদিকে বেশি ব্যবহার করলে আর্থিক ক্ষতি হয় এবং সেই সাথে ফসলের ক্ষতিও হতে পারে। ওষুধের মেয়াদকাল শেষ হয়ে গেলে বা অতি পুরাতন হয়ে গেলে সেগুলো ব্যবহার করা উচিত নয়।

৭) বালাইনাশক ওষুধ ব্যবহারের সময় ওষুধের সর্বনিম্ন অনুমোদিত হারে প্রথমে ব্যবহার করতে হয়। কোনো সময়ই বেশি হারে ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। এতে করে শত্রু দমনের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

৮) যেসব ওষুধ পানির সাথে মিশিয়ে ফসলে স্প্রে করতে হয় সে সব ওষুধে সঠিক পরিমাণ পানি ব্যবহার করতে হয়। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পানি দিলে ওষুধের কার্যকারিতা কমে যাবে। আবার কম পানি ব্যবহার করলে ওষুধের ঘনত্ব বেশি হয় এবং গাছের পাতা সম্পূর্ণ ভেজে না। এতে ওষুধ দেয়ার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। স্প্রেতে সব সময়েই পরিষ্কার পানি ব্যবহার করা উচিত।

চ. বালাইনাশক ওষুধ ব্যবহার : ফসলে রোগবালাই বা পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলেই তা দমন করার জন্য বালাইনাশক ওষুধ ব্যবহার করতে হয় এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কারণ এমন পর্যায় আছে যেখানে এসব বালাই দমন না করলেও ফসলের কোনো ক্ষতি হয় না। এ পর্যায়কে ফসলের 'আর্থিক ক্ষতির ন্যূনতম পর্যায়' বলে। পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণে ফসলের ও ন্যূনতম পর্যায়ে যে ক্ষতি হয় এ সময় ওষুধ ব্যবহার করার ফলে তার চেয়ে বেশি খরচ পড়বে। এজন্য কৃষি বিজ্ঞানীগণ ফসলের নূন্যতম ক্ষতির পর্যায় অতিক্রম না করা পর্যন্ত বালাইনাশক ওষুধ ব্যবহারের উপদেশ দেন না। সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি তখনই কার্যকরী হয় যখন কোনো একটি এলাকার সকল কৃষক একত্রে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। একজন কৃষক শুধু তার জমিতে যদি বালাই দমন করেন এবং পাশের জমিতে কোনো রকম দমনের ব্যবস্থা না নেয়া হয়, তাহলে পরবর্তীতে সেই বালাই তার জমিতে আবার আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং এ থেকে সবচেয়ে বেশি সুফল পেতে হলে সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হয়।

১৬.১.১০. মরিচ সংগ্রহ, শুকানো ও সংরক্ষণ

মরিচ সংগ্রহ : শীতকালে রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর এবং গ্রীষ্মকালে ৪০-৫০ দিন পর কাঁচা মরিচ উঠানো যায়। মরিচ সাধারণত ৩-৮ পর্যায়ে তুলতে হয়।

শুকনা মরিচের জন্য আধাপাকা মরিচ তুললে মরিচের রঙ ও গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়। সে জন্য মরিচ সম্পূর্ণ পেকে গেলে তুলতে হয়। এতে রঙ এবং ওজন ভালো থাকে। মরিচ তোলার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হয় যাতে বোঁটা ছিঁড়ে না যায় এবং গাছের ক্ষতি না হয়।

মরিচ শুকানো : ঘরের চালে বা পরিষ্কার উঠানে চাটাই, চট ইত্যাদি বিছিয়ে মরিচ শুকানো হয়। প্রথম ৩-৪ দিন প্রতিদিন রোদে শুকানোর পর সন্ধ্যায় ঘরে বা ছায়াযুক্ত স্থানে একত্রে রেখে দিয়ে পরবর্তীকালে ২ দিন পর পুনরায় আগের নিয়মে ১-২ দিন শুকাতে হয়। এর ফলে মরিচের রঙ উজ্জ্বল হয়। মরিচ শুকানোর সময় মরিচের বোঁটা যেন খুলে না যায় সে দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়। এছাড়া শুকনা মরিচে যাতে বৃষ্টির পানি না পড়ে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। শুকনা অবস্থায় বৃষ্টির পানি পড়লে মরিচের বোঁটা পচে যায় এবং রং নষ্ট হয়ে যায় যা বিক্রির সময় মরিচের মূল্য কমিয়ে দেয়।

মরিচ সংরক্ষণ : মরিচ শুকানোর পর মাচার উপরে টিনের ডোল, গোলা, বেড়ি, পলিথিন বা ড্রামে রাখতে হয়। চাটাইয়ের বেড়িতে মরিচ ভালো থাকে না। মরিচের গোলা এমন হওয়া উচিত যেন বাহির থেকে বাতাস ঢুকতে না পারে। বাতাস ঢুকলেই মরিচের রঙ নষ্ট হয়ে যায়। ইঁদুর থেকে বিশেষ সতর্ক হতে হয় কারণ ইঁদুর গোলাতে প্রবেশ করলে মরিচ কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলবে. এছাড়া তেলাপোকাও মরিচের ক্ষতি করে থাকে। মরিচের গোলা ছায়াযুক্ত, স্যাঁতসেঁতে জায়গায় নির্মাণ করা যাবে না। যেসব ঘরের উপর গাছের ছায়া পড়ে না এবং স্যাঁতসেঁতে জায়গায় অবস্থিত নয় কেবল সেসব ঘরেই মরিচের গোলা তৈরি করা উচিত।

১৬.১.১১. মরিচ উৎপাদনের প্রাক্কলিত আয়-ব্যয়

মরিচ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। যদিও এর উৎপাদন ব্যয় অন্যান্য ফসলের তুলনায় কিছুটা বেশি, তবে সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যত্ন সহকারে চাষ করলে মুনাফাও অনেক বেশি। বগুড়া অঞ্চলের মাঠ থেকে পাওয়া তথ্যের আলোকে মরিচ উৎপাদনের একটি সম্ভাব্য আয়-ব্যয় প্রাক্কলন নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে, যেখানে মরিচের হেক্টর প্রতি নিট মুনাফা দেশী জাতের ক্ষেত্রে টাকা ৬৯,০৫০ টাকা এবং হাইব্রিড জাতের ক্ষেত্রে টাকা ১,৪৩,৯৫৫ টাকা পাওয়া গেছে।

ক. প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (হেক্টর প্রতি)

ব্যয়ের খাত	উপকরণ	পরিমাণ	একক দর (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
১. বীজতলা তৈরি	-	-	-	৩০০০
২. জমি তৈরি	হাল ও মই	৫০টি	৬০	৩০০০
	শ্রমিক	৪০ জন	৫০	২০০০

৩. বীজ বপন বা চারা রোপণ	বীজ (বপন)	৩ কেজি	২০০	৬০০
	শ্রমিক	৩০ জন	৫০	১৫০০
৪. সার প্রয়োগ	গোবর সার	১৫ টন	৫০০	৭৫০০
	খৈল	১৫০ কেজি	৮	১২০০
সার প্রয়োগ	ইউরিয়া	২০০ কেজি	৬	১২০০
	টিএসপি	২০০ কেজি	১৪	২৮০০
	এমপি	২০০ কেজি	১০	২০০০
	জিপসাম	১০০ কেজি	১০	২০০০
	জিঙ্ক সালফেট	১০ কেজি	৪৫	৪৫০
	শ্রমিক	৩০ জন	৫০	১৫০০
৫. পানি সেচ (৪ বার)	পানি	৪ বার	৪৫০	১৮০০
	শ্রমিক	৩০ জন	৫০	১৫০০
৬. আগাছা দমন	শ্রমিক	১৫০ জন	৫০	৭৫০০
৭. পোকা-মাকড় ও রোগ দমন	রাসায়নিক ওষুধ	-		৪০০০
	শ্রমিক	১৬ জন	৫০	৮০০
৮. মরিচ তোলা (৪ বার)	শ্রমিক	৯০ জন	৫০	৪৫০০
৯. মরিচ শুকানো (৮ দিন)	শ্রমিক	৬০ জন	৫০	৩০০০
১০. ওজন ও গোলাজাত-করণ	শ্রমিক	১৬ জন	৫০	৮০০
সর্বমোট ব্যয়(দেশী জাত)	৫২৬৫০			
সর্বমোট ব্যয় (হাইব্রিড জাত) ১০% বৃদ্ধি হিসেবে	৫৭৯১৫			

খ. প্রাক্কলিত মোট আয়

দেশী জাত			হাইব্রিড জাত		
ফলন/হেক্টর শুকনা (কেজি)	কেজি প্রতি দর (টাকা)	মোট আয় (টাকা)	ফলন/হেক্টর শুকনা (কেজি)	কেজি প্রতি দর (টাকা)	মোট আয় (টাকা)
১,৫০০	৮০.০০	১,২০,০০০	২,৫০০	৮০,০০০	২,০০,০০০

গ. প্রাক্কলিত নিট মুনাফা/হেক্টর

দেশী জাত	হাইব্রিড জাত
টাকা ৬৯,০৫০ (টাকা ৯,২৪৩/বিঘা)	টাকা ১,৪৩,৯৫৫ (টাকা ১৯,২৭১/বিঘা)

সূত্র : বগুড়া অঞ্চলের মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী

১৬.২. আদা

আদা প্রধান অর্থকরী মশলাসমূহের অন্যতম। এটি উদ্ভিদতত্ত্বে *Zingiber officinale* নামে পরিচিত এবং Scitamineae গোত্রের অন্তর্গত। আদা একটি উৎকৃষ্ট মশলা। মাংস রান্নায় আদা অপরিহার্য। নানা প্রকারের আচার চাটনি, কেচাপ, কেক, মোরব্বা প্রভৃতি তৈরিতে আদার ব্যবহার দেখা যায়। আদা হতে জিঞ্জার বিয়ারও (Ginger Beer) তৈরি হয়। হজমিকারক, অগ্নিবর্ধক, রুচিকারক, শূল নিবারক এবং স্বর ও শুক্রবর্ধক হিসেবে কাজ করে।

উৎপত্তি : এশিয়ার গ্রীষ্মপ্রধান এলাকায় আদার উৎপত্তিস্থল। আদার প্রধান উৎপাদনকারী স্থানের মধ্যে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম আফ্রিকা, বাংলাদেশ, ভারত, উত্তর আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, চীন ও জাপান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জামাইকা ল্যান্ড অব জিঞ্জার নামে পরিচিত।

আদার জাত : আদার উদ্ভিদতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ সুস্পষ্ট নয়। বাণিজ্যিক আদার মধ্যে বোল্ড জামাইকা, কালিকাট বা কোচিন, জাভানিজ এবং ওয়েস্ট আফ্রিকান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে আদা উৎপাদনের স্থান অনুসারে রংপুরী, খুলনা, টেংগুরা জাত ইত্যাদি নামে পরিচিত।

১৬.২.১. উৎপাদন পদ্ধতি

জমি ও মাটি : আদার জন্য কিছু ছায়াযুক্ত, দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। জমি চাষ দ্বারা মাটি বেশ ঝুরঝুরে করার পরে আদার রাইজোম সারিতে গভীর নালায় রোপণ করতে হয়।

বীজ রোপণ : বীজ রোপণের পর খড়কুঁটা দ্বারা ঢাকতে পারলে ভালো হয়।

আন্ত ফসল : আম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি বৃক্ষের বাগানে আন্তঃফসল হিসেবেও আদার চাষ করা যেতে পারে।

পরিচর্যা : খরার সময় পানি সেচ দিয়ে আদার ফলন বাড়ানো যায়। মাঝে মাঝে আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। পানি নিকাশ ব্যবস্থা সুষ্ঠু না হলে গাছ পচে যেতে পারে।

সংগ্রহ : রোপণের প্রায় ৯-১০ মাস পরে ডিসেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি মাসে পাতা শুকালে পাতা কেটে দিয়ে আদা সংগ্রহ করা যায়।

ফলন : আদার হেক্টর প্রতি ফলন ৭-১১ টনের মতো। আদার গায়ে সংলগ্ন শিকড়, মাটি ইত্যাদি পরিষ্কার করে ও ধুয়ে, রোদে শুকিয়ে গুদামজাত করা হয়।

বাণিজ্যিক আদা হ্যান্ডস (Hands) বা রেসেস (Races) নামে পরিচিত। কোনো কোনো আদা বাকলযুক্ত (Unpeeled) এবং বাকলবিহীন অবস্থায় রপ্তানি করা হয়। বাকলযুক্ত আদা ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিলেই হয়। অপরপক্ষে, আদা গরম পানিতে একটু ডুবিয়ে নিয়ে ছুরি দিয়ে বাকল সরিয়ে বাকলবিহীন আদা তৈরি করা হয়।

চিত্র ১৩.২ : পূর্ণাঙ্গ আদা গাছ

পোকা দমন : আদার মাছি পোকা এবং স্কিপার পোকা প্রধান

রোগ দমন : আদার নরম পচা রোগ খুবই ক্ষতিকর। এ রোগ দেখা দিলে দমনের ব্যবস্থা করতে হয়

১৬.৩. হলুদ

হলুদ অন্যতম প্রধান মশলা এবং একটি প্রধান অর্থকরী শস্য। এটি উদ্ভিদতত্ত্বে *Curcuma domestica* অথবা *C. longa* নামে পরিচিত এবং *Scitamineae* গোত্রভুক্ত।

এদেশে এমন অনুষ্ঠান প্রায় নেই বললেই চলে যাতে হলুদের ব্যবহার হয় না। সম্প্রতি হলুদ হতে কারকিউমিন (Curcumine) নামক একটি অতি মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য নিষ্কাশন পদ্ধতির কাজে এবং বার্নিশ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয় হলুদ উৎপাদনকারী স্থানসমূহের মধ্যে ভারত, বাংলাদেশ এবং ফর্মোজা প্রধান।

মাদ্রাজি, ইরোদ (Erode), পাটনাই, ফর্মোজা, প্রভৃতি হলুদের জাত বিখ্যাত দেশী হলুদের মধ্যে আদাগতি, আরানী, মহিষ- বাট, বাঁশবাড়িয়া, হরিণবলী, ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য সাধারণভাবে দেশী হলুদ অপেক্ষা বিদেশী হলুদ আকারে বড় এবং কম ঝাঁঝযুক্ত। দেশী হলুদ বর্ণ ও স্বাদের দিক হতে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. গাঢ় বর্ণ, খ. হাল্কা বর্ণ।

বাংলাদেশে ডিমলা ও সিন্দুরী নামক দুটি উচ্চ ফলনশীল জাত বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে

গাঢ় বর্ণ হলুদ : অভ্যন্তরীণ বর্ণ গাঢ়, ত্বক লালচে ভাবাপন্ন, ছড়া বেঁটে, মোটা ও সংখ্যা অধিক কাঁচা হলুদ তিক্ততাবিহীন। এটি দেশীয় জাতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। এর একটি উপজাতের পাতার লালচে ভাবাপন্ন বোঁটা দেখা যায় এর চাষ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হাল্কা বর্ণ হলুদ : অভ্যন্তরীণ বর্ণ হাল্কা হলুদ, ত্বক ধূসরাভ, ছড়া দীর্ঘ ও সরু এবং সংখ্যায় অল্প। কাঁচা হলুদ তিক্ততাযুক্ত। এর চাষ প্রায় সর্বত্র দেখা যায়।

হলুদের গুরুত্ব : পাকিস্তানসহ বিদেশে হলুদের চাহিদা রয়েছে। হলুদের অভ্যন্তরীণ মূল্যও বেশি। এসব কারণে হলুদের চাষ বৃদ্ধি করে যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করা সম্ভব

উৎপাদন পদ্ধতি : হলুদের জন্য দোআঁশ হতে বেলে দোআঁশ মাটি বিশেষ উপযোগী। জমি উঁচু ও পানি নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হয়।

বীজ রোপণ : বীজরূপে মোথা কিংবা ছড়া রোপণ করা হয়। কাণ্ডের নিম্নস্থ এ মোথা ছড়া অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তবে মোথা ওজনে অনেক বেশি বলে এর ব্যবহার যেখানে ১৫০০-৭৫০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়, সেখানে ছড়ার ব্যবহারে ৩৭০-৭৫০ কেজি বীজ লাগে।

জমি তৈরি : রোপণের জন্য জমি বার বার চাষ দিয়ে বেশ ঝুরঝুরে করে নেওয়া উচিত ভালোভাবে চাষ করা জমিতে সারিতে মাটির উপরে বীজ স্থাপন করে সারির

উভয় পার্শ্ব হতে মাটি এনে বীজের উপরে ১০-১৩ সেন্টিমিটার উচ্চ ভেলি বা রেইজ (ridge) তৈরি করা হয়।

হলুদের জন্য আগাছা বাছাই ও পানি নিকাশ ব্যবস্থা প্রধান কাজ। তা ছাড়া শুষ্ক ঋতুতে পানি সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে।

পোকা দমন : হলুদের প্রধান কীটশত্রু স্কিপার পোকা ও থ্রিপস পোকা।

হলুদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : গাছের পাতা শুকিয়ে গেলে পাতা কেটে দিয়ে তার ১০-১২ দিন পরে হলুদ সংগ্রহ করা হয়। হলুদ সিদ্ধ করে শুকানোর পর প্রতি ৪০ কেজি কাঁচা হলুদ হতে ১০ কেজি শুকনা হলুদ পাওয়া যায়। শুকনা হলুদের হিসেবে হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ১২-১৪ টন।

হলুদ সিদ্ধ করার পদ্ধতি : হলুদ কোনো ধাতু বা মাটির তৈরি পানি ভর্তি পাত্রে ধীরে ধীরে জ্বাল দিয়ে ৩০-৪০ মিনিট ধরে সিদ্ধ করা হয়।

সিন্দুরী জাত : সিন্দুরী জাতের হলুদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে.

(১) স্থানীয় জাতের তুলনায় ফলন দ্বিগুণ।
(২) গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সেন্টিমিটার
(৩) হলুদের ছড়া মাঝারি।
(৪) বপনের পর থেকে প্রায় ২৫০-২৯০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়
(৫) শাঁস আকর্ষণীয় গাঢ় হলুদ.
(৬) প্রতি ৪০ কেজি কাঁচা হলুদের ১০ কেজি শুকানো হলুদ হয় (৪ : ১)।
(৭) লিফ ব্লাইট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন

ডিমলা জাত : ডিমলা জাতের হলুদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে-

(১) গাছ উচ্চতায় প্রায় ১০৫-১২৫ সেন্টিমিটার।
(২) স্থানীয় জাতের তুলনায় ফলন তিনগুণ বেশি।
(৩) বপনের পর প্রায় ২৮০-৩২০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়।
(৪) হলুদের ছড়া চওড়া।
(৫) প্রতি ৪০ কেজি কাঁচা হলুদে ৮ কেজি শুকানো হলুদ পাওয়া যায় (৫:১)
(৬) লিফ ব্লাইট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।
(৭) হেক্টর প্রতি ফলন ২৮-৩২ টন

১৬.৪. পেঁয়াজ

পেঁয়াজ একটি অপরিহার্য ধরনের মসলা এবং সবজি। পেঁয়াজের বৈজ্ঞানিক নাম *Allium cepa* এবং Liliaceae গোত্রভুক্ত। পেঁয়াজ বাল্ব জাতীয় শস্য।

পেঁয়াজের জাত : পেঁয়াজকে সাধারণভাবে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা- দেশী ও বিদেশী।

দেশী বা সাঁচি পেঁয়াজ আকারে ছোট। বেশ শক্ত এবং ঝাঁঝ অধিক থাকে। এ জাতীয় পেঁয়াজের বহুসংখ্যক গেড় হয়। দেশী পেঁয়াজ লাল বর্ণের হয়। তবে কিছু সাদা পেঁয়াজও দেখা যায়। দেশীয় বা পাটনাই শ্রেণীর পেঁয়াজ আকারে বড় ও মিষ্টি ভাবাপন্ন হয় এবং বর্ণ সাদা। আমেরিকার স্থানীয় পেঁয়াজের আকার ছোট, গড়ন দৃঢ় ঝাল অধিক বারমুডা ও স্পেনিশ শ্রেণীর পেঁয়াজ সাধারণভাবে বড় আকারের। বারমুডা শ্রেণীর মধ্যে ইয়েলো বারমুডা এবং ক্রিস্টাল ওয়াক্স সাদা উল্লেখযোগ্য। টেক্সাসের আর্লি গ্রানো আশু জাতীয় গোলাকার হলুদ জাত। ইয়োলে সুইট স্পেনিশ ও একটি উৎকৃষ্ট হলুদ জাত। বিভিন্ন লাল জাতের মধ্যে রেড ক্রিয়োল এবং ইটালিয়ান রেড উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য সাদা জাতের মধ্যে হোয়াইট গ্রানের এবং হোয়াইট সুই স্পেনিশ উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের উন্নত পেঁয়াজের জাতসমূহের মধ্যে রয়েছে–

বারিপেঁয়াজ ১ : নির্বাচনের মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে বারিপেঁয়াজ ১ জাতটি অবমুক্ত করা হয়।

(১) জাতটির কন্দের আকার চ্যাপ্টা, গোলাকার।
(২) বোঁটা চিকন, মধ্যমাকৃতির।
(৩) গাছ উচ্চতায় ৫০-৫৫ সেন্টিমিটার।
(৪) কন্দ লালচে পাটল বর্ণের।
(৫) অধিক ঝাঁঝযুক্ত।
(৬) প্রতি গাছে ১০-১২টি পাতা হয়।
(৭) প্রতি শুষ্ক কন্দের ওজন প্রায় ৩০-৪০ গ্রাম
(৮) এ জাতের পেঁয়াজের সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি।
(৯) পারপেল ব্লচ ও স্টেম ফাইলিয়াম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।
(১০) হেক্টর প্রতি ফলন ১২-১৬ টন।
(১১) হেক্টর প্রতি বীজের ফলন ৮০০-১০০০ কেজি।

১৬.৪.১. উৎপাদন পদ্ধতি

হাল্কা বেলে দোআঁশ হতে দোআঁশ মাটির পেঁয়াজ চাষের জন্য ভালো তবে pH মান ৫.৫ হতে ৬.৫ হলে খুব ভালো হয়। পেঁয়াজের চাষের জন্য বার বার চাষ দিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে করে নেয়া আবশ্যক।

বীজ বপন : বীজ তলায় বীজ বুনে চারা উৎপন্ন করে সে চারা জমিতে রোপণ করতে হয়। শল্ককন্দ রোপণ করা যায়। বীজ রোপণের জমিতে বীজ বপন করেও পেঁয়াজের চাষ করা হয়।

বীজ হার : বীজ পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ২.৫-৪ কেজি বীজ, কন্দ পদ্ধতিতে প্রায় ৫৫০ কেজি শল্ককন্দ।

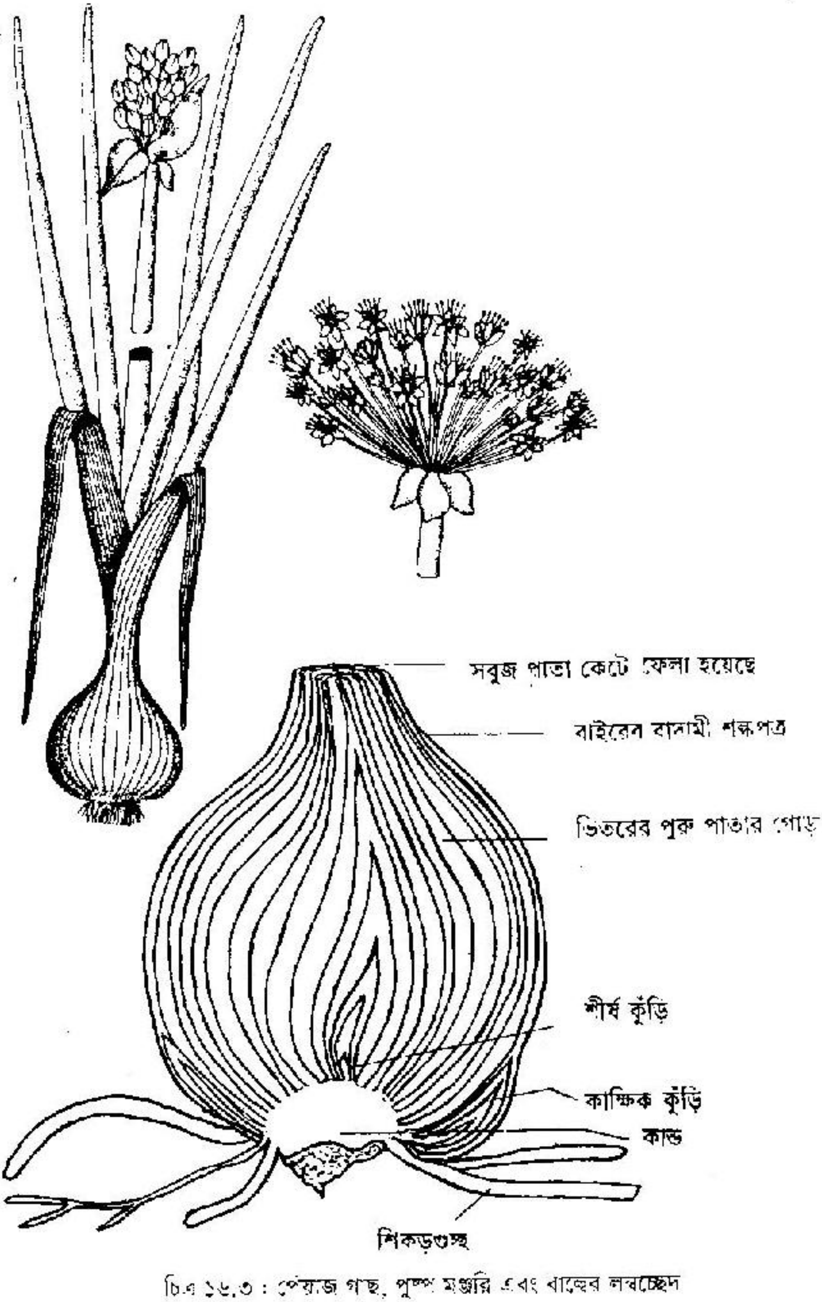

চিত্র ১৬.৩ : পেঁয়াজ গাছ, পুষ্প মঞ্জরি এবং বাল্বের লম্বচ্ছেদ

চারা উৎপাদন : ৩ মিটার × ৯ মিটার আকারের বীজতলায় জন্য ২০-৩০ গ্রাম বীজের দরকার পড়ে। বীজ বপনের পরে বীজগুলোর ৫-৬ সেন্টিমিটার পুরু বালি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

বীজ বপন সময় : অক্টোবর-নভেম্বর মাস বীজতলায় বা জমিতে বীজ বপনের সময়। সরাসরি বীজ সারি করে বোনা উচিত।

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার প্রতি সারিতে ৩০ সেন্টিমিটার দূরত্ব অন্তর ৫-৬টি চারা রাখা যায়। চারা রোপণের ক্ষেত্রে তা করা যায় বীজ বপনের প্রায় এক মাস পরে। সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার এবং সারিতে চারা দূরত্ব ৮-১৬ সেন্টিমিটার রাখতে হয়। শল্ককন্দ রোপণ দ্বারা আগাম শস্য উৎপন্ন করা যায়। বিদেশী বড় জাতের পেঁয়াজের বীজ হতে যে চারা হয় তা হতে প্রথম বছর বীজ উৎপন্ন করা যায় না। সাধারণত ১-২ সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট পেঁয়াজ ৩০-৪০ সেন্টিমিটার দূরত্বে সারিতে পেঁয়াজের জাত অনুসারে ৮-১৬ সেন্টিমিটার ব্যবধানে রোপণ করা যেতে পারে। পেঁয়াজের জমি চাষ দিয়ে মাটি ভেঙে দেয়া আগাছা দমন এবং পানি সেচের ব্যবস্থা করা উচিত।

সার প্রয়োগ : গোবর, সার, খৈল ও টি, এস, পি সার জমি প্রস্তুতকালে এবং ইউরিয়া ও মিউরেট অব পটাশ সার চারা ১৫-১৮ সেন্টিমিটার উঁচু হওয়ার পরে সারির ফাঁকে মালচিং এর পূর্বে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পরিচর্যা : গেঁড় লাগানো গাছ যে কলি বের হয় তা শুরুতে ভেঙে দিতে হয়। কলি তরকারি কিংবা সালাদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। বীজের উদ্দেশ্যে পেঁয়াজ ফসলের যে অংশ রাখা হয়, সেখানে ইউরিয়া ও পটাশ সার প্রয়োগ কালে হেক্টরপ্রতি ১০ কেজি হিসেবে টিএসপি সার দ্বিতীয় দফায় প্রয়োগ করা যায়।

বীজ উৎপাদন : বীজ তৈরি করার উদ্দেশ্যে বীজ অনেক ঘন করে বোনা যায়। ফলে একই জমি হতে কয়েকগুণ বেশি সংখ্যায় ছোট আকারের পেঁয়াজ পাওয়া যায়। এগুলো সংরক্ষণ করে পরবর্তী বছরে ঘনভাবে রোপণ করলে সে শস্য হতে অনেক বেশি পরিমাণে বীজ পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ : পেঁয়াজের গাছ নিজে নিজে শুকিয়ে যায়। তখন পেঁয়াজ ভালোভাবে পরিপক্ব হয় এবং উঠানোর উপযোগী হয়।

ফলন : দেশী পেঁয়াজের হেক্টরপ্রতি ফলন ৭-১৫ টন।

সংরক্ষণ : পেঁয়াজ ভালো করে শুকানোর পরে গুদামজাত করতে হয়

(১) গুদাম ঠাণ্ডা ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাযুক্ত হওয়া উচিত।

(২) গুদামে পরীক্ষা করে পচা ও রোগাক্রান্ত পেঁয়াজ বেছে সরিয়ে ফেলতে হয়।

(৩) ঠাণ্ডা গুদামে ৩৪ ফাঃ তাপে এবং শতকরা ৬৪ ভাগ আর্দ্রতায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা হয়

(৪) গেঁড় এর বেলায় এদেরকে শেষের কয়েক সপ্তাহ ৭ ডিগ্রি হতে ১২.৭ ডিগ্রি সিলসিয়াস তাপে রাখা উত্তম।

পোকা দমন : থ্রিপস্ পোকা (Thrips) পেঁয়াজের পাতার রস শোষণ করে। এগুলোকে ০.০৫ ভাগ শক্তির ডাইমেক্রণ বা সেভিন ছিটিয়ে দমন করা যায়। টি.ই.পি.পি. প্রয়োগেও উপকার পাওয়া যায়।

রোগ দমন : গুদামে ও স্থানান্তর কালে ধূসর পচা রোগে (grey neck-rot) পেঁয়াজের ঘাড়ের দিক পচে যায়। সে জন্য জমি হতে সাবধানে পেঁয়াজ তুলতে হয় এবং গুদামজাত করার আগে পেঁয়াজ ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হয়।

বারি পেঁয়াজ-১ এর উৎপাদন পদ্ধতি

মাটি : দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি পেঁয়াজ চাষের জন্য উত্তম।

আবহাওয়া : ১৫-২৫ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পেঁয়াজের শল্ককন্দ উৎপাদনের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

বপন বা রোপণ পদ্ধতি ও সময় : পেঁয়াজ সরাসরি বীজ বুনে, শল্ক কন্দ ও চারা রোপণ করে উৎপাদন করা হয়। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে বীজ তলায় বপন করতে হবে

বীজের তৈরি ও বীজের পরিমাণ : বীজতলা ৩×১ মিটার আকারের হতে হবে প্রতি বীজতলায় ২৫-৩০ গ্রাম হিসেবে বুনতে হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে চারা উৎপাদনের জন্য ১২ ১৩০টি (৩×১) মিটার বীজতলার প্রয়োজন হবে। অপরদিকে সরাসরি জমিতে বীজ বুনলে হেক্টর প্রতি প্রায় ৬-৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। কন্দের আকারভেদে হেক্টর প্রতি ১২০০-১৫০০ কেজি শল্ককন্দের প্রয়োজন হয়।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ : জমি গভীর চাষ ও মই দিয়ে আগাছা বেছে, মাটির ঢেলা ভেঙে সমতল করে তৈরি করতে হবে

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি : হেক্টর প্রতি ২৫০-২৬০ কেজি ইউরিয়া, ১৮০-২০০ কেজি টিএসপি. ১৪০-১৬০ কেজি এমপি এবং ৭-১০ টন গোবর সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি, এবং ইউরিয়া ও এমপি সারের অর্ধেক পরিমাণ জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি চারা রোপণের ২৫ এবং ৫০ দিন পর দুই কিস্তিতে ক্ষেতে প্রয়োগ করতে হবে। শল্ককন্দ বা সরাসরি বীজ বপন করে চাষ করার ক্ষেত্রেও মোটামুটিভাবে এ নিয়ম অনুসরণ করতে হবে

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা : পেঁয়াজের জমিতে মাটির প্রয়োজনীয় রস না থাকলে প্রতি ১০-১৫ দিন অন্তর পানি সিচ আবশ্যক। তবে পেঁয়াজ সংগ্রহের দুই সপ্তাহ আগে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। পেঁয়াজের কন্দ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফসলে ফুলের কলি দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই তা ভেঙে দিতে হবে। পেঁয়াজ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সুতরাং পেঁয়াজের জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুবিধা থাকতে হবে।

বারিপেঁয়াজ ১-এর বীজ উৎপাদন পদ্ধতি

ক. **সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি :** জমি তৈরির সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিঙ্ক, বোরন এবং ইউরিয়া এর চার ভাগের একভাগ এবং এমপি

সারের দুই ভাগের একভাগ মেশাতে হবে। পরবর্তীতে নাইট্রোজেন সমানভাবে তিন বার এবং অবশিষ্ট পটাশ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর পানিসেচ দেয়া প্রয়োজন

খ. **রোপণের জন্য পেঁয়াজের আকার :** প্রতি কেজিতে ৭০-১০০টি পেঁয়াজ ধরে এরূপ পেঁয়াজ ধরে এরূপ রোপণ করতে হবে

গ. **রোপণ দূরত্ব :** সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার এবং পেঁয়াজের দূরত্ব ১৩-১৫ সেন্টিমিটার

ঘ. **রোগ দমন পদ্ধতি :** বীজ পেঁয়াজ ফসলে পার্পল পচন একটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক রোগ যার আক্রমণে বীজের মান কমে যায়। এরোগ অলটারনারিয়া পোরি এককভাবে অথবা অলটারনারিয়া পোরি এবং স্টেমফাইলিয়াম বট্রাইওসাম সম্মিলিতভাবে সৃষ্টি করে থাকে। নিচে বর্ণিত সমন্বিত দমন পদ্ধতি অবলম্বন করে।

১) গাছের বয়স ৪০-৪৫ দিন হলে রোভরাল প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম এবং রিডোমিল প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম একত্রে মিশিয়ে গাছ ভিজিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

২) এরপর ১৫ দিন অন্তর অন্তর বীজ দানা বাধা পর্যন্ত উক্ত ছত্রাক স্প্রে করতে হবে।

৩) স্টেমফাইলিয়াম ছত্রাকের আক্রমণ না থাকলে পরবর্তী স্প্রে শুধু রোভরাল দিলেই চলে।

৪) রোগ দমন করে প্রতি হেক্টরে ১২০০ কেজি পর্যন্ত বীজ উৎপাদন সম্ভব।

১৬. ৫. রসুন

রসুন দক্ষিণ ইউরোপ এবং এশিয়ার আদিম শস্য। উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Allium sativum* এবং *Liliaceae* গোত্রের অধীন। নানা প্রকারের ব্যঞ্জন, আচার চাটনি, প্রিকলস সুপ, এবং ওষুধ তৈরিতে রসুনের ব্যবহার হয়। রসুন হৃদরোগ ও বাতরোগে উপকারী।

রসুনের জাত : রসুনকে সাধারণভাবে দুই শ্রেণীর বলা চলে। যথা– দেশী ও পাশ্চাত্য

দেশী রসুন আকারে ছোট হয়। পাশচাত্য দেশীয় রসুন আকারে বেশ বড় হয়।

উৎপাদন পদ্ধতি : যদিও প্রায় সবরকম মাটিতেই রসুন জন্মাতে পারে। তবে হালকা বেলে দোআঁশ হতে দোঁআশ মাটি এর জন্য উত্তম।

১) জমি পানি নিকাশ সুবিধাযুক্ত এবং রোদযুক্ত হতে পারে।

২) রসুনের জন্য শল্ক কন্দের কোষ বা কোয়া রোপণ করা হয়

পরিচর্যা : আগাছা বাছাই এবং দরকার মতো পানি সেচ আবশ্যক। মার্চ-এপ্রিল মাসে গাছ সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে রসুন উত্তোলন করে ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে ঘরে সংরক্ষণ করা হয়।

পোকা দমন : রসুনের থ্রিপস পোকার আক্রমণ হয়। ডাইমেক্রন বা সেভিন ছিটিয়ে এ পোকা দমন করা যেতে পারে। বাংলাদেশে উন্নত হলুদের জাত।

১৬.৬. জিরা

১) জিরা বেলে দোআঁশ মাটির জিরা চাষের উপযোগী।
২) শীতের প্রাক্কালে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ঝুরঝুরে মাটিতে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হবে।
৩) হেক্টর প্রতি ১২-১৫ কেজি বীজের আবশ্যক হয়।
৪) ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ফসল সংগ্রহ করা হয়।
৫) হেক্টরপ্রতি ফলন ২০০-৪০০ কেজি।

১৬.৭. মৌরি

জিরার অনুরূপ। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে হেক্টর প্রতি ১২-১৫ কেজি হারে বীজ বুনে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ফসল সংগ্রহ করা হয়।

ফলন : ৪৫০-৫৫০ কেজি।

১৬.৮. ধনে

ধনের জন্য এঁটেল দোআঁশ হতে দোআঁশ মাটি খুবই উপযোগী। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে হেক্টর প্রতি ১২-১৫ কেজি বীজ ছিটিয়ে বপন করা হয়। ডিসেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত শস্য সংগ্রহ করা হয়। হেক্টর প্রতি ধনিয়া বীজের ফলন ৩৭৫-৪৫০ কেজি। ধনে কচি পাতা রূপেও তরকারি বা সালাদে ব্যবহৃত হয়।

ধনের জাত : বাংলাদেশের ধনিয়া জাতের মধ্যে রয়েছে- বারিধনিয়া ১। এ জাতটি বাছাইকরণের মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে অবমুক্ত করা হয়।

বারিধনে ১ : এ জাতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে –

১) এ জাতটি পাতাজাতীয় সবজি ও বীজ ফসল উভয়ভাবেই উৎপাদন করা যায়
২) পাতা বহু বিভক্ত।
৩) ফুল সাদা ও যৌগিক আম্বেল।
৪) গাছের উচ্চতা ৫০-৯০ সেন্টিমিটার।
৫) পাতার আকৃতি বড় ও উজ্জ্বল সবুজ।
৬) প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ১৬-১৮টি
৭) বীজ ডিম্বাকার বর্ণ হলদে।
৮) প্রতি গাছে ৪০০-৫০০টি বীজ হয়।
৯) পাতা ফসলের জন্য ৩০-৩৫ দিন।
১০) বীজ ফসলের জন্য ১১০-১২০ দিনে ফসল সংগ্রহ করা হয়
১১) হেক্টর প্রতি পাতার ফলন ৩.৫-৪.০ টন এবং বীজের ফলন ১.২-২.০ টন

১৬.৮.১. ধনে উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া: সব রকমের মাটিতেই ধনিয়ার চাষ করা যায়। তবে বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটি ধনিয়া চাষের জন্য উপযোগী। ধনে আবাদের জন্য পানি নিষ্কাশনের সুবিধা থাকতে হবে।

বপনের সময় : সেপ্টেম্বর মাস।

জমি তৈরি : মাটি ও জমির প্রকারভেদে ৪-৬টি চাষ ও মই দিতে হয়।

বীজ বপন : বীজ বুনার আগে পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। বীজ ছিটিয়ে বুনলে হেক্টর প্রতি দ্বিগুণ বীজ ব্যবহার করতে হবে। ধনে অন্য কোনো ফসলের সাথে মিশ্র ফসল হিসেবে সারি পদ্ধতিতে বপনের জন্য ৪-৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি : ধনে চাষের জন্য মাঝারি উর্বর মাটিতে হেক্টর প্রতি ১৫০-৩০০ কেজি ইউরিয়া, ১০০-২০০ কেজি টিএসপি, ৮০-১০০ কেজি এমপি এবং ৭-১০ টন গোবর সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর, সমুদয় টিএসপি ও অর্ধেক এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর চারা রোপণের এক সপ্তাহ পূর্বে মাদায় দিয়ে মিশিয়ে রাখতে হবে। এরপর চারা রোপণ করে সেচ দিতে হয়। ইউরিয়া এবং বাকি অর্ধেক এমপি সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা লাগানোর ৮-১০ দিন পর প্রথম কিস্তিতে এবং চারা লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর বাকি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা : পাতা ফসলের ক্ষেত্রে চারা গজানোর ১০-১৫ দিন পর প্রতি সারিতে ৫ সেন্টিমিটার পর পর একটি চারা রেখে অন্যগুলো তুলতে হবে। বীজ ফসলের ক্ষেত্রে প্রতি ১০ সেন্টিমিটার পর পর একটি চারা রাখতে হবে। নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার এবং মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে। প্রতিবার সেচের পর পর জমির 'জো' আসা মাত্র মাটির চটা ভেঙে দিলে গাছের শিকড় প্রচুর পরিমাণে আলো বাতাস পাবে, ফলে গাছের বৃদ্ধি সহজ ত্বরান্বিত হবে। ধনে গাছ জমির পানি জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই জমাকৃত অতিরিক্ত সেচের পানি বা বৃষ্টির পানি ২-১ ঘণ্টা মধ্যেই নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬.৯. কালোজিরা

বীজতলায় অক্টোবর মাসে বীজ বপন করতে হয়। চারাগুলো ৫ সেন্টিমিটার পরিমাণ দৈর্ঘ্য হলে ৪৫ সেন্টিমিটার অন্তর ৩০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে চারা রোপণ করা যায়।

১৬.১০. মেথি

১) সাধারণভাবে দোআঁশ মাটিতে মেথি ভালো জন্মে।

২) অক্টোবর-নভেম্বর মাসে হেক্টর প্রতি ১১-১২ কেজি হারে ছিটিয়ে বীজ বপন করে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ফলন সংগ্রহ করা হয়।

৩) হেক্টর প্রতি ফলন ৪৬০-৫৫০ কেজি হয়।
৪) বীজ ছাড়াও ডগা এবং কচি পাতা তরকারিতে ব্যবহৃত হয়।
৫) ডগাকাটা গাছে বীজ জন্মে না।

১৬.১১. শুলফি

এর শাক বিবিধ তরকারি সুগন্ধযুক্ত করার কাজে শুলফি (dill) ব্যবহৃত হয়। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বীজতলায় চারা উৎপাদন করে ৪৫×৩০ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করতে হয়। এর শাখা ব্যতীত বীজও তরকারিতে ব্যবহৃত হয়

ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে বীজ পরিপক্ব হয়। তখন গাছের ডগা মাড়িয়ে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

১৬.১২. পুদিনা

১) এ গাছের সুগন্ধি পাতা সংযোগে মুখরোচক চাটনি প্রস্তুত করা যায়।
২) এঁটেল দোআঁশ মাটি এর জন্য বিশেষ উপযোগী
৩) কিছু ছায়াযুক্ত স্থানেও পুদিনা জন্মে।
৪) জুন-জুলাই মাসে পুদিনা গাছের ডগা, সাকার বা কাণ্ড সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করা যেতে পারে।
৫) এর বীজও বপন করা যায়।
৬) অক্টোবর-নভেম্বর মাস বীজ বপনের জন্য ভালো।

১৬.১৩. গোল মরিচ

১) এ লতানোজাতীয় বহুবর্ষজীবী গাছটির জন্য বাংলাদেশের অর্দ্র জলবায়ু উপযোগী
২) ১ মিটার পর পর জীবন্ত অবলম্বনে এর নিকট দুটি করে শাখাকলম রোপণ করা যেতে পারে।
৩) অবলম্বন রূপে মাদায় আম, কাঁঠাল, সুপারি ইত্যাদি গাছ ব্যবহৃত হয়।
৪) এপ্রিল হতে মে মাস শাখাকলম করার উপযুক্ত সময়।
৫) সেন্টিমিটার দীর্ঘ শাখাকলম উত্তম।
৬) রোপণের ৩-৪ বছরের মধ্যেই ফল আহরণ করা যেতে পারে।
৭) হেক্টর প্রতি ফলন ১-২ টন।

গোল মরিচের জাত : বাংলাদেশে গোলমরিচের জাত : জৈন্তা জাত

১) কাটিং লতা লাগানোর ৩-৪ মাসের মধ্যে ফল ধরা শুরু হয়
২) বছরে গাছ পূর্ণ উৎপাদনের অবস্থায় আসে এবং ২০-৩০ বছর পর্যন্ত ফলন দেয়
৩) পূর্ণবয়স্ক প্রতি গাছের কাঁচা গোলমরিচের ফলন ৪-৫ কেজি।
৪) প্রতি গাছ থেকে প্রায় ১.৫ কেজি শুকনা গোলমরিচ পাওয়া যায়
৫) হেক্টর প্রতি ফলন ২.০-২.৫ টন।
৬) এ জাত পোকামাকড় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন

১৬. ১৪. তেজপাতা

১) এ দেশে তেজপাতা ডাল ও ব্যঞ্জনাদিতে সুগন্ধিকারকরূপে ব্যবহৃত হয়।
২) তেজপাতা দোআঁশ মাটির উপযোগী।
৩) জন্মাতে আর্দ্র জলবায়ুর ও ছায়াময় পরিবেশ দরকার।
৪) গ্রীষ্মকালে ৬ মিটার দূরত্বে চারা রোপণ করা হয়।
৫) এক বছর পর হতে পাতা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

১৬. ১৫. কর্পূর

১) কয়েক মিটার উচ্চ বহু শাখাযুক্ত ঝোপালো বৃক্ষ।
২) সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে বীজ সংগ্রহ করে বীজ হতে চারা জন্মানো হয়। কেজি প্রতি প্রায় ৩২০০ বীজ হয়।
৩) সচরাচর ৩-৪ মাসে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়।
৪) গাছ ছাঁটাই করে ১.৫-১.৮ মিটার উঁচু রাখা হয়।
৫) এজন্য ১.৮ মিটার দূরত্বে চারা রোপণ করতে হয়।
৬) তৃতীয় থেকে চতুর্থ বছরে গাছ ছাঁটাই করা হয়।
৭) মিটার দীর্ঘ হলে শাখা ছাঁটাই করা হয়।
৮) পাতাসহ সব শাখা ১.৫-২% থেকে কর্পূর এবং প্রায় ৩০% কর্পূর তেল পাওয়া যায়।
৯) বছরে ৩-৪ বার গাছ ছাটাই করা যায়।
১০) হেক্টর প্রতি প্রায় ১১২-১৬৮ কেজি পরিষ্কার কর্পূর পাওয়া যায়।
১১) পাতা, শাখা ইত্যাদি পানিতে জ্বাল দিয়ে পরিশ্রুত করা হয়।

১৬. ১৬. এলাচি

১। ২.৪-৩.০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট।
২। আর্দ্র ও জৈব মাটিতে ছায়াময় পরিবেশে জন্মে।
৩) সাকার ও বীজ হতে চারা জন্মে
৪) বীজের অঙ্কুরোদ্গমে ২-৩ মাস লাগে।
৫) ১ মিটার দূরে দূরে প্রতি গর্তে ৩-৪টি করে চারা রোপণ করা হয়
৬) তৃতীয় বছর হতে ফলন শুরু হয়।
৭। হেক্টর প্রতি ১১২-২২৪ কেজি এলাচি পাওয়া যায়।
৮। সাধারণত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ফল পাকে।
৯। তিন-চতুর্থাংশ হলে ফল সংগ্রহ করা হয়।

১৬.১৭. লবঙ্গ

১) এ গাছ কৌণিক বা মোচাকৃতি।

২) গাছের উচ্চতা ৭.৫-৯.০ মিটার।

৩) মালাক্কা দ্বীপ হতে বিভিন্ন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে বিস্তৃত হয়েছে।

৪) পাহাড়ি এলাকায় ঢালু পার্শ্বদেশে উর্বর দোআঁশ মাটিতে ভালো জন্মে।

৫) ৬×৬ মিটার দূরত্বে চারা রোপণ করা হয়।

৬) এক বছর বয়সে প্রথম ফুল আসে।

৭) তিন বছর বয়স পর্যন্ত ফুলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৮) লবঙ্গ ফুলের কুঁড়ি ফোটার আগে সবুজ অবস্থায় সংগৃহীত হয়।

৯) জানুয়ারি মাস লবঙ্গ সংগ্রহের সময়।

১০) কয়েক দিন রোদে শুকালে লবঙ্গ বাদামি বর্ণপ্রাপ্ত হয়।

১১) একটি বয়স্ক গাছে ৪-৫ কেজি লবঙ্গ হতে পারে।

১২) পাতা ও কাঁচা ফল হতে পরিশ্রবণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে দ্বারা লবঙ্গ তেল উৎপন্ন করা হয়।

১৬.১৮. দারুচিনি

এ গাছ ৯-১৫ মিটার উচুঁ, মাঝারি আকারের বৃক্ষ।

১) জুন-জুলাই মাসে বীজ বোনা হয়।

২) প্রায় ৩ সপ্তাহে বীজ অঙ্কুরিত হয়।

৩) বীজ বপনের প্রায় ২ বছর পরে কাণ্ড ২.১-২.৪ মিটার উঁচু হয়

৪) মে-আগস্ট মাসে ডালে সংগ্রহ করা হয়।

৫) তারপরে বাকল কাঠ হতে আলগা করে আনা হয়।

৬) বাকলগুলো স্তূপীকৃত করে মোটা কাপড় বা বস্তা দিয়ে ঢেকে পচানো হয়।

৭) ৩-৪ দিন ছায়াতে শুকানোর পর বাকল চোঙ্গাকৃতি হয়।

৮) তারপর রোদে শুকিয়ে নেয়া হয়

৯) প্রথমবার হেক্টর প্রতি ৫৬-৬৭ কেজি এবং পরে উৎপাদন বাড়তে বাড়তে দশম বছরে ২২০ কেজি পর্যন্ত দারুচিনি উৎপন্ন হতে পারে।

পরিশিষ্ট

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
১. শাক-সবজি			
Brassica oleracea capitata	Cruciferae	Cabbage	বাঁধাকপি
Brassica oleracaea Var. *alephala*	Cruciferae	Cauliflower	ফুলকপি
Brassica campestris Var. *pekinensis*	Cruciferae	Chinese cabbage	চীনাকপি
Brassica campestris Var. *chinensis*	Cruciferae	pe-tsai	পেচাই বাটি শাক
Raphanus sativus	Cruciferae	Radish	মূলা
Chorchorus capsularis	Tilhaece	Jute	পাটশাক
Ipomea aquatica	Convolvulaece	Water spinach	কলমি
Allium cepa	Liliaeeae	onion	পেঁয়াজ
Colocasia esculenta	Araceae	Aroid	কচু
Xanthosoma vislaceum	Araceae	Aroid	মৌলভী কচু
Bela vulgaris	Chenopodiaceae	Spinach	বিট সুইচ চার্ড, টক পালং
Rumexa vesicarius	Chenopodiaceae	Spinach	পালংশাক
Basella rubra	Basekacae	Indian Spinach	পুঁইশাক
Amaranthus tricolorlividus	Amaranthaeeae	Amaranth	লাল শাক
Amaranthus atrovirens	Amaranthaeeae	Amaranth	ডাটা শাক
Amaranthus spiosus	Amaranthaeeae	Amaranth	কাঁটা নটে
Amaranthus panicalatus	Amaranthaeeae	Amaranth	নটে শাক
Lacnica sativa	Compositae	Lettuce	লেটুস
Helianthus tuberosa	Compositae	Artichoke	আর্টিচোক
Chenopodium album	Chenopodiaceae	Bathua	বথুয়া

২. কাণ্ড সবজি

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Bassica loeracea gongylodes	Crucis ferae	Kholrabi	ওলকপি
Brassica Campestris rapifera		Turnip	শালগম
Brassia napus napobrassica		Rutabaga	রুটাবগা
Disocorea alata	Discoreaceae	yam	গাছ আলু
Disocorea esculentus	Discoreaceae	yam	
Disocorea rotundota	Discoreaceae	yam	
Disocorea dumetorum	Discoreaceae	yam	
Amaranthus tricolor	Amaranthaceae	Amaranth	ডাঁটা লাল শাক
Colocasia esculenta	Araceae	Aroid	কচু
Xanthosoma vioaceum	Araceae	Aroid	দুধ কচু
Xanthosoma atrovirens	Araceae	Aroid	মৌলভী কচু
Solanum tuberosum	Solanaceae	Potato	আলু
Allium cepa	Liliauae	Onion	পেঁয়াজ

৩. ফুল সবজি

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Brassica oleracea botrytis	Cruciferae	Cauli flower	ফুলকপি
Brassica oleracea italia		Broccioli	ব্রোকলি
Cucurbita pepo moschata	Cucurbitaveae	Sweet gourd	মিষ্টি কুমড়া
Sesbenia grandis	Leguminosae	Bakful	বকফুল
Musa grandis	Musaceae	Banana	কলা (থোড়)
Allium cepa	Liliaceae	Onion	পেঁয়াজ

৪. ফল সবজি

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Solanum melongena	Solanaceae	Brinjal	বেগুন

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Dolicos lablab	Legminosae	Country bean	শিম
Lablab niger, Lablab purpurueus	leguminosae	Hyacingh bean	উরশিম
Lycopersicum esculentum	Solanaceae	Tomato	টমেটো
Benincasa hispida	Cucurbitaceae	Ash gourd	চালকুমড়া
Benincasa cerifera	Cucurbitaceae	White gourd	চালকুমড়া
Lagenaria siceraria	Cucurbitaceae	Bottle gourd/ pumkin	লাউ
Cucurbita moschata	Cucurbitaceae	Sweet gourd	মিষ্টিকুমড়া
Cucurbita mazima	Cucurbitaceae	Squash	স্কোয়াশ
Cucurbita pepo	Cucurbitaceae	Sweet gourd	মিষ্টিকুমড়া
Cucurbita ficifolia	Cucurbitaceae		মিষ্টিকুমড়া
Cucurbita mixata	Cucurbitaceae		মিষ্টিকুমড়া
Cucumis sativus	Cucurbitaceae	Cucumber/ Muskelon	শসা
Cucumis melo	Cucurbitaceae	Waten melon	তরমুজ
Citrullus lunatus	Cucurbitaceae	Ribbed gourd	ঝিঙ্গা
Luffa acutangula/ cylindrica	Cucurbitaceae	Sponge gourd	ধুন্দুল
Momordica charantia	Cucurbitaceae	Bitter gourd	করলা
Momordica cochinchinensis	Cucurbitaceae	Teasle gourd	কাকরোল
Momordica diocia	Cucurbitaceae	Teasle gourd	কাকরোল
Trichosanthes anguina	Cucurbitaceae	Snake gourd	চিচিঙ্গা
Trichosanthes dioica	Cucurbitaceae	Pointed gourd	পটল
Pisum sativum	Cucurbitaceae	Pea	মটর
Cucumis melo	Leguminosae	kakur	কাঁকুড়
Vigna unguiculata	Cucurbitaceae	Cowpea	গোমটর
Vigna sesquipedalis	Leguminosae	Yardlong bean	বরবটি
Psophocerpus tetragonolobus	Leguminosae	Four angled bean	কামরাঙ্গা শিম

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Phaseolus vulgaris	Leguminosae	Bushbean french bean	ঝুপরি শিম ফরাসি শিম
Conavalia gladita	Leguminosae	Sword bean	তলোয়ার শিম
Abelmoschus esculentus	Malvaceae	Lady's finger	ঢেঁড়স
Hibiscus esclentus	Malvaceae	okra	ঢেঁড়স
Hibiscus sabarifa	Malvaceae	Sorrel	চুকাই
Moringa oleifera	Moringace	House raddish Dram stick	সাজিনা

৫. মূলা সবজি

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Ipomea batata	Convulvulaceae	Sweet potato	মিষ্টি আলু
Raphanus sativus	Cruciferae	Radish	আলু
Dauvus carota	Umbiliferae	Carrot	গাজর

৬. মসলা

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Capsicum annum	Solanaceae	Chilli	মরিচ
Capsicum pubesns	Solanaceae	Chilli	মরিচ
Capsicum frutesens	Solanaceae	Chilli	মরিচ
Capsicum pendulum	Solanaceae	Chilli	মরিচ
Capsicum minimum	Solanaceae	Chilli	মরিচ
Capsicum grossum	Solanaceae	Chilli	মরিচ
Zingiber officinale	Scitaminaee	Zinger	আদা
Curcuma longa	Curcuminaceae	Turmeric	হলুদ
Nigella sativa	Ranunculaceae	Black cumin	কালিজিরা
Allium cepa	Liliaceae	Onion	পেঁয়াজ
Allium sativum	Liliaceae	Garlic	রসুন
Mentha viridis	Labiatae	Mint	পুদিনা
Piper nigrum	Piperaceae	Black peper	গোল মরিচ

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Cinnamon zeylanicum	Lauraceae	Cinnamon	দারুচিনি
Pimenta acris	Myrtaceae	Bay leaf	তেজপাতা
Cinnamomum camphora	Lauracceae	Comphor	কর্পূর
Elettaria cardamomum	Scitaminae	Cardamon	এলাচি
Eugenia caryophyllata	Myrtaceae	Clove	লবঙ্গ
Pimpinella anisum	Umbillifereae	Aniseed	মৌরী
Coriandrum sativum	Umbillifereae	Coriander	ধনিয়া
Trigonella foenum graeclum	Umbillifereae	Fenugreek	মেথি
Peucedanum graveolens	Umbillifereae	Dill	শুলফী

৭. সুদৃশ্য জলজ গাছ

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Nelumbium speciosum	Nympaceae	Lotus	পদ্ম
Nymphaea stellata	Nympaceae	Water lily	শাপলা শালুক
Nymphaea rubra	Nympaceae	Water lily	লাল শাপলা
Nymphaea pubesens	Nympaceae	Water lily	সাদা শাপলা
Nymphaea caerulea	Nympaceae	Water lily	শালুক
Nipa spp	Nympaceae	Palm	গোলপাতা
Eichhornia crassipes	Nympaceae	Water hyaicinth	কচুরী পানা

৮. শীতকালীন ফুল

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Alyssum maritimum	Crucifereae	Alyssum	এলিসাম
Antirrhimum majus	Scorplarineae	Antrihinum	এন্টির হিনাম
callistephus hortensis	Compositae	Chinese aster	এস্টার
Calendula officinalis	Compositae	Calendula	কেলেন্ডুলা
Condytuft iberis	Cruciferae	Candytuft	কেন্ডিটাফ্ট
Dianthus caryophyllus	Caryophyllacae	Carnation	কার্নেশান
Bianthus buratus	Compositae	Sweet william	সুইট উইলিয়াম
Chrysanthemum sp.	Compositae	Chrysanthemum	চন্দ্র মল্লিকা

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Cosmos bipinatas	Compositae	Cosmos	কসমস
Centaurea cyanus	Compositae	Cornflower	কর্নফ্লাওয়ার
Centaurea moschata	Compositae	Sweet sultan	সুইট সুলতান
Dahlia imperialis	Compositae	Dahlia	ডালিয়া
Gaillardia peta	Compositae	Caillardia	গেলার্ডিয়া
Lupinus hirsutus	Leguminosae	Lupin	লুপিন
Tagetus erecta	Compositae	Marigold	গাদা
Tropeolium majus	Geraniaceae	Nasturtium	নেস্টারসিয়াম
Myosotis palustris	Boraginaceae	Forset-me-not	ভুলনা আমায়
Phlox drummondi	Polemoniacea	Phlox	ফ্লক্স

৯. গ্রীষ্মকালীন ফুল

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Celosia eristata	Amaranthaceae	Cock's comb	মোরগ ফুল
Gomphrena	Amaranthaceae	Glove amaranth	বোতাম ফুল
Clitoria ternatia	Legumimosae	Clitoria	অপরাজিতা
Impatiens balsamisa	Geraniaceae	Balsam	বালসাম
Mirabilın jalapa	Nyctagineae	4'Oclock	কৃষ্ণকলি
Pentapetes phoenicea	Nyctagineae	Dyphoria	সন্ধ্যামণি

১০. লিলি ফুল

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Polyanthus tuberosa	Amargllidacecael	Tuberose	রজনীগন্ধা
Narissus spp	Amargllidacecael	Daffodil	নার্গিস
Agave americana	Amargllidacecael	Agauve	এগেভ
Hedychium coronarium	Scitaminae	Hedychium	দোলনচাঁপা
Canna indica	Scitaminae	Indian shot	সর্বজয়া
Gloriosa superba	Scitaminae	Glory lily	উলট চন্ডাল
Hemerocallis fulva	Liliaceae	Day Lily	ডেলিলি

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Funkia subcardia	Liliaceae	Plaintain lily	ফাঙ্কিয়া
Crocus sativus	Ridanae	Saffroce	জাফরান
Gladiolus sp.	Iridaceae	Gladiolus	গ্লাডিওলাস

১১. ঝোপ গাছ বা ফুল

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Rosa rubiginosa	Rosaceae	Rose	গোলাপ
Rosa giganiea	Rosaceae	Rose	লতানো
Rosa chinensis	Rosaceae	Rose	চীন গোলাপ
Jasminum duplex	Oleaceae	Jasmine	বেলী
Jasminum auriculatum	Oleaceae	Jasmine	জুই
Jasminum grandiflorum	Oleaceae	Jasmine	চামেলী
Jasminum sambac	Oleaceae	Jasmine	মল্লিকা
Jasminum chrysanthemum	Oleaceae	Yellow Jasmine	স্বর্ণজুই
Garhnia orida	Rubiaceae	Cope Jasmine	গন্ধরাজ
Nyctanthes arbortritis	Rubiaceae	Night Jasmine	শেফালী
Nerium indicum	Rubiaceae	Oleander	করবী
Tabernaemontana coronaria	Rubiaceae	Wax flower	টগর
Vinca alba	Rubiaceae	Per wrinkle	নয়নতারা
Vinca rosea	Rubiaceae	per wrinkle	নয়নতারা
Cestrum nocturnum	Solanaceae	Glory of japan	হাসনা হেনা
Murraya exotica	Rutaceae	Chinabox	কামিনী
Hibiscus roseasinensis	Malvaceae	China rose	জবা
Lxora spp	Rubiaceae	Ixora	রঙ্গন

১২. সুদৃশ্য ঝোপ

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Codiaeum spp		Croton	পাতাবাহার
Poinsettia pulcherrima		Poinsttia	পয়েনসেটিয়া

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Acalypha spp		Acalypha	মুক্তাঝুরি
Mussaenda spp	Rubiaceae	Mussaenda	মুসান্ডা
Justicia spp	Acanthceae	Justicia	জাস্টিসিয়া

১৩. লিগিউম বৃক্ষ

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Poinciana pulcherrima	Leguminosae	Peacock	রাধাচূড়া
Poinciana resia	Leguminosae	Gold mohor	মোহনচূড়া
Pltophorum inerme	Leguminosae	Bakful	কনকচূড়া
Sesbania grandiflora	Leguminosae	Erythrine	বকফুল
Bauhinia acuaminata	Leguminosae	Camels foot	সোনাইল
Casia fistula	Legumi / nosae	Indian taburnum	কাঞ্চন
Erythrina indica	Leguminosae	Erythrium	পালিতা মান্দার

১৪. অন্যান্য সুদৃশ্য বৃক্ষ ও পাম

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Pinus deodora	Conifeare	Debdaru	দেবদারু
Livistona rotunda	Palmae	Livistona	লিভি স্টোনা
Anthocephalus cadamba	Rubiacea	Kadam	কদম
Alstonia scholaris	Apocynaceae	Devil'strele	ছাতিম
Lagerstriemia indica	Lythraeae	Jarul	কুরুশ
Calamas roxburghil	Palmae	Ratta	বেত/কলামাস
Oredoxa regia	Palmae	Royal palm	বোতল পাম
Areca lutesens	Palmae	Areca palm	এরেকা
Areca olereacea	Palmae	Cabbage palm	ক্যাবেজ পাম
Corypha umbreculifera	Palmae	Talipot palm	টালিপিট পাম
Licuala grandis	Palmae	Fan-leave palm	ফ্যান পাম
Ptychosperma machathuri	Palmae	Ptychosperma	টাইকোস্পারাল

১৫. লতা ফুল

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Bougainvllea glabra	Nyctagineae	Bougainvllea	বাগান বিলাস
Echites caryophyllata	Apocynaceae	Maloti	মালতি
Passiflora spp.	Passiflora	Passion flower	
Hiptage madablata	Malphighiaceae	Kuch	কুচ
Ipomea spp.	Convalvulauae	Ipomea	আইপোমিয়া
Quisqualis indica	Convalvulauae	Rangoon Creeuper	ব্রহ্মলতা
Pergularia odoratissima	Ascepiadaceae	Primerose	প্রিমরোজ
Hoya carosa	Ascepiadaceae	Wax plant	হয়া

১৬. থুজা

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Thuja orientalis	Coniferae	Thuja	থুজা/পাটি ঝাউ
Thuja aurea	Coniferae	Thuja	সোনালী ঝাউ
Cupressus sempervirens	Coniferae	cypres	সাইপ্রেস
Juniperus communis	Coniferae	Juniper	জুনিপার
Aurocaria excelsa	Coniferae	Aurocaria	আরোকেরিয়া
Pinus longifolia	Coniferae	Pine	পাইন
Tamarix dioica	Ramarisinea	Tamarix	ঝাউ
Causarina equisetfolia	Tamarisinea	Cansarina	বিলাতী ঝাউ

১৭. ক্যাকটাস

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Opuntia spp.	Cactaceae	Prickly	ফনিমনসা
Mammcellari spp.	Cactaceae	Nipple cactus	নিপল ক্যাকটাস
Melocactus spp.	Cactaceae	Turk's cap	মেলোক্যাকটাস
Cereus spp	Cactaceae	Torch thistle	সেরিয়াস
Echinocactus spp.	Cactaceae	Echinocactus	হেজহগ

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Pereskia spp.	Cactaceae	Pereskia	পেরেসকিয়া
Epiphyllus spp.	Cactaceae	Epiphyllus	এপিফাইলাম
Rhipsalis spp.	Cactaceae	Rhipsalis	রিপসেলিস

১৮. অর্কিড

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Dendrobium spp.	Orchidaceae	Dendrobium	ডেন্ড্রোবিয়াম
Vanda teres	Orchidaceae	Vanda	ভেন্ডা
Arundina spp.	Orchidaceae	Arundina	এরান্ডিনা
Vanilla spp.	Orchidaceae	Vanilla	ভ্যানিলা
Coelopera spp.	Orchidaceae	Coelopera	সিলোগাইন
Cyrtopera spp.	Orchidaceae	Cyrtopera	সার্টোপেরা
Renanthera spp.	Orchidaceae	Chartopera	রেনানথেরা
Saccolabium spp.	Orchidaceae	Saccolabium	স্যাকোল্যাবিয়াম
Aerides spp.	Orchidaceae	Aerides	এরিডিস

১৯. ফার্ন

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Adiantum spp.	Filieeacs	Maidem hair ferm	এডিয়েন্টাম
Platycerium spp.	Filieeacs	Stags hour	প্লাটিসিরিয়াম
Asplenium spp.	Filieeacs	Asplenium	এসপ্লেনিয়াম
Hemionitio spp	Filieeacs	Hemionitio	হেমিওনিটিস
Polypodium spp.	Filieeacs	Polypodium	পলিপোডিয়াম
Pavallia spp.	Filieeacs	Pavallia	পেভেলিয়া
Trichonomanes spp.	Filieeacs	Trichonoma	ট্রাইকোমেনিস
Lygodium spp.	Filieeacs	Lygodium	লাইগোডিয়াম

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
১. খাদ্য শস্য ফসল			
Oryza sativa L.	Gramineae	Rice	ধান
Triticum aestivum L.	Gramineae	Wheat	গম
Zea mays L. var. rugosa	Gramineae	Maize/Sweet Corn	ভুট্টা
Hordeum vulgare L.	Gramineae	Barley	যব
Avena sativa L.	Gramineae	Oats/zai	জই/ওট
Secale cereale L.	Gramineae	Rye	রাই
Sorghum vulgare Pears.	Gramineae	Sorghum	জোয়ার
Pennisetum typhoideum (Burm) Stapf.	Gramineae	Bajra	বাজরা
Setaria italica (L.) Beauv.	Gramineae	Foxtail Millet/Italian Millet	কাউন
Panicum miliaceum L.	Gramineae	Hog Millet	চীনা
২. ডালজাতীয় ফসল			
Vigna radiata (L.) Willezek. (phaseolus aureus L.	Leguminosae	Mugh bean	মুগ কলাই
Lens culinaris Medik	Leguminosae	Lentil	মশুর কলাই
Phaseolus mungo L.	Leguminosae	Urd bean	মাশকলাই
Pisum sativum subsp. hortense L.	Leguminosae	Garden pea/Field pea	মটর কলাই
Cicer arietinum L.	Leguminosae	Gram/Egyptian pea	ছোলা
Lathyrus sativus L.	Leguminosae	Grass pea/Chick ling pea	খেশারিকলাই
Cajanus cajan (L.) Huth.	Leguminosae	Redgram/Argola pea/Conobean	অড়হর
Arachis hypogaea L.	Leguminosae	Pea nut	চীনাবাদাম
Dolichos lablab L.	Leguminosae	Country bean	শিম
Phaseolus vulgaris L.	Leguminosae	Field bean	বিলাতী শিম/ফরাসী শিম

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Caravalia insiformis	Leguminosae	Sword bean	মাখন শিম
Psophocarpus tetragonolobus D.C	Leguminosae	Winged bean	চারকোণা শিম/কামরাঙ্গা শিম
Glycine max (L.) Merr	Leguminosae	Soybean	সয়াবিন
Vigna sinensis Endl. ex. Hassk.	Leguminosae	Yaed long been/Cowpea	বরবটি
৩. তেল উৎপাদী ফসল			
Brassica campestris L. var. sarsoon Prain	Cruciferae	Mustard	সরিষা
Sesamum indicum L.	Pedaliaceae	Til	তিল
Linum usitatissimum L.	Linaceae	Flax	তিসি
Helianthus annus L.	Compositae	Sunflower	সূর্যমুখী
Carthamus tinctorus L.	Compositae	Safflower	কুসুম
Guizotia abyssinica Cass.	Compositae	Black til	কালো তিল
Cannabis sativa L.	Cannabinaceae	Hemp	গাঁজা, ভাং
Papaver communis L.	Papaveraceae	Afing/Afim	আফিম, পপি
Ricinus communis L.	Euphorbiaceae	Castor bean	রেড়ি
Elaeis guineensis Jacq.	Palmae	Oil palm	পাম
৪. তন্তু উৎপাদী ফসল			
Corchorus olitorus L.	Tiliaceae	Jute (Tosha)	পাট (তোষা)
Corchorus capsularis L.	Tiliaceae	Jute (Local)	পাট (দেশী)
Gossypium herbaceum L.	Malvaceae	Cotton	তুলা (কার্পাস)
Hibiscus cannabinus L	Malveceae	Mesta	মেস্তা পাট
Crotolaria juncea L.	Leguminosea	Sun hemp	শন পাট

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Sesbania cannabina Pers.	Leguminosea	Dhanchi	ধৈঞ্চে
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. (Bombax ceiba L.)	Bombacaceae	Silk cotton tree	শিমুল
Clinogyne dichotoma Salisb.	Marantaceae	Sital pati/ Muktapati/ Madur	শীতল পাটি
Calamus viminalis Wild	Palmae	Bet	বেত
Typha elephantia Roxb.	Typhaceae	Elephant grass	হোগলা
৫. উদ্দীপক পানীয় উৎপাদী ফসল			
Camellia sinensis (Syn: Thea sinensis)	Theaceae	Tea	চা
Coffee arabica L.	Rubiaceae	Kafi	কফি
৬. চিনি ও গুড় উৎপাদী ফসল			
Saccharum officinarum L.	Gramineae	Sugarcane	আখ
Beet vulgaris L.	Chenopodiaceae	Sugarbeet	বিট
Borassus flabellifer L.	Palmae	Palmyra palm	তাল
Phoenix sylvestris (L.) Roxb.	Palmae	Date plant	খেজুর
৭. নাটজাতীয় ফসল			
Cocos nucifera L.	Palmae	Coconut	নারকেল
Anacardium occidentale L.	Anacardiaceae	Cashew nut	কাজুবাদাম
Areca catechu L.	Palmae	Betalnut	সুপারি
Juglans nigra	Juglanodaceae	Walnut	আখরোট
৮. কাগজ উৎপাদী			
Bambusa arundinacea	Gramineae	Bamboo	বাঁশ
Excoecaria agallocha (L.) Muller	Euphorbiaceae	Bind your eyes Tree	গেওয়া

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Phragmites karka (Retz.) Trin	Gramineae	Reed	নলখাগড়া
৯. ফল উৎপাদী ফসল কাঁঠাল			
Artocarpus heterophyllus Lamk	Moraceae	Jackfruit	কাঁঠাল
Mangifera indica L.	Anacardiaceae	Mango	আম
Musa Paradisiace L.	Musaceae	Green Banana	কাঁচা কলা
Musa sapientum L.	Musaceae	Banana	সাগর কলা
Musa ensete L.	Musaceae	Seeded Banana	বীচি কলা
Musa cavendisini L.	Musaceae	Dwarf Banana	জাহাজী কলা
Carica papaya L	Carieaceae	Papaya	পেঁপে
Ananas sativus Schult L.	Bromiliaceae	Pineapple	আনারস
Syzygium cuminii (L.) skeel	Myrtaceae	Blackberry	কালোজাম
Litchi chinensis sonn	Sapindaceal	Litchi	লিচু
Psidium guajava (L.) Bat	Myrtaceae	Guava	পেয়ারা
Annona reticulate L.	Annonaceae	Bullock's heart	আতা
Achras sapota L.	Sepotaceae	Sapota	সফেদা
Annona squamosa L.	Annonaceae	Custard apple	শরীফা
Aegle marmelos (L.) correa	Rutaceae	Wood apple	বেল
Feronia elephantum coff	Rutaceae	Elephant apple	কদবেল
Syzygium jambos (L.) Alston.	Myrtaceae	Rose apple	গোলাপজাম
Vitis vinifera L.	Vitaceae	Grape	আঙ্গুর
Spondias mangifere Willd.	Anacardiaceae	Hogplum	আমড়া
Emblica officinalis Gaertn.	Euphorbiaceae	Amla	আমলকি
Averrhoa carambola L.	Apocynaceae	Carmbola	কামরাঙা

বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ইংরেজি নাম	বাংলা নাম
Olea europaea L.	Oleaceae	Olive	জলপাই
Tamarindus indica L.	Leguminosae	Tamarind	তেঁতুল
Zizyphus mauritiana Lamk	Rhamnaceae	Chinese Jujube	কুল/বরই
Dillenia indica L.	Dilleniaceae	Chalta	চালতা
Carissa carandas L.	Apocynaceae	Karanda	করমচা
Punica granatum L.	Punicaceae	Pomegranate	ডালিম
Pyrus communis L.	Rosaceae	Pear	নাশপাতি
Pyrus malus L.	Rosaceae	Apple	আপেল
Citrus aurantium	Rutaceae	Sour Orange	টক কমলা
Citrus sinensis L. Osbeck	Rutaceae	Malta	মিঠা কমলা
Citrus reticulata Blanco	Rutaceae	Mandarin	ম্যান্ডারিন
Citrus aurantifolia [illegible] st & panz). S[illegible]	Rutaceae	Lime	কাগজী লেবু
Citrus sinensis [illegible] Burm. f.	Rutaceae	Lemon	এলাচি লেবু
Citrus jambhiri	Rutaceae	Roughlemon	জামির
Citrus grandis [illegible] Osbeck	Rutaceae	Pummelo	বাতাবী লেবু
Citrullus vulgaris Schrad.	Cucurbitaceae	Water melon	তরমুজ
Cucumis melo L.	Cucurbitaceae	Melon/ Musk melon/Sweet melon	বাঙ্গী/ফুটি
Diospyros [illegible]*erina* Gueke	Ebenaceae	River ebony	গাব

১০. তরুক্ষীর উৎপাদী ফসল

Hevea brasiliensis Muell. Arg.	Euporbiaceae	Rubber tree	রাবার

১১ ট্যানিন ও রঞ্জক উৎপাদী ফসল

[illegible] *[illegible]ita* Bl.	Rhizophoraceae	Bhura tree	ভুরা গাছ
Quercus velutina L.	Fagaceae	Oak tree	ওক গাছ

তথ্যপঞ্জি

Anon. 1986. Ann. Rept. for 1983 84. CVSRC, BARI.

Banga, O. 1976. *In Evolution of Crop Plants by Simmonds, N.W.* ed. Long-man, London.

Bannert, H., L. Loulidard, Y, Cauderon and T. Tempe. 1974. Cytoplasmic male sterility transfer from *Raphanus* to *Brassica*. In Eucarpia Cruciferae .

Bhuya, M.A.J. and A.R. Choudhury. 1984. Effect of plant population and stage of harvest on the growth and yeeld of knolkhol. *Bangladesh H* 12(1): 77-30.

Chatterjee, S.S. and V. Swarup. 1983. *Seeds & Farms* 9: 15-16.

Choudhury, B. and P.S. Sirohi. 1972. *Indian Hort.* 16: 17-18.

De Candole, A. 1886. *Origin of Cultivated plants* (Reprinted 1967). Hafner Publ Co., USA.

Agrawel, R.L. 1980. *Seed Technology*. Oxford & IBH Publ Co., New Delhi. 198-201 pp.

Ahad, M.A., M. Haque and K. Kamakawa. 1981. Study of compatibility between some wild and cultivated species *Solanum* using fluorescence microscopy. *Bull. Veg.* Section, Citus & Vegetable Seed Research Centre, BARI 1: 14-16.

Ahmed, M.S., A. Rashid, A.K.M.A. Hussain and A.M. Abdullah. 1985 Comparative susceptibility of brinjal cultivars against *Leucinodes orbonalis* Guen. *Banladesh Hort.* 13 (1+2): 20-24.

Ahmed, M.S., M.A. Rashid and A.K. M.A. Hussain, 1987. Effect of maturity and post harvest ripening of fruit on the viability of eggplant seeds. *Bangladesh J. Agric.* 12 (4): 279 80.

Ahmad, M.S., M.A. Rashid, M.A.A. Mia and A.K.M.A. Hussain. 1988. A study on the performance of thirty six genotypes of brinjal. *Bangladesh J. Agric. Res.* 13(1): 41-46.

Schaff, D.A.,C.H. Boyer and B.L. Pollack. 1980. Hort Science 15:419.

Sidhu, A.S., Kollu and M.L. Pandita. 1980. *Haryana J. Hort. Sci.* 9:207-17.

Som, M.G. and T.K Maity. 1986. Brinjal. In: T.K. Bose and M.G. Som (Eds.) *Vegetable Crops in India*. Naya Prakash, Calcutta. 293-342pp.

Darby, L.A. 1978. Isogenic lines of tomato fruit colour mutants. *Hort. Res.* 78: 73-84.

Gilbert, J.C., D.C. McGuite and J. Tanaka. 1961. Indeterminate tomato hybrids with resistance to eight diseases. *Hawai Farm Sci.* 9: 1-3.

Dutt, B. and R.P. Roy. 1982. Evolution on the genus *Luffa*. Proc Conf.on Biology and Chemistry of cucurrbitaceae, Robionson R.W. (Ed) Conrnell Univ. USA.

Edwards, M.D. and R.L. Lower. 1982. Comparative yields of compact and vining plant type isolines in cucumber at four densities. Cucurbit Genet. Crop. Rept. 5:6-7.

Eisa, H.M. and H.M. Munger. 1968. Male sterility in *Cucubrita pepo*. PASHS. 92: 472-79.

Miyazaki, *S. et al.* 1986. Promotion of flowering by the treatment of seed corms and young plants with gibberelic acid in taros (*Colocasia esculenta* Schott) J. Japanese Soc. Hort. Sci. 54(4) 54(4): 450-59.

Mookerjee, A. 1955. Cytology of different species of aroids with a view to trace the basis of their evaluation. Caryologia 7(2): 221-61.

Morton, J.F. 1972. Cocoyams, ancient root and leaf vegetables ganing in economic importance. Proc. Florida State Hort. Soc. 85: 85-94.

Plucknett, D.L. 1970. The status and future of the major edible aroids. *Colocasia, Xanthosoma, Alocasia, cyrtosporam and Amorpho- phallus.* Proc. 2nd Int. Symp. Trop Root and Tuber Crops vol. 1: 127-35.

Plucknett, D.L. 1983. Taxonomy of the genus *Colocasia In: Taro a rivew* of *Colocasia esculents* and its polential by J.K. Wang (ed). Univ. of Hawaii Press, 14-19pp.

Bhuiya, M.A.J. and M.M. Haque. 1983. A report on the performance of five exotic Varieties of grain *Amaranths* in Bangladesh. *Bangladesh Hort.* 11(2): 47-48.

Bhuiya, M.A.J. and M.A. Quadir. 1984. Effect of time and method of planting on seed production of carrot. Bangladesh Hort. 12(2): 11-15.